রামকৃষ্ণের জীবন

[নবজাগ্রত ভারতের অতীন্দ্রিয়বাদ এবং কর্ম সম্পর্কে আলোচনা]

রোমাঁ রোলাঁ

অনুবাদঃ
ঋষি দাস

কলিকাতা
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

আত্মার এই তীর্থ-যাত্রায়
যে ছিল আমার বিশ্বস্তা সংগিনী,
যাহাকে বাদ দিয়া এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথ
উত্তরণ করা ছিল অসম্ভব,
আমার সেই স্নেহের বোন ম্যাদ্‌লিনকে—

জানুয়ারী, ১৯২৯ র. র.

"মানুষকে অবশ্যই বিশ্রাম করিতে হইবে। ক্লান্তির অপনোদন করিতে হইবে,—মহাজীবনের নির্ঝর-ধারায় স্নাত-পীত হইয়া নিজেদিগকে সতেজ ও সজীব করিয়া তুলিতে হইবে। মহাজীবন-নির্ঝরগুলির মধ্যেই শাশ্বত শক্তির সন্ধান রহিয়াছে। মানব জাতির শৈশব ভূমিতে, পবিত্র শৈলশিখরগুলিতে—যেখান হইতে এক দিকে সিন্ধু-গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছে, অন্যদিকে প্রবাহিত হইয়াছে স্বর্গ-সুরধুনী পারস্যের অজস্র স্রোতধারা—যদি এই নির্ঝরিণীর সন্ধান না মিলে, তবে আর কোথায় মিলিবে? সংকীর্ণ পশ্চিম। ক্ষুদ্র গ্রীস। গ্রীসে আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। বিশুষ্ক জুডিয়া। সেখানে আমি তৃষ্ণার্ত কাতর হইয়া উঠি। তাই আমি ক্ষণেকের জন্য মহাপ্রাচ্য এশিয়ার পানে তাকাইতে চাই। ভারত-সমুদ্রের মতো দিগন্ত-বিসারী আমার মহাকাব্য সেখানেই নিহিত আছে। সে মহাকাব্যে ছন্দের পতন নাই। ধ্বনির অসংগতি নাই। রহিয়াছে সুর-সংগতির অনুপম স্বর্গীয়তা। তাহা দেবতার আশীর্বাদে অভিরাম। সূর্য-কিরণচ্ছটায় স্বর্ণাভ, প্রোজ্জ্বল। তাহাতে এক সৌম্য প্রশান্তি বিরাজ করিতেছে। সকল বৈপরীত্য ও সংঘর্ষের উর্ধ্বে বিরাজ করিতেছে অনন্ত মাধুর্য, অসীম ভ্রাতৃত্ববোধ। এই ভ্রাতৃত্ববোধ সকল প্রাণীতেই প্রসারিত। ইহা যেন নিস্তল নিঃসীম সমুদ্র—প্রেমের, কৃপার, করুণার। আমি এতোদিন যাহার সন্ধানে ফিরিতেছিলাম, আজ তাহার সন্ধান পাইলাম। ইহা করুণার মহাকাব্য।"

—মিশ্‌লে রচিত 'মানবতার বাইবেল' (১৮৬৪) গ্রন্থ হইতে।

লেখকের কথা

এই গ্রন্থ দুইখানির* রচনায় আমি সর্বদাই রামকৃষ্ণ মিশনের পরামর্শ লইয়াছি। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সকল প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্র ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আমি প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি:

প্রথমত, বেলুড় মঠের বর্তমান† শ্রদ্ধাস্পদ প্রধান, মহারাজ স্বামী শিবানন্দ। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত স্মৃতি হইতে আমাকে 'ঠাকুর' সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য জানাইয়াছেন। দ্বিতীয়ত, রামকৃষ্ণের স্বকীয় শিষ্য এবং বাণীবাহক ধর্মপ্রাণ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত; ইনি বিনয়বশত নিজের নামের আদ্যক্ষর 'ম' এই ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকেন। তৃতীয়ত, ধর্মপ্রাণ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ তরুণ শ্রীমান বশী সেন। ইনি স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর ছাত্র এবং বিবেকানন্দের শিষ্য। তিনি ভগিনী ক্রিস্টিন রচিত অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা তাঁহার অনুমতি লইয়াই আমাকে জানাইয়াছেন। ভগিনী ক্রিস্টিন ভগিনী নিবেদিতার মতোই পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে বিবেকানন্দের সর্বাপেক্ষা অন্তরংগ ছিলেন। চতুর্থত, মিস জোসেফিন ম্যাকলয়েড। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অকপট সহকর্মী এবং অনুরক্তা বান্ধবী ছিলেন। পঞ্চমত, এবং সর্বোপরি, 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দ। তিনি আমার অবিরাম প্রশ্নের উত্তর দিতে কখনো ক্লান্তি বোধ করেন নাই। প্রত্যেকটি উত্তরই তিনি যথাযথ পাণ্ডিত্যের সংগেই দিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের বাস্তবিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

শ্রীযুত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং আমার বিশ্বস্ত বন্ধু ডক্টর কালিদাস নাগকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম আমাকে রামকৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। ডক্টর নাগ আমাকে এ বিষয়ে বহুবার বহু উপদেশ-পরামর্শ দিয়াছেন।

আমাদের চির আদরের ভারতবর্ষের এবং সমগ্র মানবতার সেবায় যদি এতোগুলি নিপুণ নির্দেশকের সাহায্য যথোপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে পারি, তবেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।

ডিসেম্বর, ১৯২৮ **র. র.**

---

* মসিয়ে রোলাঁ রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ সম্পর্কে দুইখানি জীবনী রচনা করেন।—অনুঃ

† এখানে এবং এই পুস্তকের বিভিন্ন স্থলে 'বর্তমান' বলিতে ১৯২৮ খৃস্টাব্দ বুঝাইতেছে। কারণ, ঐ সময় পুস্তকখানি রচিত হয়।—অনুঃ

পূর্বদেশীয় পাঠকগণের প্রতি*

"ভাগবতভক্ত ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।..."

রামকৃষ্ণ, ২৮ অক্টোবর, ১৮৮২

যদি কোন ভুল-প্রমাদ করিয়া থাকি, ভারতীয় পাঠকগণ যাহাতে তাহা কঠোরভাবে গ্রহণ না করেন, সেজন্য আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য আমি অকুণ্ঠভাবে শ্রম স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এসিয়াবাসীর বহু সহস্র বর্ষের পুরাতন এই চিন্তা অভিজ্ঞতাকে প্রতীচ্যের কোনো মানুষের পক্ষেই নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। কারণ, এই ধরণের ব্যাখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রমাত্মক হইতে বাধ্য। তবে একটি বিষয়ে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি। তাহা হইল জীবনের বিভিন্ন প্রকার গঠনের মধ্যে প্রবেশ করিতে বিশুদ্ধ এবং বিনয়াবনত চিত্তে আমি যে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহার মধ্যে কোন প্রকার কাপট্য বা কৃত্রিমতা নাই।

সেই সংগে একথাও আমি স্বাকার করিতেছি, পশ্চিম দেশীয় মানুষ হিসাবে আমার যে স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহার কণামাত্রও আমি পরিত্যাগ করি নাই। সবার বিশ্বাসের প্রতিই আমি শ্রদ্ধা রাখি, সকলের বিশ্বাসকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, আমি ভালোও বাসি। কিন্তু তাই বলিয়া সকলের বিশ্বাসকে আমার নিজের বিশ্বাস বলিয়া আমি কখনো মানি না। রামকৃষ্ণকে আমি আমার অন্তরংগ বলিয়া অনুভব করি। তাহার কারণ এই নয় যে, তাঁহার শিষ্যদের মতো আমি তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া ভাবি। তাহার কারণ, তাঁহার মধ্যে আমি মানুষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি বেদান্তবাদীদের মতো, আত্মায় ভগবান রহিয়াছেন এবং সর্বত্রই আত্মা রহিয়াছে, সুতরাং আত্মাই ব্রহ্ম, এই কথা স্বীকার করিবার আগ্রহে কোনো ভাগ্যবান পুরুষের মধ্যে ভগবানকে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়োজন বোধ করি না। কারণ, ইহা, অজ্ঞাতসারে হইলেও, একপ্রকার আধ্যাত্মিকতার জাতীয়তাবাদ মাত্র। সুতরাং ইহাকে আমি স্বীকার করিতে

*এই বইখানি ভারতবর্ষে এবং ইউরোপে একই সময়ে প্রকাশিত হইতেছে।

পারি না। যাহা কিছুরই অস্তিত্ব রহিয়াছে, আমি তাহার মধ্যেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অখণ্ড বিশ্বের মধ্যে আমি তাঁহাকে যেমন পূর্ণভাবে দেখিয়াছি, তাঁহাকে তেমনি দেখিয়াছি ক্ষুদ্রতম, খণ্ডিততমের মধ্যেও। মূল সত্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। সমস্ত বিশ্বেই এই শক্তি সীমাহীন। সামান্যতম পরমাণুর মধ্যে যে শক্তি গোপন রহিয়াছে, তাহাকে যদি আমরা কেবলমাত্র জানিতে পারি, তবে তাহা দিয়াই সমগ্র বিশ্বকে উড়াইয়া ধ্বংস করিয়া দেওয়া সম্ভব। কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে, এই শক্তি কম বেশি মানুষের বিবেকের মধ্যে, অহমের মধ্যে, খণ্ড শক্তির মধ্যে, ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যে নিহিত-সংহত থাকে। সূর্যের যে আলোক শিশিরবিন্দুতে ঝলমল করে, শ্রেষ্ঠতম যে মানুষ, তিনিও তাহারই স্বচ্ছতর স্পষ্টতর প্রতিবিম্ব মাত্র।

এই কারণেই আমি আধ্যাত্মিক মহাবীরদের সঙ্গে তাঁহাদের পূর্বের ও সমসাময়িক সহস্র সহস্র অজ্ঞাতনামা সহযাত্রীদের কোনো প্রকার বিভেদ-ব্যবধান দেখিতে পাই না। অবশ্য ভক্তরা এই ধরণের পবিত্র ব্যবধান মানিয়া চলিতে ভালোই বাসেন। আত্মার যে বিপুল বাহিনী যুগে যুগে অভিযান করিয়া চলিয়াছে, তাহা হইতে আমি যেমন বুদ্ধ ও খৃস্টকে বিন্দুমাত্র পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না, তেমনি পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দকে। যে সকল প্রতিভাবান ব্যক্তি গত শতাব্দীর নবজাগ্রত ভারতে জন্মলাভ করিয়া তাঁহাদের স্বদেশের সুপ্রাচীন শক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, দেশের সর্বত্র চিন্তার বসন্ত জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন এই পুস্তকের আখ্যায়িকায় তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য স্থান দিবার চেষ্টা আমি করিব। তাঁহাদের প্রত্যেকের কার্যই ছিল সৃজনশীল। তাঁহাদের প্রত্যেককে বেষ্টন করিয়া ছিলেন এক এক দল বিশ্বাসী মানুষ—যাঁহারা নিজেদের লইয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এক একটি উপাসনার মন্দির এবং অজ্ঞাতসারে ভাবিয়াছিলেন, এই মন্দিরই সেই একমাত্র শ্রেষ্ঠতম দেবতার অধিষ্ঠানস্থল।

আজিকার এই দূর হইতে আমি তাঁহাদের সেদিনের সেই পার্থক্য ও

অনৈক্যের সংগ্রামের ধূলি-ঝঞ্ঝা প্রত্যক্ষ করিতে চাহি না। আজিকার দূর হইতে তাঁহাদের সেই ব্যূহ-গণ্ডী আর আমাদের চোখে পড়ে না। কেবল চোখে পড়ে, অবারিত, উদার মাঠ। চোখে পড়ে নিরবচ্ছিন্ন নিরবধি এক নদী, প্যাশক্যালের ভাষায় সেই মহিমান্বিত 'শেমেঁ্য কি মার্শ্'—সেই পথ, যাহা নিজেও আগাইয়া চলিয়াছে। সকল নির্ঝর ও সকল নদীর যেখানে মিলন ঘটিয়াছে, সেই বিধাতারূপী মহানদীর মহাসংগমকে রামকৃষ্ণ যে কেবল নিজের মধ্যে অন্যদের অপেক্ষা পূর্ণতররূপে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাই নহে। তিনি নিজের মধ্যে তাহাকে সংঘটিতও করিয়াছিলেন। সেই কারণেই আমি রামকৃষ্ণকে ভালোবাসিয়াছিলাম; সেই কারণেই আমি পৃথিবীর মহাতৃষ্ণা দূর করিবার মানসে তাঁহার নিকট এই স্বল্প শুদ্ধ বারি আহরণ করিতেছি।

কিন্তু এই নদী তটেই আমি নতজানু হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিব না। এই নদীপথ ধরিয়া সমুদ্রের উদ্দেশ্যে আমিও অবিরাম যাত্রা করিয়া চলিব। এই নদীর বাঁকে বাঁকে, যেখানে মৃত্যু আসিয়া আমার পথপ্রদর্শকদিগকে হাঁকিয়া বলিয়াছে, 'ক্ষান্ত হও!' সেখানে আমি আমার সহযাত্রীদিগকে একে একে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া চলিব, বহন করিব উৎসের অর্ঘ্য সংগমের উদ্দেশ্যে। পূত এই উৎস, পূত এই স্রোত-পথ, পূত এই সংগম। এইরূপেই আমরা এই নদীর মধ্যে, ইহার ক্ষুদ্রবৃহৎ উপনদী-গুলির মধ্যে, এমন কি সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে—আলিংগন করিব জাগ্রত বিধাতার গতিমান সমগ্র বিশ্বকে।

ক্রিস্‌মাস, ভিল্‌নিউভ, ১৯২৮ — র. র.

পশ্চিমদেশীয় পাঠকগণের প্রতি

মানব জাতির মিলন সাধনের জন্য আমার সমগ্র জীবন আমি উৎসর্গ করিয়াছি। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিশেষ করিয়া, ইউরোপের দুইটি শ্রেষ্ঠ জাতি, যাহারা সহধর্মী অথচ শত্রু—তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাইবার জন্য আমি প্রচুর চেষ্টা করিয়াছি। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমি অনুরূপ চেষ্টা করিতেছি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে। ভুল করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে বিশ্বাস এবং যুক্তি—এই যে দুই বিপরীত আদর্শের—আরো যথাযথভাবে বলিতে গেলে, বিভিন্ন আদর্শের—প্রতিনিধি বলিয়া ভাবা হয়; সম্ভব হইলে আমি সেই আদর্শের মধ্যেও মিলন ঘটাইতে চাহিয়াছি। কারণ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, উভয় দেশেই বিশ্বাস এবং যুক্তির বিভিন্ন রূপ আদর্শকে প্রায় সমান ভাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে, যদি-ও সে-বিষয়ে অতি সামান্য মাত্র লোকই সচেতন রহিয়াছেন।

আমাদের যুগে আত্মার এই দুইটি অর্ধাংশের মধ্যে অসম্ভব রূপ একটি বিভেদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মানিয়া লওয়া হইয়াছে, ইহাদের মিলন বা মিশ্রণ অসম্ভব। এই অসম্ভবতার একমাত্র কারণ, আমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা। আর, যাঁহারাই ভুলক্রমে এই দুই আদর্শের প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন, দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা তাঁহাদের সকলের মধ্যেই সমান রূপে বর্তমান।

এদিকে যাঁহারা নিজেদিগকে ধার্মিক বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব ধর্মায়তনের চতুষ্প্রাচীরের মধ্যে আপনাদিগকে বন্দী করিয়া রাখেন। তাঁহারা কেবল যে ওই রুদ্ধ প্রাচীরের বাহিরে আসিতে অস্বীকার করেন, তাহাই নহে (এইরূপ করিবার অধিকার তাঁহাদের রহিয়াছে), তাঁহারা সম্ভব হইলে ঐ ধর্মায়তনের প্রাচীরের বাহিরে কাহারো বাঁচিবার যে কোনো অধিকার আছে, তাহাও অস্বীকার করিয়া বসেন। অন্যপক্ষে, যুক্তিবাদীরা—যাঁহাদের অধিকাংশের মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত কোনো ধারণাই নাই, (এবং ধারণা না রাখার অধিকারও তাঁহাদের রহিয়াছে)—তাঁহারা ধার্মিক ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়াকে এবং তাঁহাদের বাঁচিবার অধিকারকে অস্বীকার করাকেই জীবনের পবিত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। ফলে, একদল মানুষ সুনিয়মিত ও সংঘবদ্ধভাবে ধর্মকে ধ্বংস করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, এমন একটি বস্তুকে তাঁহারা আক্রমণ করিতেছেন, যাহার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঐতিহাসিক বা তথাকথিত ঐতিহাসিক পুঁথিপত্র, যেগুলি বহু বৎসরের বার্ধক্যের ফলে বন্ধ্যা হইয়াছে, যেগুলির উপর কালের

শৈবাল জমিয়াছে, সেগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ধর্মালোচনায় কোনো লাভ হয় না—যেমন দৈহিক অংগ-প্রত্যংগের মধ্য দিয়া মানস জীবনের প্রবাহ বহিলেও দৈহিক অংগ-প্রত্যংগের ব্যবচ্ছেদের ফলে মানস জীবনের কোনো ব্যাখ্যাই মিলে না। প্রাচীন কালে সকল ধর্মেই ভুল করিয়া জাদু-শক্তির সহিত সেই জাদু-শক্তি যে-সকল শব্দ, অক্ষর বা বর্ণের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সেগুলিকে গুলাইয়া ফেলা হইত। আমার বিশ্বাস, আজিকার দিনে যুক্তিবাদীরাও সেই ভাবে চিন্তা এবং চিন্তার বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে গোল বাধাইয়া ফেলিতেছেন।

কোনো ধর্মকে বা ধর্মগুলিকে জানিবার, বিচার করিবার, এবং প্রয়োজন হইলে নিন্দা করিবার প্রথম শর্তই হইল ধর্মানুভূতি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা-প্রতিপরীক্ষা করিয়া দেখা। এমন কি ধর্মকে যাঁহারা পেশারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সবার ধর্ম সম্পর্কে মতামত প্রকাশের অধিকার নাই। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোনো কাপট্য না থাকে, তবে ধর্ম-চেতনা এবং ধর্মের পেশা যে দুইটি পৃথক বস্তু, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিবেন। এমন বহু শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজক আছেন, যাঁহারা কেবল আনুগত্যের ফলে বা স্বার্থ-প্রণোদিত উদ্দেশ্যের খাতিরে কিম্বা আলস্যের জন্য বিশ্বাসী হইয়াছেন। হয় তাঁহারা কখনো ধর্ম সংক্রান্ত কোনো অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজন বোধ করেন না, নয় যথেষ্ট চরিত্র-বল না থাকায় তাহা লাভ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন। অন্য পক্ষে আর একদল লোক আছেন, যাঁহারা সকল ধর্মবিশ্বাস হইতে মুক্ত বা নিজেকে মুক্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে, তাঁহারা সকল যুক্তির ঊর্ধ্বে একটি চেতনার মধ্যে নিজেদিগকে নিমজ্জিত রাখেন, এবং এই অতি-যৌক্তিক চেতনাকে আখ্যা দেন সোশ্যালিজম, কমিউনিজম্, মানবিকতা, জাতীয়তাবাদ, এমন কি যুক্তিবাদ। কি বিষয়ে চিন্তা করা হয়, তাহা নহে ; কি করিয়া চিন্তা করা হয়, তাহাই চিন্তার মূল নির্ধারণ করে। তাহা হইতেই আমরা কোনো চিন্তা ধর্ম হইতে উৎসারিত হইয়াছে কিনা স্থির করিতে পারি। যদি কোনো চিন্তা নির্ভীক ভাবে, সমস্ত ক্ষতির বিনিময়ে, সকল স্বার্থত্যাগ করিয়া, একান্ত আন্তরিকতার সংগে, সত্যের সন্ধান করে, তবে আমি সেই চিন্তাকেই ধর্মমূল বলিব। কারণ, তাহাতে মানুষের সকল প্রয়াসের লক্ষ্য যে ব্যক্তি-জীবনের ঊর্ধ্বে, অনেক সময় প্রচলিত সমাজ জীবনের ঊর্ধ্বে, এমন কি সমগ্র মানব জীবনের ঊর্ধ্বে রহিয়াছে, এমনি একটি বিশ্বাসকে পূর্ব হইতেই ধরিয়া লওয়া হয়। এমন কি সংশয়বাদ যখন কোনো শক্তিমান স্বভাবের অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত হয়, যখন তাহা দুর্বলতাকে প্রকাশ না করিয়া শক্তিকে প্রকাশ করে, তখন তাহাও ধর্মাত্মাদের অভিযানে অংশগ্রহণ করে।

অপরপক্ষে, গির্জাগুলিতে হাজার হাজার ভীরু বিশ্বাসী আছেন। তাঁহারা ধর্মযাজকই হউন বা সাধারণ ব্রহ্মচারীই হউন, ধর্মের কোর্তা পরিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। তাঁহারা যে বিশ্বাস করিতে চাহিয়াছেন, তাই বিশ্বাস করিয়াছেন, এমনো নয়। তাঁহারা আস্তাবলে গড়াগড়ি দিতেছেন, তাঁহারা বিশ্বাসের অনায়াসলব্ধ শস্যে-ভরা পাত্রের সম্মুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই। এখন তাঁহাদের গিলিত-চর্বণ ছাড়া আর কোনো কাজ নাই।

খৃস্ট সম্পর্কে একটি করুণ প্রবাদ প্রচলিত আছে। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নাকি বেদনা বহন করিবেন*। প্রবাদটি সকলের সুপরিচিত। কোনো বেদনা-বহনকারী বিধাতায় বিশ্বাস করা দূরে থাক, আমি নিজে দেহধারী বিধাতাতেও বিশ্বাস করি না। কিন্তু যাহারই অস্তিত্ব আছে, তাহাতেই আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি সুখে দুঃখে, বিশ্বাস করি সকল প্রকারের জীবনে। বিশ্বাস করি মানব জাতিতে। বিশ্বাস করি মানবে, বিশ্বে। বিশ্বাস করি, তিনিই ভগবান, যিনি নিরন্তর জন্মলাভ করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে নূতন করিয়া সৃষ্টি চলিতেছে। তাই ধর্মের শেষ নাই। ইহা এক অবিরাম কর্ম, এক অবিরাম কামনা—ইহা বদ্ধ জলাশয় নহে, ইহা নির্ঝরের জলোচ্ছ্বাস।

নদীমাতৃক দেশে আমার জন্ম। নদীগুলিকে আমি ভালোবাসি। সেগুলি যেন এক একটি জীবন্ত প্রাণী। আমি উপলব্ধি করিতে পারি, আমার পূর্ব পুরুষেরা কেন এই নদীগুলিকে সুরা এবং দুগ্ধের অঞ্জলি দিতেন। আর সকল নদীর মধ্যে পবিত্রতম হইল সেই নদী—যাহা আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে, আত্মার গিরি, বালু, প্রপাত-নির্ঝর হইতে অনন্ত কাল ধরিয়া উৎসারিত হইতেছে। তাহার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে সেই আদিমতম শক্তি, যে শক্তিকে আমি ধর্ম বলিয়াছি। সমস্ত কিছুই আত্মার স্রোতস্বতীর অন্তর্গত। এই আত্মার স্রোতস্বতী আমাদের সত্তার গভীরে অজ্ঞাত এক রসভাণ্ডার হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া এক অনিবার্য নিম্নভূমি পার হইয়া সেই চিন্ময়, সত্যময়, সমাধিময় মহাসত্তার সমুদ্রে গিয়া বিলীন হয়। আবার যেমন নদীর শূন্য জল-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্রের জল ঘনীভূত বাষ্পীভূত হইয়া আকাশে মেঘাকারে উত্থিত হয়, এখানেও ঠিক তেমনটিই ঘটে। অবিরাম সৃষ্টির চক্র ঘুরিতে থাকে। উৎস হইতে সমুদ্র, সমুদ্র হইতে উৎস। সমস্ত কিছুই সেই একই শক্তি, একই

* প্যাস্‌ক্যাল: *Pense's; Le Mystire de Jesus;* "Jesus sera en agonie jusqu'a la fin du monde : il ne faut gas dormir pendant ce temps-la."

সত্তা—আদিহীন, অন্তহীন। এই সত্তাকে ভগবান কিম্বা শক্তি, যাহাই বলা হউক না কেন, তাহাতে আমার কিছুই আসে যায় না। (ভগবান—কোন্ ভগবান ? শক্তি—কি শক্তি ? এই শক্তিকে বস্তুও বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা কি প্রকারের বস্তু, মানস-শক্তিও যখন তাহার মধ্যে পড়ে ?) কথা, কথা, কেবল কথা ! ভাবময় নয়, প্রাণময় এক ঐক্য, তাহাই সমস্ত কিছুর মূলকথা। আমি এই ঐক্যেরই পূজারী। সকল শ্রেষ্ঠ সংশয়ী, যাঁহারাই সচেতন বা অচেতন ভাবে আপনার মধ্যে এই ঐক্যকে বহন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারাই সমভাবে এই ঐক্যেরই পূজা করিয়াছেন।

সেই অদৃশ্য, সর্বব্যাপী মহাদেবী—যিনি তাঁহার স্বর্ণ বাহুপাশে বহুরূপময়, বহুবর্ণময়, বহুস্বরময় সংগীতের গুচ্ছকে আহৃত করিয়াছেন, সেই ঐক্যস্বরূপিনী মহাদেবীর উদ্দেশ্যে আমার এই নবতম গ্রন্থ আমি উৎসর্গ করিতেছি।

নবজাগ্রত ভারতে শতাব্দীকাল ধরিয়া সকল ধানুকীই ঐ একই ঐক্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সমগ্র শতাব্দীকালে ভারতের পুণ্য মৃত্তিকা হইতে অগ্নিগর্ভ বহু ব্যক্তিত্বের জন্ম হইয়াছে—জন্ম হইয়াছে অজস্র মানুষ ও চিন্তার জাহ্নবী-ধারার। তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য ও মতভেদ যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল এক—ভগবানের মধ্য দিয়া মানবের মিলন ! আর, এই মিলন-সাধকগণের যতোই পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ঐক্যও ততই প্রসার লাভ করিয়াছে, স্পষ্টতর হইয়াছে।

প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই বিরাট আন্দোলন প্রতীচ্য এবং প্রাচ্য, যুক্তি এবং বিশ্বাসের উপর সম্পূর্ণ ও সমানভাবে ভিত্তি করিয়াই একটি সহযোগ রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য, এই বিশ্বাস কোনোরূপ বিচার-বিহীন অন্ধ গ্রহণ ছিল না—যে-রূপ বিচারবিহীন অন্ধ গ্রহণের একটি ভাব গোলামির যুগে শ্রান্ত নিঃশেষিত জাতি-গুলির মধ্য হইতে ইহা লাভ করিয়াছে। এই বিশ্বাস ছিল প্রাণময়, জ্ঞানময় একটি অনুভববৃত্তি—যাহা সাইক্লপ্সের* তৃতীয় চক্ষুর মতো অপর দুইটি চক্ষুকে পংগু করে না, পূর্ণ করে।

এই আধ্যাত্মিক বীরদেরও† (তাঁহাদের সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব)

* রূপকথায় বর্ণিত একটি দৈত্যের জাতি। ইহারা নাকি সিসিলি দ্বীপের নিকট বাস করিত। ইহাদের ললাটের মধ্যস্থলে একটি করিয়া চক্ষু থাকিত, এরূপ কথিত আছে।—অনুঃ

† এই খণ্ডের 'ঐক্য-সাধক' শীর্ষক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য—(রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ)। সেই সংগে তুলনীয় 'রেভ্যু ইউরোপ' পত্রিকায় ১৯২৮ খৃস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত 'অগ্রগামী ভারত' শীর্ষক প্রবন্ধ। ঐ প্রবন্ধে আমি আমাদের সমসাময়িক মহাপুরুষ অরবিন্দ ঘোষের সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছি।

বিপুল শোভাযাত্রার মধ্য হইতে আমি দুইজনকে মাত্র বাছিয়া লইয়াছি। এই দুইজনের প্রতি আমি শ্রদ্ধান্বিত; কারণ, অতুলনীয় শক্তি ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া তাঁহারা বিশ্বাত্মার অনুপম এই সুর-সংগতিকে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে এই সুর-সংগতির মোৎসার্ট* ও বীঠোফেন† বলা চলে।—দেবাদিদেব‡ ও বজ্রধারী দেবরাজ—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

এই গ্রন্থের§ আলোচ্য বিষয় তিনটি; অথচ একটিও বটে। আমাদের কালে আমাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত দুইটি অসামান্য জীবনের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীটির অর্ধেক কিম্বদন্তী, অর্ধেক মহাকাব্য। সেই সংগে বর্ণিত হইয়াছে তাঁহাদের মহিমান্বিত চিন্তার ধারাটিও। এই চিন্তা যেমন একদিকে ধর্ম-সংক্রান্ত এবং দার্শনিক, তেমনি অন্যদিকে নৈতিক এবং সামাজিক। ইহা অতীত ভারতের গর্ভ হইতে অধুনাতন মানুষের জন্য বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে।

যদিও এই দুইটি জীবনের বেদনাময় কাহিনীর অপরূপ কাব্যময় সৌন্দর্য এবং হোমারীয়¶ গাম্ভীর্য হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, (আপনারা নিজেরাও তাহা লক্ষ্য করিবেন), কেন আপনাদিগকে দেখাইবার জন্য আমি এই দুইটি জীবনের গতিপথ সন্ধান করিয়া আমার জীবনের দুই বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছি; তথাপি বলা প্রয়োজন, কেবল মাত্র দুঃসাহসী পরিব্রাজকের কৌতূহলই আমাকে এই দীর্ঘ যাত্রা সম্পন্ন করিতে প্রলুব্ধ করে নাই।

আমি সখের লেখক নহি। আমি ক্লান্ত হতাশ পাঠকদিগকে আত্মহারা হইবার সুযোগ দিবার জন্য লিখি না। আমি লিখি, তাঁহারা যাহাতে নিজেকে খুঁজিয়া পান, সেজন্যে—খুঁজিয়া পান নিজেকে, মিথ্যার আবরণমুক্ত অনাবৃত সত্তাকে। আমার জীবিত কিম্বা মৃত সকল সহযাত্রীই এই একই উদ্দেশ্য লইয়াই অগ্রসর হইয়াছেন।

* মোৎসার্ট—জোহানেস মোৎসার্ট। ইনি বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান সংগীতকার। ১৭৫৬ খৃস্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে ইঁহার জন্ম এবং ১৭৯১ খৃস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়।—অনু:

† বীঠোফেন—লুডভিগ ভ্যান বীঠোফেন। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐক্যতানিক। বীঠোফেন ছিলেন জার্মান। তবে ভ্যান কথাটি হইতে বোঝা যায়, তাঁহার পূর্বপুরুষরা ওলন্দাজ ছিলেন। তিনি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর 'বন্‌' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৭ খৃস্টাব্দের ২৬শে মার্চ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।—অনু:

‡ মূল গ্রন্থে Pater Seraphicus আছে। Pater Seraphicus অর্থ দেবগণের পিতা।—অনু:

§ দুই খণ্ডে।

¶ হোমারীয়—গ্রীক মহাকবি হোমারের মহাকাব্যে যে মহান গাম্ভীর্য দেখা যায়, সেইরূপ।—অনু:

তাই আমার নিকট শতাব্দী এবং জাতির গণ্ডীর কোনো অর্থ নাই। আবরণমুক্ত আত্মার নিকট প্রাচ্যও নাই, প্রতীচ্যও নাই। ওই ধরণের বস্তুগুলি আত্মার আবরণ মাত্র। সমগ্র বিশ্বই আত্মার গৃহ। এবং আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যখন আত্মার গৃহ, তখন আমরা প্রত্যেকেই আত্মার অধিকারী।

যে-অন্তরতম চিন্তা হইতে এই গ্রন্থের উদ্ভব তাহার উৎসমূল কোথায়, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্যই যদি আমি নিজেকে ক্ষণকালের জন্য মঞ্চে অবতীর্ণ করি, তবে আপনারা আমাকে মার্জনা করিবেন, আশা করি। কেবল দৃষ্টান্ত হিসাবেই আমি ইহা করিতেছি; কারণ, আমি কোনো অসামান্য মানুষ নই। আমি ফরাসী জনসাধারণের একজন মাত্র। আমি জানি, যে-সহস্র সহস্র পশ্চিমবাসীদের নিজেকে প্রকাশ করিবার মতো সামর্থ্য বা সময় নাই, আমি তাঁহাদেরই মুখপাত্র মাত্র। যখন আমরা কেউ নিজের সত্তাকে মুক্ত করিবার ইচ্ছায় অন্তরের গভীর হইতে কথা বলি, তখন সেই সংগে আমরা লক্ষ মূক কণ্ঠকেও দিই মুক্তি। সুতরাং, এখন আপনারা আমার কণ্ঠের ধ্বনি নয়, তাহাদের কণ্ঠের প্রতিধ্বনিই শুনিতে পাইবেন।

মধ্য-ফ্রান্সের যে-অঞ্চলে আমি জন্মিয়াছি, আমার জীবনের পনেরো বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি, সেখানে আমার পূর্বপুরুষরাও বহু শতাব্দী কাল কাটাইয়াছেন। আমাদের বংশটি খাঁটি ফরাসী এবং খাঁটি ক্যাথলিক। তাহাতে কোনো বিদেশী মিশ্রণ নাই। তাই ১৮৮০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্যারিতে আসা পর্যন্ত আমার প্রথম জীবনের দিনগুলি প্রাচীন নিভার্নে অঞ্চলেই ছিল সীমাবদ্ধ। এবং এই জাদুমুগ্ধ অঞ্চলের মধ্যে বাহিরের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সুতরাং গলভূমির ধূসর নীল আকাশ এবং তাহার নদীরেখা-সমন্বিত এই রুদ্ধ মৃন্ময় পাত্রের মধ্যে বন্দী থাকিয়া আমি সারা শৈশব ধরিয়া সকল বিশ্বের বর্ণ-বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়াছি। তাই আমি যখন পরবর্তীকালে দণ্ডপাণি হইয়া চিন্তার পথগুলি অতিক্রম করিলাম, তখন আমার স্বদেশে দেখি নাই এমন কোনো অজানা বস্তুই আমি কোথাও প্রত্যক্ষ করিলাম না। মনের যতো প্রকার দিক আমি আবিষ্কার করিলাম, অনুভব করিলাম, দেখিলাম, সেগুলি মূলত আমার নিজের মনেরই অনুরূপ। বাহিরের অভিজ্ঞতার দ্বারা কেবল নিজের মনকেই বুঝিতে শিখিলাম। বুঝিলাম, নিজের মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলিকে—যে-গুলিকে ইতিপূর্বে আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝিতে পারি নাই। শেক্‌স্‌পীয়ার, বীঠোফেন, টলষ্টয় এবং সমগ্র রোম,—যাঁহাদের রসধারায় আমি পুষ্ট হইয়াছি, তাঁহারা কেহই আমাকে আমার অন্তরের এই গোপন নগর, এই লাভাস্রোতের তলে সুপ্ত-শায়িত

হারকিউলানিয়ামের* রুদ্ধ দ্বারে প্রবেশের সংকেত ছাড়া আর কিছুই শেখান নাই। আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে, আমার বহু প্রতিবেশীর অন্তরেও এমনি গোপন রুদ্ধ নগর সুপ্ত রহিয়াছে। তাঁহারা কেবল এই অস্তিত্বের কথা জানেন না, আমিও যেমন একদিন জানিতাম না।

সাধারণ ব্যবহারিক বুদ্ধি হইতে তাঁহারা প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জন্য যতোটুকু প্রয়োজন বলিয়া জানিয়াছেন, তাহার অধিক এই প্রোথিত নগরকে উদ্ঘাটিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক প্রয়াসটুকু অতিক্রম করিবার দুঃসাহসও তাঁহাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ করিয়াছেন। তাঁহারা অতি মিতাচারী—যাঁহারা প্রথমে রাজকীয় এবং পরে জ্যাকবিন† ফ্রান্সের ঐক্য বিধান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতোই প্রয়োজনের সংকোচ সাধনে তাঁহারা সুপটু। এইরূপ ঐক্য বিধানের আমি প্রশংসা করি। আমি পেশায় ঐতিহাসিক, সুতরাং ইহার মধ্যেও আমি আদর্শ প্রণোদিত মানব-প্রচেষ্টার একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে লক্ষ্য করি। "Aere perrenius…"‡ প্রাচীন কিম্বদন্তীতে বলে, কোনো কীর্তিকে চিরস্থায়ী করিতে হইলে প্রাচীর-গাত্রে জীবন্ত দেহ প্রোথিত করিবার প্রয়োজন ঘটিত। আমাদের এই সুনিপুণ স্থপতিরাও তাঁহাদের কীর্তিকে চিরন্তন করিবার জন্য তাঁহাদের কীর্তির প্রাচীর-গাত্রে সহস্র সহস্র জীবন্ত মানবাত্মাকে প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। মর্মর প্রাচীরগাত্রে আজ আর তাহাদের কোনো চিহ্ন নাই। কিন্তু তবু আমি তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি। প্রাচীন চিন্তার পুণ্য ইতিবৃত্তের মধ্যে যদি কেহ আমার মতো কান পাতিয়া শুনিতে চান, তবে তিনিও ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইবেন। গির্জার 'উচ্চ বেদীমঞ্চে' যে উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে উহার স্থান নাই, সত্য। কিন্তু যে শান্ত, ভীরু, অমনোযোগী বিশ্বাসী মানুষের দল যাজক-পুরোহিতের ইংগিতমাত্রে উঠেন, বসেন, তাঁহারাই স্বপ্নের ঘোরে সেণ্ট জনের সব্জীর§ চর্বিত-চর্বণ করেন। আত্মার সম্ভারে সমৃদ্ধ

---

* হারকিউলানিয়াম—রোম রাজ্যের প্রাচীন একটি নগর। ৭৯ খৃস্টাব্দে বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পম্পিয়াই শহরের সহিত ভূগর্ভে প্রোথিত হয়।—অনুঃ

† জ্যাকবিন—বিপ্লবী। প্যারী শহরের 'জ্যাকবিন' ক্লাবের সদস্যরাই ফরাসী বিপ্লবের পথপ্রদর্শন করেন। রবস্পীয়ের এবং মিরাবো ছিলেন এই ক্লাবের উল্লেখযোগ্য সদস্য। তাই জ্যাকবিন বলিতে 'বিপ্লবী' বুঝায়।—অনুঃ

‡ "কালের অপেক্ষাও শাশ্বত, সনাতন"।—হোরেস।

§ সেণ্ট জনের পরবের দিন মেলায় তথাকথিত জাদু-শক্তিসম্পন্ন সকল প্রকার শাক-সব্জী বিক্রয় হয়।

ফরাসী দেশ। কিন্তু ফরাসী দেশ সযত্নে তাহার আত্মার সম্ভার লুকাইয়া রাখে। কৃষাণীর মতো কৃপণা সে।

এই নিষিদ্ধ আত্মাগুলির কয়েকটির কাছে পৌঁছিবার হারানো সোপানের চাবিটি আমি পুনরায় আবিষ্কার করিয়াছি। প্রাচীরগাত্রে এই সোপানশ্রেণী সর্পের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া অহমের ভূতল-গর্ভ হইতে উঠিয়া নক্ষত্র-মুকুটিত এক প্রাসাদ শীর্ষে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সেখানে আমি যে-দেশ দেখিয়াছি, তাহা আমার কাছে অপরিজ্ঞাত নহে। তাহা আমি পূর্বেই দেখিয়াছি, পূর্বেই ভালোভাবে চিনিয়াছি—কিন্তু বুঝিলাম না, তাহা পূর্বে আমি কোথায় দেখিয়াছি। পূর্বে আমি যে-পাঠ পাইয়াছিলাম, তাহা আমি নির্ভুলভাবে না হইলেও, একাধিক বার স্মরণ হইতে আবৃত্তি করিলাম। (কাহার নিকটে সে পাঠ পাইয়াছিলাম ? আমার অতি পুরাতন কোনো আত্মার···।) এখন পুনরায় আমি তাহা পাঠ করিতেছি। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট ও পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এখন তাহা আমি পাঠ করিতেছি সেই নিরক্ষর প্রতিভা—রামকৃষ্ণের জীবনগ্রন্থে। এ-পাঠের প্রতিটি পৃষ্ঠা একদা আমার কণ্ঠস্থ ছিল।

আমি আজ তাঁহাকে আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছি—নূতন কোনো গ্রন্থরূপে নয়, অতি প্রাচীন একটি গ্রন্থরূপে। যে গ্রন্থ আপনারা বানান করিয়া করিয়া অতি কষ্টে পড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন (অনেকেই বর্ণ পরিচয়ে আসিয়াই থামিয়া গিয়াছেন)। তবুও ইহা সেই একই গ্রন্থ—লেখনের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে। মানুষের দৃষ্টি সাধারণতঃ প্রচ্ছদপটে আসিয়াই প্রতিহত হয়, তাহা ভেদ করিয়া সার-বস্তু পর্যন্ত অগ্রসর হয় না।

ইহা সর্বদা সেই একই 'গ্রন্থ'। সেই একই মানুষ—সেই শাশ্বত সনাতন, 'মানুষের পুত্র', আমাদের পুত্র, আমাদের পুনর্জাত ভগবান। তিনিই ফিরিয়া আসেন, এবং প্রতিবার ফিরিয়া আসিয়া ঈষৎ পূর্ণতররূপে,. বিশ্বের সম্পদে সমৃদ্ধতররূপে উদ্ঘাটন করেন আপনাকে।

স্থান ও কালের পার্থক্য বাদ দিয়া দেখিলে রামকৃষ্ণ আমাদের খৃস্টেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

আজিকার যুক্তিবাদীরা যেরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন, আমরাও ইচ্ছা করিলে সেইরূপ দেখাইতে পারি, খৃস্টের মতবাদের সবটুকুই তাঁহার পূর্বেও পূর্ব-দেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই মতবাদের জন্ম দিয়াছিলেন ক্যালডিআ, ইজিপ্ট, আথেন্স এবং আইওনিয়ার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা। কিন্তু তথাপি মানবজাতির ইতিহাসে প্লেটোর ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে খৃস্টের ব্যক্তিত্বকে—তাহা বাস্তবিক, কিম্বা কাল্পনিক যাহাই হউক, (বাস্তবিক এবং কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব একই বাস্তবতার দুইটি

দিক মাত্র* কখনো কেহ আপন স্থান হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। এবং তাহাতে কোনো অন্যায়ও হইবে না। ইহা মানবাত্মার অতুলনীয় অপরিহার্য একটি সৃষ্টি। মানবাত্মার একটি শরতের সুন্দরতম ফসল। প্রকৃতির একই নিয়ম অনুসারে একই বৃক্ষে জীবন ও কিম্বদন্তীর জন্ম হইয়াছে। একই জীবন্ত দেহ হইতে উহারা উভয়েই প্রস্তুত। একই জীবন্ত দেহের দৃষ্টি, নিঃশ্বাস ও শৈত্য-সজলতা হইতে উহাদের উভয়েরই উদ্ভব।

আমি ইউরোপের জন্য এক নবীন শরতের ফসল আনিয়াছি, আনিয়াছি আত্মার এক নূতন বাণী, ভারতের মহা-সংগীত। এ মহা-সংগীতের নাম রামকৃষ্ণ। ইহার সম্পর্কে ইউরোপ এখনো পর্যন্ত সচেতন হয় নাই। এখানে দেখানো যাইতে পারে যে (এবং দেখাইতেও আমরা ভুলিব না), এই মহা-সংগীত আমাদের প্রাচীন সংগীত প্রতিভাদের সৃষ্টিগুলির মতোই অতীত হইতে সংগৃহীত বহু বিভিন্ন সুরের সমাবেশে রচিত। বহু পুরুষের অক্লান্ত শ্রম ঐ সৃষ্টিগুলির পশ্চাতে বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে-সার্বভৌম ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সুরের সরঞ্জামকে নিজের মধ্যে সংহত করিয়া সেগুলিকে এক রাজসিক ঐকতানে গড়িয়া তুলেন, কেবল তাঁহারই নাম ঐ সকল সৃষ্টির উপর আরোপিত হয় এবং তাঁহার ঐ গৌরবময় নাম-লাঞ্ছন দিয়াই একটি নবযুগের নির্দেশ ঘটে।

যে-মানুষটির মূর্তিকে আমি এখানে কল্পনায় রূপ দিতে চাই, ত্রিশ কোটি নর-

* কাল্পনিক রূপকথার প্রতি ধর্মভীরু ভারতীয়দের মনোভাবটি বিশ্বাসের অনুরূপ একটি কৌতূহল এবং সমালোচনার মনোভাব। ইহা একান্ত লক্ষণীয় যে, যে-সকল ব্যক্তিত্বকে ভারতীয়গণ দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেন, সেগুলির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁহারা একপ্রকার উদাসীন থাকেন। অন্ততপক্ষে, ঐ বিষয়টি তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ গৌণ। যতোক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক হইতে সেগুলির সত্যতা থাকে, ততক্ষণ সেগুলির বস্তুগত অসত্যতায় কিছু আসে যায় না। সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী রামকৃষ্ণ বলেন, "যাঁহারা এমন চিন্তা করিতে পারিতেন, তাঁহারা নিজেদের মধ্যে এই চিন্তাগুলিকে রূপ দিতেও পারিতেন।" বিবেকানন্দ কৃষ্ণের এবং খৃষ্টের দেহগত অস্তিত্ব সম্পর্কে (খৃষ্টের অপেক্ষাও কৃষ্ণের সম্পর্কে অধিক) সংশয় পোষণ করিতেন। তথাপি তিনি বলেন: "কিন্তু আজিকার দিনে কৃষ্ণই সর্বাপেক্ষা ত্রুটিহীন অবতার।" এবং তিনি কৃষ্ণের পূজাও করিতেন। (ভগিনী নিবেদিতার 'Notes of Some Wonderings with Swami Vivekananda' এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।)

সত্যিকার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা অবতারের বাস্তবতার মধ্যেও যেমন, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যেও তেমনি, জীবন্ত ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন। শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসীদের চক্ষে এই দুইটি বিষয়ই সমান বাস্তব। কারণ, তাঁহাদের নিকট যাহাই বাস্তব, তাহাই ভগবান। তাহা ছাড়া, তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না যে, ঐ দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব অধিক—একটি জাতি যাহাকে জন্ম দিয়াছে, না অন্যটি যুগ যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে।

নারীর দুই সহস্র বৎসরব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ তিনি। যদিও চল্লিশ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে,* তথাপি তাঁহার আত্মা আধুনিক ভারতকে প্রাণ-চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। তিনি গান্ধীর মতো কর্মবীর ছিলেন না, ছিলেন গ্যেটে† বা রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্প বা চিন্তার প্রতিভা। তিনি ছিলেন বাংলার ক্ষুদ্র এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ। তাঁহার বহির্জীবন ছিল সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহাতে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ছিল না, ছিল না সমসাময়িক রাজনীতিক কোনো কর্মচাঞ্চল্য‡। কিন্তু তাঁহার আভ্যন্তরীণ জীবনে বহু বিচিত্র মানব ও দেবতার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার আভ্যন্তরীণ জীবন ছিল সকল শক্তির মূলাধার-স্বরূপিণী দেবী 'শক্তির' অংশ মাত্র—মিথিলার প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি§ যে-দেবী-শক্তির স্তুতি গাহিয়াছেন, বাংলার কবি রামপ্রসাদ যে শক্তির বন্দনা করিয়াছেন।

কদাচিৎ কেহ উৎসের সন্ধানে যান। বাংলার এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য মানুষটি কান পাতিয়া নিজের অন্তরের বাণী শুনিয়াছিলেন। তাই তিনি অন্তরতর সমুদ্রের পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই সমুদ্রের সহিত মিলন ঘটিয়াছিল এবং এইরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল উপনিষদের বাণী‖ :

* ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে। তাঁহার মহান শিষ্য বিবেকানন্দ উনচল্লিশ বৎসর বয়সে ১৯০২ খৃস্টাব্দে মারা যান। ইহা কখনোই ভুলিলে চলিবে না যে, এই সেদিনও তাঁহারা জীবিত ছিলেন। সেই একই সূর্য আমরা দেখিতেছি, সেই একই কালের তরণী আমাদিগকে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।

† গ্যেটে—জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।—অনুঃ

‡ বিবেকানন্দের জীবন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কারণ, তিনি পুরাতন এবং নূতন, উভয় জগৎই পরিক্রম করিয়াছিলেন।

§ "হে নিবিড়কুন্তলা মহাদেবি, তুমি আত্মপ্রকাশ কর! তুমিই এক, তুমিই বহু, তোমার মধ্যেই সহস্র নিহিত রহিয়াছে, তুমিই শত্রুর সহিত সংগ্রামকালে রণভূমি পরিপূর্ণ কর।..." (শক্তির স্তোত্র)।

[রোলাঁ এখানে বিদ্যাপতির যে কবিতার কথা বলিতেছেন, তাহা নগেন্দ্র গুপ্ত সংকলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর ৪৯৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ :

বিদিতা দেবী, বিদিতা হো,
অবিরল কেস সোহন্তী।
অনেকানেক সহসকো ধারিনি,
জরিমঙ্গা পুনরত্তি॥"

—অনুবাদক]

‖ তৈত্তিরীয় উপনিষদ।

"আমি জ্যোতির্ময় দেবতাদের অপেক্ষাও প্রাচীন। আমি সত্তার প্রথম সন্তান। আমি অমরত্বের শোণিতবাহী শিরা-উপশিরা।"*

তাই আজ আমি জ্বরবিকার-গ্রস্ত বিনিদ্র ইউরোপের কর্ণে সেই ধমনীর শোণিত-স্পন্দন ধ্বনিত করিয়া তুলিতে চাই। চাই ইউরোপের শুষ্ক ওষ্ঠাধরকে 'অমরতার' শোণিত-ধারায় সজল-সিক্ত করিয়া তুলিতে।

ক্রিস্‌মাস্‌, ১৯২৮

বেদান্ত অনুসারে, যখন পরম ব্রহ্ম সগুণ হইয়া উঠেন এবং প্রাণময় বিশ্বের উদ্‌বর্তন আরম্ভ করেন, তখন তিনিই স্বয়ং প্রথমে উদ্‌বর্তিত হন—সকল দৃশ্য এবং অদৃশ্য সত্ত্ব-সমূহের সার যে সত্তা তিনিই হন তাহার প্রথম জাতক। যিনি এইরূপ কথা বলেন, তিনিই ব্রহ্মের সহিত একাত্মিত হইয়াছেন বলিয়া বলা হয়।

* রোলাঁ এখানে সম্ভবত তৈত্তিরীয় উপনিষদের দশম অনুবাকে কথিত শ্লোকের কথাই বলিতেছেন:

"অহমস্মি প্রথমজা ঋতা স্য।
পূর্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ভায়ি।" —অনুবাদক

রামকৃষ্ণের জীবন

প্রাক্‌বাক্‌

রূপকথার মতন করিয়াই আমার কাহিনী আমি আরম্ভ করিব। কিন্তু ইহা এক অসামান্য ব্যাপার যে, এই প্রাচীন রূপকথাকে আপাতদৃষ্টিতে পৌরাণিক জগতের অন্তর্গত মনে হইলেও, বাস্তবিকপক্ষে ইহা এমন সব মানুষের কাহিনী যাঁহারা গতকল্যও জীবিত ছিলেন, যাঁহারা ছিলেন আমাদের "শতাব্দীর" প্রতিবেশী, যাঁহাদিগকে আজিকার বহু জীবিত মানুষই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন[১]। তাঁহাদিগের নিকট হইতে বহু জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। তাঁহাদের কয়েক-জনের সহিত আমার আলাপও হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই ঐ অতীন্দ্রিয় সত্তার —ঐ মানবদেবতার সহচর ছিলেন। রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। তাহা ছাড়া, এই প্রত্যক্ষদর্শীরা, খৃস্টের জীবন-কাহিনীর মতো, অশিক্ষিত ধীবর ছিলেন না। তাঁহাদের কয়েকজন ছিলেন মহামনস্বী ব্যক্তি, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, ইউরোপীয় চিন্তার রীতিতে অভ্যস্ত। তথাপি তাঁহারা এমন ভাবে কথাগুলি বলিয়াছেন, যেন তিন হাজার বৎসর পূর্বেকার মানুষ তাঁহারা।

প্রাচীন কালে, গ্রীক যুগে, দেব-দেবীরা নশ্বর মানুষের শয্যা ও আহারের অংশ গ্রহণ করিতেন। গ্যালিলির যুগে নিদাঘের ধূসর আকাশে দেখা দিতেন পক্ষসঞ্চারী দেবদূত, সম্ভ্রম-বিনয়ে নত হইয়া মেরী মাতার নিকট বহিয়া লইয়া চলিতেন স্বর্গের উপহার। প্রাচীন কালের এই স্বপ্ন-কল্পনার সহিত একই সংগে একই মস্তিষ্কে যে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকিতে পারে, এ-কথা আমাদের কালের পণ্ডিতরা ভাবিতেও পারেন না—ভাবিবার মতো যথেষ্ট উন্মত্ততা তাঁহাদের আর নাই। কিন্তু

১ এই পুস্তকখানি যখন লিখিত হয় (১৯২৮ খৃস্টাব্দের শরৎকালে), তখনো রামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্য জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:

কলিকাতার সমীপবর্তী বেলুড় কেন্দ্রীয় মঠের অধ্যক্ষ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী শিবানন্দ। স্বামী অভেদানন্দ। স্বামী অখণ্ডানন্দ। স্বামী সুবোধানন্দ। স্বামী নির্মলানন্দ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। প্রভুর সহিত কথোপকথন সংক্রান্ত প্রবন্ধ রামকৃষ্ণ-কথামৃতের সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়। তাহা ছাড়া রামকৃষ্ণের বহু অশিক্ষিত শিষ্য, যাঁহাদের সন্ধান ও নির্দেশ করা সহজ নয়।

উহার মধ্যেই রহিয়াছে সত্যকারের 'মিরাকল্'—বিশ্বের অনন্ত সম্পদ—যাহা তাঁহারা ভোগ করিতে জানেন না। ইউরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অধিকাংশই নিজেদিগকে মানব জাতি-রূপ গৃহের স্ব স্ব বিশেষ তলে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন। অতীত কালে এই গৃহের অন্যান্য তলে কাহারা বাস করিতেন, তাহার ইতিহাস হয়তো তাঁহাদের নিজেদের তলের গ্রন্থগারে থাকে। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের নিকট এই গৃহের অবশিষ্ট অংশকে অনধ্যুষিত বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদের উপর ও নিচের তলের প্রতিবেশীদের পদধ্বনি তাঁহারা শুনিতে পান না। বিশ্ব-ঐক্যতানের যে যন্ত্রসংগীত, তাহা রচিত হয় অতীত এবং বর্তমান শতাব্দীগুলিকে লইয়া। সে-সংগীতে অতীত এবং বর্তমান, সকল শতাব্দীর ঝংকার একই সংগে বাজিয়া চলে—যদিও প্রত্যেক বাদকের দৃষ্টি স্ব স্ব স্বরলিপি ও নির্দেশকের দণ্ডের প্রতিই থাকে নিবদ্ধ, এবং প্রত্যেক বাদক নিজের যন্ত্রের বাদ্য ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পান না।

কিন্তু আমরা বর্তমানের এই অপূর্ব ঐক্যতানের সমস্তটুকুই শুনিতে চাই। শুনিতে চাই ঐ ঐক্যতানের মধ্যে সকল জাতির, সকল কালের, অতীতের স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের কল্পবাসনার সংমিশ্রণ। যাঁহাদের শুনিবার কান আছে, তাঁহাদের শুনিবার জন্য প্রতি মুহূর্ত আদিম জন্ম হইতে অন্তিম মৃত্যু পর্যন্ত মানবতার এক অখণ্ড সংগীত ধ্বনিত হইতেছে এবং কাল-চক্রের ঘূর্ণাবর্তে সেই সংগীত পুষ্পের মতো বিকাশ লাভ করিতেছে। মানবের চিন্তার স্রোত কোন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য ভূর্জপত্রের অস্পষ্ট লেখন হইতে অর্থ আবিষ্কার করিবার কোনো প্রয়োজনই নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের চিন্তা নিরন্তর আমাদের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার কিছুই ক্ষুণ্ণ হয় নাই, লুপ্ত হয় নাই। ঐ শুনুন! কান পাতিয়া শুনুন! গ্রন্থের মুখর ভাষণ স্তব্ধ করুন!...

মানুষ যেদিন হইতে তাহার অস্তিত্বের স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছে, সেই আদিমতম কাল হইতে আজ পর্যন্ত তাহারা যতো স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহার সবগুলিই যদি পৃথিবীর কোনো একটি মাত্র স্থানে বাসা বাঁধিয়া থাকে, তবে সে স্থানটি হইল ভারতবর্ষ। বার্থ[১] অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, ভারত যে অনন্যসাধারণ সুযোগ-সম্মানের অধিকারী হইয়াছে, তাহা জ্যেষ্ঠা সহোদরার সুযোগ ও সম্মান। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক বিকাশ হইয়াছে পুষ্পের মতো—যে-পুষ্প

১ এ. বার্থ—The Religions of India, 1879.

আপনা হইতেই জনসাধারণের মেথুজেলা-[১]সুলভ সুদীর্ঘ জীবনে অবিরাম ও অব্যাহতভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। দেবতার জ্বলন্ত জঠরের মতো এই ভারতভূমি। দীর্ঘ ত্রিশ শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া তাহার বহ্নিমান মৃত্তিকা হইতে দিব্য-দৃষ্টির মহা মহীরুহ অভ্যুত্থিত হইয়াছে, এবং প্রসার লাভ করিয়াছে। সহস্র শাখায়, কোটি প্রশাখায়। তাহাতে বার্ধক্য বা মৃত্যুর লক্ষণ নাই। তাহা নব নব রূপে আপনাকে অবিশ্রান্ত ভাবে প্রকাশ করিতেছে। একই কালে তাহার বিভিন্ন শাখায় সকল প্রকার ফল পরিপক্ক হইতেছে। বর্বরতম দেবতা হইতে—নামহীন, সীমাহীন, নিরাকার ব্রহ্ম, পরম-পুরুষ বিধাতা পর্যন্ত সকলেরই এই মহীরূপে সাক্ষাৎ মিলিবে। কিন্তু সর্বদাই ওই একই মহীরুহে।

তাহা ছাড়া, এই জটিল শাখাপ্রশাখাগুলি, যেগুলির মধ্য দিয়া একই প্রাণ-রস প্রবাহিত হইতেছে, সেগুলির বস্তু ও চিন্তা এমন ঘন-সংবদ্ধ যে, এই বৃক্ষের নিম্নতম মূল হইতে উচ্চতম শীর্ষের কিশলয়গুচ্ছ পর্যন্ত একই প্রাণের আবেগে সেগুলি কম্পিত হইতে থাকে। উহা যেন পৃথিবীরূপ মহাপোতের মাস্তুল; মানব জাতির সহস্র বেদনা ও বিশ্বাস দিয়া রচিত এক মহা-সংগীত। উহার বহু বিচিত্র ধ্বনির ছন্দ অনভ্যস্ত কানে প্রথমে সংগতিহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অভ্যস্ত কানে ইহা স্বরের একটি গোপন সোপান এবং বিশাল বিস্তৃত রূপকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরে। তাহা ছাড়া, যাঁহারা একবার এই সংগীত শুনিয়াছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্যের যুক্তি, বিশ্বাস বা বিশ্বাসাবলীর জোরে আশা-ভরসাহীন মানুষের উপর চড়াইয়া দেওয়া রূঢ় কৃত্রিম শৃঙ্খলা লইয়া আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। কারণ, পাশ্চাত্যের যুক্তি এবং বিশ্বাস, সমানভাবেই পরস্পরের বিরোধী, সমানভাবেই পরস্পরের প্রতি বিরূপ। যে-পৃথিবীর অধিকাংশটাই গোলামি করিতেছে, অধঃপতিত, বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া মানুষের কী লাভ হইবে? তাহার অপেক্ষা একটিমাত্র পরিপূর্ণ, প্রতিষ্ঠিত, সমগ্র-সংহত জীবনের উপর অধিকার লাভ করা শ্রেয়। কারণ, তাহাতে মানুষকে বিভিন্ন স্বতঃবিরোধী শক্তির মধ্যে অবশ্যই সামঞ্জস্য বিধান করিতে শিখিতে হইবে।

ইহাই সেই পরম জ্ঞান, যাহা আমরা "বিশ্বাত্মাদের" নিকট হইতে লাভ করিতে পারি। এবং এই বিশ্বাত্মাদেরই কয়েকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমি এই পুস্তকে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছি। "মাঠে শাপলা ফুটিয়াছে; তাহারা পরিশ্রম করে না, সুতাও

১ মেথুজেলা—ইনি সর্বাপেক্ষা আয়ুষ্মান ব্যক্তি বলিয়া বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছেন। 'জেনেসিস' বা সৃজন-পর্বে তিনি ৯৬৭ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন বলা হইয়াছে।—অনু:

কাটে না, তবু তাহাদের মহিমার অন্ত নাই"—এই বাণী বিশ্বাত্মাদের প্রতিষ্ঠা এবং সৌম্য গাম্ভীর্যের গূঢ় সূত্র নহে। তাঁহারা বস্ত্রহীনের জন্য বস্ত্র বয়ন করেন। তাঁহারা আমাদিগকে গোলক-ধাঁধার জটিল দুর্গমে পথ দেখাইবার জন্য কাটেন এরিয়াড্‌নের সূতা[১]। নির্ভুল পথ পাইবার জন্য আমাদিগকে কেবল ঐ সূতার এক প্রান্ত ধরিয়া থাকিতে হইবে। পথ আমাদের আত্মার সুদূরপ্রসারী পংকিল জলাভূমি হইতে উত্থিত হইয়াছে—সে-জলাভূমির পংক শয্যায় আদিম যুগের বহু দেব-দেবী আজো অনড় হইয়া বসিয়া আছেন। ঐ পথের শেষ হইয়াছে সেই শিখরদেশে—যেখানে রহিয়াছে বিপুল পক্ষবিস্তারী স্বর্গভূমি—মহাব্যোম[২]—যেখানে রহিয়াছেন স্পর্শাতীত আত্মা।

মানব-দেবতা রামকৃষ্ণের জীবনীতে আমি জাকোবের সিড়ির কাহিনী বর্ণনা করিব, সে-সিঁড়ি দিয়া মানুষের অন্তরে দিব্য দুইটি পথ স্বর্গ হইতে মর্ত্যে এবং মর্ত্য হইতে স্বর্গে অবিরাম অবিচ্ছিন্ন ভাবে উঠা-নামা করিতেছে।

১ এরিয়াড্‌নে—ইনি গ্রীক-পুরাণে বর্ণিত ক্রিটের রাজা মিনসের কন্যা এবং সূর্য-দেবতা হেলিঅসের দৌহিত্রী। থেসিউস যখন মিনটরকে বধ করার জন্য ক্রিট্ দ্বীপে আগমন করেন তখন এরিয়াড্‌নে তাঁহার প্রেমে পড়েন এবং মিনটরকে হত্যায় তাঁহাকে সাহায্য করেন। একটি দুর্গম গোলকধাঁধার মধ্যে থেসিউস যাহাতে পথ না হারান এবং অভীপ্সিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এরিয়াড্‌নে তাঁহাকে একটি সুদীর্ঘ সূতা দেন; এই সূতার একপ্রান্ত ধরিয়া থাকিয়াই থেসিউস পথের সন্ধান পান।—অনুঃ

২ এম্পিডক্লিস, "টিটান ইথার।" এম্পিডক্লিস—গ্রীক দার্শনিক এবং রাজনীতিক, সিসিলি দ্বীপের অধিবাসী। তিনি খৃস্ট পূর্ব ৪৯০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যু হয় খৃস্ট পূর্ব ৪৩০ অব্দে।—অনুঃ

শৈশবলীলা*

তালের বন, দীঘি আর ধানের ক্ষেতে ঘেরা, বাংলার গ্রাম কামারপুকুর; সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-দম্পতির বাস। তাঁহাদের পদবী চট্টোপাধ্যায়। তাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং ধর্মভীরু। তাঁহারা ন্যায়বীর রামচন্দ্রের ভক্ত। রামকৃষ্ণের ভক্ত। রামকৃষ্ণের পিতা প্রাচীন কালের মানুষদের মতোই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। এক প্রতিবেশী জমিদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তিনি সর্বস্বান্ত

*দ্রষ্টব্য—আমার ইউরোপীয় পাঠকগণকে আমি সতর্ক করিয়া দিতে চাই। এখানে শৈশব বর্ণনাকালে আমি আমার সমালোচনা শক্তির ব্যবহার করিব না। (অবশ্য, আমার সমালোচনী দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ থাকিবে।) আমি কেবল প্রচলিত কিম্বদন্তীকে ভাষা দিতেছি এখন ইহার বস্তুগত সত্যতা সম্পর্কে ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। মানসগত সত্যতা থাকিলেই চলিবে। পেনেলোপের জাল[১] খুলিবার কাজটি এখন নিতান্তই অকারণ। একটি দক্ষ শিল্পী তাঁহার নিপুণ হাতে যে-স্বপ্ন রচনা করিয়াছেন, আমি তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকিব। এ-বিষয়ে আমরা একজন মহাপণ্ডিতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারি। ম্যাক্স মুলার[২] বিবেকানন্দের মুখে পমহংসের জীবন বৃত্তান্ত যেমনটি শুনিয়াছিলেন, তাহা তিনি তেমনি ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তিকায় তাহাই তিনি হুবহু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্যের সমালোচনামূলক নীতির প্রতি তিনি যেমন ছিলেন অনুরাগী, অন্যান্য সকল প্রকার চিন্তার প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল তেমনি অচল। তাঁহার বিশ্বাস, সমসাময়িক ব্যক্তিরা যে-সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বা নিজেদের জীবনে অনুভব করিয়াছেন, ইতিহাস রচনার ব্যাপারে সে-সকল ঘটনা অপরিহার্য। এই রীতিকে তিনি 'ডায়ালজিক' বা 'ডায়ালেক্‌টিক' আখ্যা দিয়াছেন। উক্ত রীতি অনুসারে বিশ্বাসযোগ্য জীবিত ব্যক্তির সাক্ষ্যের দ্বারা বাস্তবতার একপ্রকার নিবর্তন inversion ঘটানো হয়। বাস্তবতা সংক্রান্ত সকল জ্ঞানই মানুষের মনন এবং অনুভূতির মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত এক প্রকার নিবর্তন মাত্র। সুতরাং অকপটভাবে অনুষ্ঠিত সকল নিবর্তনই বাস্তব। পরে অবশ্য সমালোচনামূলক যুক্তির দ্বারা এই দৃষ্টির কোণ ও দূরত্বের পরিমাপ করিতে হইবে। মনের আয়নায় সব কিছুই বিকৃত হইয়া ধরা দেয়। সুতরাং সে-বিষয়েও সচেতন থাকিতে হইবে।

১ পেনেলোপের জাল—গ্রীক বীর ইউলিসিসের স্ত্রী পেনেলোপ। ইউলিসিস যুদ্ধকালে বিদেশে বহুদিন থাকায়, অনেকের ধারণা হয় ইউলিসিসের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং অনেকেই পেনেলোপের পাণিপ্রার্থী হন। পেনেলোপ তাঁহার পাণিপ্রার্থীদের ঠেকাইয়া রাখার জন্য বলেন যে, একটি জাল বোনা শেষ হইলে তিনি বিবাহ করিবেন। তাই তিনি দিনের বেলায় যে জাল বুনিতেন, রাত্রিতে তাহাই
।।—অনুঃ

২ ম্যাক্‌স্ মুলার: রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী।

হইয়াছেন। ষাট বৎসর বয়সে তাঁহার উপর ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি গয়াযাত্রা করেন। এই গয়া-তীর্থে ভগবান বিষ্ণুর পদ-চিহ্ন রহিয়াছে।[১] ভগবান নিশাকালে রামকৃষ্ণের পিতার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলেন: "আমি বিশ্বের মুক্তির জন্য শীঘ্রই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিব।"

ঐ সময়ে তাঁহার স্ত্রী চন্দ্রমণিও স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার উপর দেবতা ভর করিয়াছেন। তাঁহাদের কুটির-প্রাংগণে যে শিব-মন্দির ছিল, সেখানে শিব-বিগ্রহ যেন মুহূর্তে সজীব হইয়া উঠিলেন। তারপর একটি আলোকরশ্মি আসিয়া চন্দ্রমণির দেহে প্রবেশ করিল। চন্দ্রমণি ঐ আবেগ-আলোড়নে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। যখন অতঃপর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন, তখন তিনি অন্তঃস্বত্বা হইয়াছেন। স্বামী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, চন্দ্রমণির মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চন্দ্রমণি প্রায়ই দৈববাণী শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার গর্ভে ভগবান আসিয়াছেন।[২]

যে শিশু রামকৃষ্ণ নামে একদা পৃথিবীতে পরিচিত হইবেন, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহার জন্ম হইল। শিশুকালে তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকা হইত গদাধর। বাল্যাবস্থায় রামকৃষ্ণ যেমন সজীব ও সহাস্য ছিলেন, তেমনি ছিলেন দুরন্ত ও সুন্দর। আর সেই সংগে ছিল নারী-সুলভ একটি মাধুর্য, যাহা তাঁহার মধ্যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই হাস্যমুখর শিশুর ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে যে অসীম বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা গোপন ছিল, তাহা শিশু নিজে তো দূরের কথা, অন্য কেহও কল্পনা করে নাই। যখন তাঁহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর, তখন সেগুলি প্রথম দেখা দিল। ১৮৪২ খৃস্টাব্দের জুন বা জুলাই মাসে একদিন বালক রামকৃষ্ণ সামান্য কিছু মুড়ি কোঁচড়ে লইয়া মাঠে যাইতে ছিলেন, তখন ঐ ব্যাপারটি ঘটে।

"একদিন সকাল বেলা টোকায় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও খাচ্ছি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় এক ঝাঁক শাদা দুধের মত বক, ঐ কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক বাহার হোলো! দেখ্‌তে দেখ্‌তে অপূর্ব ভাবে তন্ময় হ'য়ে এমন একটা অবস্থা হোলো যে, আর হুঁস রইলো না। প'ড়ে গেলুম, মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে

১ বর্তমানে জনসাধারণ বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অসংখ্য অবতারের অন্যতম বলিয়া মনে করেন।

২ ভারতীয় জনশ্রুতিতে একাধিক যৌনাতীত সন্তান-সম্ভাবনার কথা শোনা যায়।

গেলো। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলাম বলতে পারি না। লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি ক'রে বাড়ি দিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম বেহুঁস্ হ'য়ে যাই।"

এইভাবেই তাঁহাকে জীবনের অর্ধেকগুলি দিন কাটাইতে হয়।

এমন কি প্রথমবারের ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেও এই শিশুর আত্মার উপর সত্যসত্যই একটি দিব্য প্রভাব লক্ষিত হইল। শিল্পময় ভাবাবেগ এবং সৌন্দর্যের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বসিত একটি অনুভূতির মধ্য দিয়াই ভগবানের সহিত রামকৃষ্ণের প্রথম মিলন ঘটে। ভগবানের সহিত মিলনের আরো বহু পথ আছে—আমরা পরে দেখিব। প্রিয়-বাৎসল্য, ধ্যান, সমাধি, নিষ্কাম কর্ম, করুণা, চিন্তা। এই পথগুলির সংগেও রামকৃষ্ণের পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভগবানের সৌন্দর্যরূপ দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হওয়ার পথটিই ছিল তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক এবং সুপরিচিত। সমস্ত কিছুর মধ্যেই রামকৃষ্ণ বিধাতার সৌন্দর্যরূপ লক্ষ্য করিতেন। তিনি ছিলেন আজন্ম শিল্পী। এ বিষয়ে ভারতের অপর এক মহাত্মার সহিত—মহাত্মা গান্ধী, ইতিপূর্বেই আমি তাঁহার ইউরোপীয় প্রচারক হইয়াছি—তাঁহার কি গভীর পার্থক্যই না দেখা যায়! শিল্পবর্জিত, স্বপ্নবর্জিত মানুষ হইলেন গান্ধী। তিনি সে-গুলিকে কামনা করেন নাই, বরং সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি যুক্তিময় কর্মের মধ্য দিয়া ভগবানের গোচরীভূত হইতে চান। কোনো জাতির নেতৃত্ব করিতে হইলে এইরূপ চাওয়াও অনিবার্য। কিন্তু রামকৃষ্ণের পথ ছিল আরো বিপদসংকুল, অথচ আরো সুদূরপ্রসারী। সে পথ অত্যন্ত পিচ্ছল গিরিগাত্র ধরিয়া আগাইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই পথই অবারিত নিঃসীম দিগ্বলয়ে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে-পথ প্রেমের।

শিল্পী ও প্রেমিক-কবির জাতি বাংগালী। তাই বাংগালীরা এই পথকেই বিশেষভাবে আপন করিয়া লইয়াছে। এ-পথের প্রেরণা ও নির্দেশ দিয়াছেন ভাবোন্মত্ত কৃষ্ণপ্রেমে পাগল শ্রীচৈতন্য।[১] এ-পথের সংগীত দিয়াছেন

১ একটি বাংগালী ব্রাহ্মণ পরিবারে চৈতন্যের (১৪৮৫—১৫৩৩) জন্ম হয়। ধর্মশাস্ত্রে এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বলিয়া প্রচুর খ্যাতি অর্জনের পর তিনি অনুষ্ঠানের ভারে পংগু নিষ্প্রাণ প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সংস্কার করেন। তিনি ভগবানের সহিত ইন্দ্রিয়াতীত মিলনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রেমের এক অভিনব বাণী প্রচারে বাহির হন। সকল ধর্মের ও সকল জাতির নরনারীর নিকটই এই প্রেমের বাণী ছিল অবারিত। তাঁহারা সকলেই ছিলেন ভাই ভাই। এমন কি যাঁহাদের জাতি বলিয়া কিছুই ছিল না, তাঁহাদের কাছেও এই বাণী ছিল অব্যাহত। হিন্দু, মুসলমান, অস্পৃশ্য, ভিক্ষুক, তস্কর, গণিকা, সকলেই একসাথে তাঁহার এই অগ্নিময় বাণী শুনিতে আসিতেন এবং সকলেই শুদ্ধি ও শক্তি লইয়া ফিরিতেন।

চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি[১]—তাঁহাদের মধুমাখা গান। তাঁহারা ছিলেন দেবাংশ, বাংলা মাটির সুবাসিত ফুল—তাঁহাদের গন্ধে বাংলার মাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মাতাল হইয়া আছে। রামকৃষ্ণের আত্মাও সেই একই পদার্থে প্রস্তুত ছিল, সেই একই রক্তমাংস হইতে রক্তমাংস আহরণ করিয়াছিল। তাই রামকৃষ্ণকে চৈতন্য তরুর[২] একটি কুসুমিত শাখা বলিয়াই ভাবা হয়।

এক শতাব্দী কাল ধরিয়া একদল অসামান্য কবি-প্রতিভা তাঁহাদের গীতিকাব্যে এক অপূর্ব জাগরণের সূত্রপাত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন চণ্ডীদাস। তিনি ছিলেন বাংলার এক ভগ্ন দেব-মন্দিরের দরিদ্র পুরোহিত। তিনি একজন গ্রাম্য তরুণীকে ভালোবাসিতেন। তাঁহার কয়েকটি অমর কবিতায় তিনি অতীন্দ্রিয়ভাবে ঐ নারীর স্তুতি করেন। আমাদের ইউরোপীয় গীতিকাব্যের ভাণ্ডারে এমন কিছুই নাই, যাহা এই স্তুতিগুলির মর্মস্পর্শী স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে অতিক্রম করিতে পারে।

১ একটি সম্ভ্রান্ত বংশে বিদ্যাপতির জন্ম হয়। তাঁহার কাব্যের প্রেরণা-স্বরূপিনী ছিলেন জনৈকা রাজমহিষী। তিনি সুকুমার শিল্পাভ্যাসের দ্বারা চণ্ডীদাসের কাব্যের স্বাভাবিক সহজ ত্রুটিহীনতাকে আয়ত্ত করেন। কিন্তু বিদ্যাপতির সংগীতের মূল সুর ছিল আনন্দের। (আমার আন্তরিক কামনা, কোনো সত্যিকারের পশ্চিমী কবি যেন এই কবিতাগুলিকে আমাদের কাব্যোদ্যানে আনিয়া রোপণ করেন। এখানে সেগুলি প্রেমিক-প্রেমিকাদের অন্তরে নব রূপে আবার ফুটিয়া উঠিবে।)

চৈতন্যের শিষ্যেরা সারা বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়েন; তাঁহারা কীর্তনের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া গ্রাম হইতে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা ছিলেন মানবাত্মারূপী ভ্রাম্যমান বধূ—যাঁহারা স্বর্গীয় প্রিয়তমের সন্ধানে ফিরিতেছেন। এই 'জাগ্রত সুষুপ্তের' স্বপ্ন-দর্শনকে গঙ্গার মাঝিমাল্লা, কৃষক সবাই গ্রহণ করিল। ইহারই মধুর প্রতিধ্বনি ভরিয়া তুলিল রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় শিল্পকে—তাঁহার অন্যান্য কবিতা এবং গীতাঞ্জলি কাব্যে। এই কীর্তনেরই তালে তালে শিশু রামকৃষ্ণেরও চরণযুগল নাচিয়া উঠিত। তিনি বৈষ্ণব-সংগীতের রসধারায় লালিত হইয়াছিলেন। আর, একথা বলিলেও অসংগত হইবে না, তিনি নিজেও ছিলেন এই সংগীতের সুন্দরতম প্রকাশ—তাঁহার জীবন ছিল ইহার সুন্দরতম কবিতা।

২ রামকৃষ্ণের প্রজ্ঞাবান শিষ্য ও রামকৃষ্ণের জীবনী-প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি চিঠি হইতে এই প্রশ্নের কয়েকটি দিক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

রামকৃষ্ণ বৈষ্ণব মহাকবিদের রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন সত্য, তবে মনে হয়, তাঁহার পরিচয়টা প্রধানতঃ জনপ্রিয় গানগুলি হইতেই হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ শৈশবেই যাত্রাগানে শিবের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পর তিনি বিশেষভাবে চৈতন্য কর্তৃক অনুপ্রাণিত হন এবং অবশেষে নিজেকে চৈতন্যের সহিত অভিন্নাত্মা বলিয়া আখ্যাত করেন। প্রথম সাক্ষাৎগুলির সময় একবার রামকৃষ্ণ তরুণ নরেনকে (বিবেকানন্দকে) বলেন যে, তিনি পূর্বজন্মে চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই উক্তি যুবক বিবেকানন্দকে বিমূঢ় করিয়া দেয়। রামকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের অতীন্দ্রিয় বাণীকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রচুর চেষ্টা করেন। অবশ্য, ঐ চেষ্টার কথা বাংলাদেশ ভুলিয়া গিয়াছে।

এই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের প্রেমিক ও শিল্পপ্রতিভা তখনো নিজের সম্বন্ধে সচেতন না হইলেও কিছুদিন বাদে ভাবাবিষ্ট হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর। শিশুকাল হইতেই রামকৃষ্ণ সংগীত ও কাব্যের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, তিনি দক্ষতার সহিত মূর্তি গড়িতে পারিতেন এবং সমবয়সীদের নেতৃত্ব করিতেন। একবার গাজনের সময়ে তিনি শিবের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার উপর শিবের ভর হইল। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া দরবিগলিত আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল, দেব-মহিমায় রামকৃষ্ণ আত্মহারা হইয়া গেলেন। গেনিমিডকে[১] বজ্রবাহী ঈগল যেমনভাবে বহিয়া আনিয়াছিল, তিনিও তেমনিভাবে কোথায় যেন বাহিত হইলেন। সকলেই ভাবিলেন, রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইয়াছে।...

ইহার পর হইতে রামকৃষ্ণের ভাবাবেশ ঘন ঘন হইতে লাগিল। ইউরোপে হইলে তাঁহার নিস্তার ছিল না। অবিলম্বেই এই শিশুকে মানসিক-চিকিৎসার কড়া কানুনের কবলে কোনো উন্মাদ-আশ্রমে পাঠানো হইত। জাদুর প্রদীপ নিভিত! বর্তিকার ঘটিত মৃত্যু।[২] অনেক সময় আবার শিশুরও মৃত্যু ঘটে। এমন কি ভারতবর্ষে—যেখানে মায়া-প্রদীপের শোভাযাত্রা অবিরাম চলিতেছে, সেখানেও এই শিশুর পিতামাতা উদ্বেগ অনুভব করিলেন। স্বপ্নাদেশ সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা শিশুর এই ভাবাবেশকে ভীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সাময়িক সংকট-মুহূর্তগুলিকে বাদ দিলে রামকৃষ্ণের স্বাস্থ্য ছিল নিখুঁত। তিনি বহু অতিপ্রাকৃত গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। নিপুণ হাতে তিনি মৃত্তিকা দিয়া দেবতার মূর্তি গড়িতেন; পৌরাণিক কতো সুন্দর কাহিনীই না তাঁহার মনে দানা বাঁধিয়া উঠিত! শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ গীতিগুলি তিনি অপরূপ মাধুর্যের সহিত গাহিয়া বেড়াইতেন! অনেক সময় তিনি তাঁহার অকাল-পরিণত বুদ্ধি লইয়া পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অবতীর্ণ হইতেন এবং তাঁহাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিতেন। ঠিক এমনটি করিতেন যীশু, ঠিক এমনিভাবেই ইহুদি পণ্ডিতদের তিনি বিস্ময়বিমূঢ় করিয়া দিতেন। বালক রামকৃষ্ণের দেহের বর্ণ ছিল স্বচ্ছ গৌর; মস্তকে ছিল কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম; মুখে মৃদু মোহন হাসি; সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর; উদ্দাম বন্ধনহীন মনোভাব।

---

১ গ্রীক দেবতা জিউসের করংকবাহক তরুণ বালক গেনিমিড। জিউসের বাহন ঈগল গেনিমিডকে আকাশপথে বহিয়া আনে। জিউস হিবির স্থলে গেনিমিডকে তাঁহার করংকবাহক নিযুক্ত করেন। —অনুঃ

২ "Au clair de la lune,"—ফরাসী লোক-কাব্যে এই কথাগুলি সুপরিচিত।

তিনি পাঠশালা হইতে পলাইতেন, ছিলেন বাতাসের মতো মুক্ত স্বাধীন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শিশুই ছিলেন, যেন শিশু মোৎসার্ট। তেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্কা মেয়েদের অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিলেন। সম্ভবত, মেয়েরা তাঁহার মধ্যে নারী-সুলভ কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণ ও গোপীদের কাহিনী কিম্বদন্তীর মধ্যে আবাল্য লালিত হওয়ায় একটি নারী-সুলভ প্রকৃতিও তাঁহার অধিগত হইয়া গিয়াছিল। তিনি একটি বাল-বিধবা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহার গৃহে প্রেমিকরূপে দর্শন দিবেন কৃষ্ণ, এই ছিল তাঁহার শৈশবের স্বপ্ন। এমনি আরো কতো বিভিন্ন জন্মের কল্পনা তিনি করিতেন, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। প্রোটিয়াসের[১] মতো ছিল তাঁহার আত্মা। তিনি যাহাই দেখিতেন বা কল্পনা করিতেন, তাহাই মুহূর্তে আপনা হইতেই তাঁহার মধ্যে রূপায়িত হইত। এইরূপ রূপ-গ্রহের শক্তি কম-বেশি সকলের মধ্যেই থাকে। ইহার নিম্নতর প্রকাশ দেখা যায় অভিনয়ের মধ্যে। অভিনেতারা মুখের ভাবভঙ্গী ও মানসিক অভিব্যক্তির অনুকরণ করেন। ইহার উচ্চতম (যদি এই কথা ব্যবহার করা চলে) প্রকাশ হইল ভগবানের মধ্যে—ভগবান, যিনি স্বয়ং বিশ্বনাট্যের অভিনয় করেন। রূপগ্রহের এই শক্তি শিল্প ও প্রেমের চিহ্ন। রামকৃষ্ণ পরবর্তী কালে যে বিস্ময়কর শক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহা ছিল বিশ্বের সকল সত্তাকে আপন করিয়া লইবার প্রতিভা। এই প্রতিভার পূর্বাভাস রামকৃষ্ণের বাল্য-জীবনেই পাওয়া যায়।

রামকৃষ্ণের বয়স যখন সাত বৎসর, তখনই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পরবর্তী কয়েক বৎসর তাঁহাদের সংসারে ধন-সম্পত্তি না থাকায় অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে কাটিতে থাকে। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার[২] কলিকাতা গিয়া একটি পাঠশালা খুলেন। ১৮৫২ খৃস্টাব্দে রামকৃষ্ণকে তিনি সেখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের তখন বাড়ন্ত বয়স। দুরন্ত চঞ্চল, অন্তরতর একটি জীবনের তাড়নায় অশান্ত। তাই তিনি লেখাপড়া শিখিতে চাহিলেন না।

ঐ সময়ে নিম্নশ্রেণীর একজন ধনী মহিলা ছিলেন, তাঁহার নাম রাণী রাসমণি। কলিকাতা হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে গঙ্গার পূর্বতীরে দক্ষিণেশ্বরে তিনি মহাদেবী কালিকার একটি মন্দির স্থাপন করেন। সেখানে পুরোহিতের কাজ করিবার জন্য

১ প্রোটিয়াস—ইনি সমুদ্র-দেবতা। এঁর সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে, ইনি নিজেকে অসংখ্য রূপে ও মূর্তিতে প্রকাশ করিতে পারিতেন।—অনুঃ

২ পিতার পাঁচজন পুত্রকন্যার মধ্যে রামকৃষ্ণ ছিলেন চতুর্থ।

একজন ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইতেছিল। ধর্মভীরু ভারতবর্ষে লোকে সাধু-সন্ন্যাসী ও মুনি-ঋষির প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধাবান হইলেও মাহিনা-করা পদের প্রতি সেখানে কাহারো বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। ইউরোপের মতো ভারতবর্ষের মন্দিরগুলি ভগবানের দেহ ও মন নয়—সেখানে নিত্য নূতন করিয়া প্রতিদিন ভগবানের নিকট বলি প্রদত্ত হয়। সেখানে দেশের ধনী-মহাজনরা বিধাতার দরবারে সুযোগ-সুবিধা পাইবার প্রত্যাশায় দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সত্যকারের যাহা ধর্ম, তাহা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে ধর্মের মন্দির প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আত্মা। তাহা ছাড়া, এক্ষেত্রে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন শূদ্রাণী। তাই মন্দিরের দায়িত্ব গ্রহণে ব্রাহ্মণের জাতিচ্যুত হইবার ছিল সম্ভাবনা। অবশেষে ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে ঐ পদ গ্রহণ করিতে রামকৃষ্ণ মনস্থ করিলেন। কিন্তু জাতি-বিচারের ব্যাপারে তাঁহার দাদার অত্যন্ত গোঁড়ামি ছিল। তিনি এই ব্যাপারটিকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই বিরোধিতায়ও ভাটা পড়িল। পর বৎসর দাদার মৃত্যু হইলে রামকৃষ্ণ ঐ চাকরি লইবেন স্থির করিলেন।

২

মা কালী

তখন মা কালীর তরুণ পুরোহিতের বয়স মাত্র বিশ। তিনি জানিতেন না, কী ভয়ংকর কর্ত্রীর সেবার ভার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছেন। দেবী যেন আনন্দে গর্জমানা ব্যাঘ্রী—সে গর্জন শিকারকে মুগ্ধ করে। রামকৃষ্ণের দীর্ঘ দশ বৎসর কাল দেবীর জ্যোতির্ময় মূর্তির তলে সম্মোহিতের মতো কাটিয়া গেল। গ্রাস করিবার পূর্বে দেবী যেন তাঁহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মন্দিরে দেবীর সহিত রামকৃষ্ণ একাকী বাস করিতেন, যদিও চারিদিকে যেন ঝড়ের আবর্ত বহিত। দলে দলে আসিত স্বপ্নাদিষ্ট মানুষ। তাহাদের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে উঠিত ধূলির ঘূর্ণি, এবং সে-ঘূর্ণি দ্বারপথে আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিত। আসিত হিন্দু, মুসলমান, সংখ্যাতীত কতো তীর্থযাত্রী, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ, মুসাফির, ভগবৎ-উন্মত্ত মানুষের দল[১]।

পাঁচটি গম্বুজ-সমন্বিত বিশাল মন্দির। প্রতি গম্বুজের উপরে একটি করিয়া চূড়া। গঙ্গার তীর হইতে একটি প্রশস্ত প্রাংগণ মন্দির অবধি পৌছিয়াছে। প্রাংগণের দুই দিকে দ্বাদশ শিবের ক্ষুদ্র গম্বুজওয়ালা দ্বাদশ মন্দির। পাষাণে বাঁধানো বিরাট চতুষ্কোণ প্রাংগণের অপর দিকে রাধাকৃষ্ণের বিশাল মন্দির[২]। মন্দিরটি কালী-

---

১ তাঁহারা বাইবেলে উল্লিখিত ভগবৎ-উন্মত্তদের মতো। একমাত্র ওঁ-ধ্বনিই তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিত। তাঁহারা কখনো নাচিতেন, কখনো হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেন, কখনো মহামায়াকে দিতেন বাহবা। অনেকে ছিলেন উলংগ: তাঁহারা উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া খাইতেন: পথের কুকুরের সহিত বসবাস করিতেন ; বস্তুর মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাইতেন না ; সকল বিষয়েই থাকিতেন নির্লিপ্ত, নির্বিকার। অতীন্দ্রিয় সাধকরাও আসিতেন। আসিতেন সুরাসক্ত তান্ত্রিকরা। রামকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকেই সতর্ক উদ্বিগ্ন চক্ষে লক্ষ্য করিতেন, কখনো বিরক্ত হইতেন, কখনো আবার আকৃষ্ট হইতেন। (পরবর্তী কালে তিনি তাঁহাদের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়াছেন, অনেক সময় তামাসা রসিকতাও করিয়াছেন।)

২ মন্দিরটি এখনো রহিয়াছে। রামকৃষ্ণের কক্ষটি ছিল প্রাংগণের উত্তর-পশ্চিম কোণে, দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক পাশেই। কক্ষটির পাশে একটি অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা ছিল। ছাদটি ছিল কয়েকটি থামের উপর ন্যস্ত। পশ্চিম দিকটি গংগার উপর খোলা। সুবৃহৎ নাটমন্দিরের সম্মুখেই প্রশস্ত প্রাংগণ। দুইদিকে অতিথিশালা এবং ভোগশালা। পশ্চিমে ছায়াশীতল সযত্নে সুরক্ষিত সুন্দর একটি উদ্যান। উত্তরে ও পূর্বে দুইটি পুষ্করিণী। উদ্যানের ওদিকে পাঁচটি বটবৃক্ষ। রামকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারেই এগুলি রোপিত হয়। পরবর্তীকালে এই পাঁচটি বটবৃক্ষ 'পঞ্চবটী' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এখানেই রামকৃষ্ণ মায়ের ধ্যানে ও উপাসনায় সময় কাটাইতেন। নীচ দিয়া কল-স্বনে গঙ্গা বহিয়া যাইত।

মন্দিরের অপেক্ষা উঁচুতে ঈষৎ ছোটো। এখানে সমগ্র বিশ্বের একটি প্রতীককে মূর্ত করা হইয়াছে। স্বর্গ-মর্ত্যের শূন্যতা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন ত্রিশক্তি—প্রকৃতি (কালী), পরম পুরুষ (শিব) ও প্রেম (রাধাকৃষ্ণ)। তবে, কালীই এখানে অধীষ্ঠাত্রী দেবী।

মন্দির অভ্যন্তরে কঠিন কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিতা দেবী মূর্তি। পরিধানে বহুমূল্য বেনারসী শাড়ী। বিশ্ব-সম্রাজ্ঞী। ইন্দ্রানী। দেবী লাস্যময়ী, শিবের ভূলুণ্ঠিত দেহের উপর নৃত্যমানা। তাঁহার দুইটি বাম হস্তের একটিতে খড়্গ, অপরটিতে ছিন্ন মুণ্ড। একটি দক্ষিণ হস্তে প্রসাদ এবং অপরটিতে মাভৈঃ বরাভয় মুদ্রা। তিনি মহা-প্রকৃতি। সৃষ্টিস্বরূপিণী। তিনি প্রলয়ংকরী। না, শুনিবার মতো যাহাদের কান আছে, তাঁহাদের কাছে তিনি তাহা অপেক্ষাও অধিক। তিনি বিশ্ব-প্রসবিনী। "তিনি সর্বশক্তিময়ী, আমার জননী, তিনি বিভিন্ন রূপে তাঁহার সন্তানদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি পরিদৃশ্যমান বিধাতা। তিনি তাঁহার নির্বাচিতদের অদৃশ্য দেবতার কাছে পথ দেখাইয়া লইয়া যান। তিনি ইচ্ছা করিলেই সকল সৃষ্টির মধ্য হইতে অহমের শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারেন, তাহাকে পরম পুরুষের চরম চৈতন্যের মধ্যে লীন করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার কৃপায় সীমাবদ্ধ অহম্ অসীম অহমের—আত্মার ব্রহ্মের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যায়।"[১]

কিন্তু এখনো এই বিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ পুরোহিত—এমন কি বুদ্ধির বাঁকা পথ ধরিয়াও—যেখানে সকল বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেই অন্তরতম লোকে পৌছিতে পারেন নাই। তখনো সেখান হইতে তিনি বহু দূরে। তখনো স্বর্গীয় কিম্বা মানবীয় একটিমাত্র বাস্তবতা তাঁহার অধিগম্য ছিল—যাহা তিনি দেখিতে শুনিতে বা স্পর্শ করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে অন্যান্য নরনারীর সঙ্গে তাঁহার কোনো পার্থক্য ছিল না। ভারতীয় বিশ্বাসীরা যে দিব্য দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সেগুলির তীব্র রূপময়তা ইউরোপীয় বিশ্বাসীদের নিকট অত্যন্ত অদ্ভুত লাগিবে। ক্যাথলিকদের অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর লাগিবে প্রোটেস্টান্ট খৃস্টানদের কাছে। পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন:

"আপনি কি ভগবানকে দেখিয়াছেন?"

উত্তরে রামকৃষ্ণ বলেন:

"আমি তোমাকে যেমন দেখিতেছি, তেমনি ভাবেই তাঁহাকে দেখিয়াছি। তবে তাহা আরো অনেক তীব্রতর ভাবে।" অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক ও ভাবময় রূপে নহে। অবশ্য, সেভাবেও তিনি ভগবানকে দেখিবার চেষ্টা এবং অভ্যাস করেন।

---

১ রামকৃষ্ণ।

আর ইহা যে মাত্র কয়েকজন অনুপ্রাণিত মানুষের বিশেষ অধিকার, এমনো নহে। প্রত্যেক অকপট হিন্দু ভক্তই সহজে এই অবস্থা লাভ করেন। আজো তাঁহাদের মধ্যে সৃষ্টির উৎস-ধারা শাশ্বত ও পর্যাপ্ত রহিয়াছে। নেপালের কোনো এক সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা ও তরুণী রাজকন্যার সংগে আমাদের একজন বন্ধু মন্দিরে গিয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যে একটি মাত্র দীপ জ্বলিতেছিল। তাহারই নিষ্প্রভ আলোকে, ধূপ ও ধুনার গন্ধে মাতাল নীরব নির্জনতায় তিনি ঐ মেয়েটিকে উপসনার জন্য একা রাখিয়া বাহিরে আসেন। পরে রাজকন্যা বাহিরে আসিয়া শান্ত কণ্ঠে বলেন :

"আমি রামচন্দ্রকে দেখিয়াছি।"

সুতরাং দৈহিক মূর্তিতে কালীমাতাকে রামকৃষ্ণ না দেখিয়া কেমন করিয়া পারেন? তিনি দৃশ্যমানা। প্রাকৃতিক এবং ঐশী শক্তি, একটি নারী রূপের মধ্যে মূর্তিলাভ করিয়াছে। এই রূপেই তিনি মানুষের সহিত যোগ স্থাপন করেন। তিনি কালী। মন্দিরের মধ্যে তিনি রামকৃষ্ণকে আপনার দেহগন্ধে আবিষ্ট করিয়া ফেলিলেন, আপনার বাহুপাশে তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন, আপনার জটিল কেশজালে তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তিনি প্রাণহীন মূর্তি বা তাঁহার মুখের হাসি অংকিত চিহ্ন-মাত্র নহে। শাস্ত্রবাক্যে তাঁহার ক্ষুধা মিটে না। তিনি জীবন্ত। তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন। তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠেন, আহার করেন, বিহার করেন, আবার শয়ন করেন। দিনের ছন্দে মন্দিরে তাঁহার নিয়মিত সেবার কার্য চলে। প্রতি প্রত্যূষে ঘণ্টা বাজে, আরতির আলো জ্বলে। নাটমন্দিরে সানাই বাজে, বাজে করতাল, মৃদংগ। মা ঘুম ভাঙিয়া উঠেন। মার সজ্জার জন্য উদ্যান হইতে আসে গোলাপ, রজনীগন্ধা, চম্পক। সকাল নটা বাজার সংগে সংগে পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠে, মা পূজায় আসেন। দ্বিপ্রহরে যখন রৌদ্র প্রখর হয়, মা তাঁহার রজত শয্যায় শয়ন করিতে যান[১]—আবার বাদ্য বাজে। সন্ধ্যা ছটার সময় আবার বাদ্য বাজিয়া উঠে, মা আবার আসেন। সন্ধ্যারতির দীপের ছন্দে ছন্দে বাদ্য চলিতে থাকে। শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি চলে অবিরাম। রাত্রি নটায় ঐ বাদ্যই আবার মার শয়নের সময় ঘোষণা করে। মা নিদ্রিত হন।

সমস্ত দিন মার আহার-বিহারে, সকল কাজেই, রামকৃষ্ণ তাঁহার সাথে সাথে থাকিতেন। তিনিই তাঁহাকে পোশাক পরাইতেন, পোশাক ছাড়াইতেন। তিনি দিতেন ফুলের অর্ঘ্য, আহার্য। শয়ন—উত্থান, সকল সময়েই তিনি মার সাথে

১ মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে।

থাকিতেন। সুতরাং রামকৃষ্ণের হস্ত, চক্ষু, মন ধীরে ধীরে দেবীর রক্ত-মাংসের সহিত ঘনিষ্ঠ না হইয়া কেমন করিয়া পারিত? দেবীর প্রথম স্পর্শ রামকৃষ্ণের হস্তে দংশনের মতো লাগিয়াছিল এবং সেই দংশনই তাঁহাদিগকে চিরদিনের জন্য সংযুক্ত করিয়াছিল।

কিন্তু দংশনের পর দেবী অন্তর্হিতা হইলেন এবং রামকৃষ্ণের নিকট হইতে দূরে দূরে রহিলেন। দেবী-মক্ষিকা রামকৃষ্ণকে প্রেমের দংশন দিয়া আপনার পাষাণ আবরণের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন। তাঁহাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার সকল চেষ্টাতেই রামকৃষ্ণ ব্যর্থ হইলেন। এই মূক দেবীর প্রতি একটি উদগ্র কামনা তাঁহাকে পলে পলে দগ্ধ ও ক্ষয় করিতে লাগিল। দেবীকে স্পর্শ করিতে, আলিংগন করিতে, বারেকের জন্য তাঁহার দৃষ্টি, নিঃশ্বাস বা মৃদু হাসি—জীবনের স্বল্পতম সংকেত, পাইতে রামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনের সকল চেষ্টা নিয়োগ করিলেন। ইহাই তাঁহার সমগ্র অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। উদ্যানের বনাকীর্ণ অংশে রামকৃষ্ণ উন্মত্তের মতো মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন, ধ্যান করিলেন, প্রার্থনা করিলেন, দেহের সকল পরিধান, এমন কি উপবীত পর্যন্ত, যাহা ব্রাহ্মণ কখনো ত্যাগ করেন না—তাহাও তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মার ভালোবাসাই তাঁহাকে শিখাইল, সকল সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে মানুষ কখনো ভগবানে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। দিশাহারা শিশুর মতো রামকৃষ্ণ মার দেখা পাইবার জন্য মাকে আকুলভাবে ডাকিতে লাগিলেন। ব্যর্থ চেষ্টায় এক একটি দিন তাহার কাটিতে লাগিল, তিনি ক্রমে আরো উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে নিজের উপর তাঁহার সকল অধিকার বিলুপ্ত হইল। হতাশায় তিনি যাত্রীদের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি করুণার, বিদ্রূপের, এমন কি, নিন্দার পাত্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার নিকট কেবল একটি মাত্র বস্তুর মূল্য রহিয়াছে। তিনি জানেন, তিনি পরমানন্দের উপকূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, কেবল মাত্র একটি সূক্ষ্ম আবরণ সেখানে ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছে। অবশ্য, অতি সূক্ষ্ম হইলেও তিনি তাহা ভেদ করিতে পারিতেছেন না। ভাবাবেশকে কেমন করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, তাহার রীতিনীতি তিনি জানেন না, যদিও সেই রীতিনীতি বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের ধর্মজ্ঞানীরা চিকিৎসাশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের মতোই পুংখানুপুংখরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি অন্ধ প্রলাপ-রোগীর মতো দিশাহারা হইয়া পথ খুঁজিতে লাগিলেন। ভাবোচ্ছ্বাস সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় রামকৃষ্ণের

মৃত্যুর সম্ভাবনাও দেখা দিল। বহু অনভিজ্ঞ যোগীকেই, যাঁহারা এই গভীর গহ্বরের তীরবর্তী পিচ্ছল পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ঐ সময় রামকৃষ্ণকে উন্মত্ত দিশাহারা অবস্থায় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন রামকৃষ্ণের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ রক্তে রাঙা হইয়া উঠিত, দুই চক্ষে দরবিগলিত অশ্রু বহিত, সর্বাংগ কম্পিত হইত। তিনি শারীরিক সহন-শক্তির সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। কেহ যখন এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন তাঁহার চক্ষে হয় সন্ন্যাসরোগের সর্বব্যাপী অন্ধকার নামিয়া আসে, নয়, তিনি দিব্য দর্শনের আলোক লাভ করেন। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো গতি নাই।

অবশেষে অকস্মাৎ আবরণ সরিয়া গেল এবং রামকৃষ্ণ দেখিলেন!

তাঁহার আত্মকথা আমরা তাঁহার মুখেই শুনিব।[১] আমাদের ইউরোপের "ভগবৎ-উন্মত্ত" শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টাদের মতোই তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠস্বর আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হউক:

"একদিন অসহ্য যন্ত্রণায় আমি কাতর হইয়া উঠিলাম। আমার হৃদয় কে যেন সিক্ত বস্ত্রের মতো নিঙড়াইতে লাগিল।···যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমি কখনই আর দেবীর দর্শন পাইব না, এমনি একটি চিন্তা আমার মনে উদয় হইবার সংগে সংগেই অকস্মাৎ মুহূর্তে আমি যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, যদি তাহাই হয়, তবে এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? দেবির মন্দিরে খড়্গ ঝুলিতেছিল, চোখে পড়িল। বিদ্যুতের মতো চকিতে একটি চিন্তা আমার মস্তিষ্কে খেলিয়া গেল। খড়্গ! খড়্গ দিয়াই আমি ইহ-জীবনের অবসান করিব! আমি ছুটিয়া গিয়া উন্মত্তের মতো খড়্গটি হাতে লইলাম।···মুহূর্তে আমার সম্মুখ হইতে দরজা, জানালা, এমন কি মন্দির পর্যন্ত সমস্ত দৃশ্য বিলুপ্ত হইয়া গেল।···মনে হইল, কোনো কিছুর আর অস্তিত্ব নাই। তাহার পরিবর্তে আমি দেখিতেছি, কেবল অসীম জ্যোতিষ্মান আত্মার এক মহাসমুদ্র। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি, কেবল জ্যোতির তরংগ তুলিতেছে। এবং সেই তরংগমালা গর্জন করিতে করিতে আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! মুহূর্তে তরংগদল আমার উপরে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল, আমার উপর ফেনিল উচ্ছ্বাসে ভাঙিয়া পড়িল, আমাকে গ্রাস

১ আমি এই বর্ণনার জন্য স্বয়ং রামকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত তিনটি পৃথক বর্ণনার সাহায্য লইয়াছি। এই তিনটির মধ্যে একই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি কাহিনীতে কয়েকটি বিশদ বর্ণনা আছে, যাহা অপর দুইটি বর্ণনাকে সমৃদ্ধতর করে।

করিল। আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইল। আমি অচেতন[১] হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম।...সেদিন এবং তাহার পরদিন কীভাবে আমার কাটিল, আমি জানি না। আমার চতুর্দিকে এক অক্ষয় আনন্দের সমুদ্র অবিরাম দুলিতে লাগিল। আমার আত্মার গভীরে আমি অনুভব করিলাম, মা তথায় বিরাজ করিতেছেন[২]।"

লক্ষণীয় যে, এই সুন্দর বর্ণনার মধ্যে একবারে শেষে ভিন্ন মার কোনো উল্লেখ নাই। মা মহাসমুদ্রের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণের শিষ্যরা তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, তিনি সত্যই মাতৃমূর্তি দেখিয়াছেন কিনা। তাঁহারা রামকৃষ্ণের মুখের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "তিনি কোনো উত্তর দেন নাই। তবে ভাবাবেশ-শেষে প্রকৃতিস্থ হইবার সময় তিনি অনুযোগের স্বরে কেবল অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 'মা' 'মা' !"

যদি ঔদ্ধত্য মার্জনা করেন, তবে এ-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মত হইল তিনি ঐরূপ কিছুই দেখেন নাই। কেবল দেবীর সর্বব্যাপী অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি 'সচেতন' ছিলেন এবং ঐ মহাসমুদ্রকেই তিনি মায়ের নামে আহ্বান করেন। ছোটো খাটো দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল স্বপ্নদর্শনের অনুরূপ। স্বপ্নে মানুষের মন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের আকারে উহার চিন্তা সত্তাকে আরোপ করে, অথচ তাহাতে বিন্দুমাত্র বৈষম্য অনুভব করে না। আমাদের প্রীতির পাত্র সমস্ত বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে। আকারের ভিন্নতা উহার বাহিরের আবরণ মাত্র। যে-মহাসমুদ্র রামকৃষ্ণের উপর বিপুল তরংগভংগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, অবিলম্বে তাহার তটদেশে আমি আভিলার সেণ্ট থেরেসাকে প্রত্যক্ষ করিলাম। সেণ্ট থেরেসাও এমনি ভাবে প্রথমে অনুভব করেন যে, তিনি অসীমের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছেন। পরে অবশ্য তাঁহার খৃস্টান বিবেক এবং তাঁহার নির্দেশকদের কঠোর সতর্ক তিরস্কার তাঁহাকে তাঁহার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস

১ পুস্তকে হুবহু এই কথাগুলি আছে: 'আমি আমার স্বাভাবিক চেতনা হারাইলাম।' এই কথাগুলির গুরুত্ব আছে। কারণ, কাহিনীর অবশিষ্টাংশ হইতে দেখা যায়, বিপরীত পক্ষে, অন্তর্বিশ্বের উচ্চতর চেতনাই অধিকতর বোধশক্তিসম্পন্ন ছিল।

২ স্বামী সারদানন্দ রচিত 'মহাপ্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ', দ্বিতীয় খণ্ড। এই পুস্তকখানি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের মাইলাপুর রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে সারদানন্দের মৃত্যু হয়। তিনি রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ছিলেন। রামকৃষ্ণের মতোই ইনি ভারতীয় ধার্মিক ও দার্শনিক মনীষীদের অন্যতম। তাঁহার রচিত রামকৃষ্ণের জীবনী যেমন কৌতুহলোদ্দীপক, তেমনি নির্ভরযোগ্য। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থখানি অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

সত্ত্বেও ভগবানকে 'মানব-পুত্র' যিশুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল।[১]

কিন্তু প্রেমিক রামকৃষ্ণকে নিজের অভিরুচির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয় নাই। বরং এই মানসিক বৃত্তিই তাঁহাকে নিরাকার হইতে সাকারের মধ্যে পৌছাইয়া দিয়াছিল। রামকৃষ্ণ আকারের মধ্যেই প্রিয়তমকে পাইতে চাহিয়াছিলেন। কারণ, একবার মুহূর্তের জন্য মূর্তিকে দেখিবার ও পাইবার পর তাহাকে ছাড়া তাঁহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও ছিল অসম্ভব। ঐ দিন হইতে যদি তিনি এই আগ্নেয় দিব্য মূর্তিকে অবিরত নিত্য নূতন করিয়া না পাইতেন তাহা হইলেও তিনি বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইহাকে বাদ দিয়া তাঁহার নিকট সমগ্র বিশ্বই ছিল মৃত, নিষ্প্রাণ এবং জীবন্ত মানুষগুলি ছিল পর্দার উপর অসার ছায়ায় অংকিত চিত্র মাত্র।

কিন্তু যিনিই এই অসীমের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাঁহাকেই শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। প্রথম দর্শনের বিস্ময়টি এতোই ভয়ংকর ছিল যে, রামকৃষ্ণ কয়েকদিন কম্পমান অবস্থাতেই কাটাইলেন। তাঁহার চারিদিকের সকলকে তিনি একটি অপস্রিয়মান কুয়াসার, অগ্নিগর্ভ দ্রবীভূত রৌপ্যতরংগের, মধ্য দিয়া দেখিতে

১ থেরেসাও যখন এই অদৃশ্য শক্তির আকস্মিক প্লাবন ও আক্রমণ অনুভব করিয়াছিলেন, তখন তিনিও ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। পরবর্তীকালে সালসেডো এবং গ্যাসপার্ড ডাক্তার কঠিন নির্দেশ অনুসারে তিনি প্রচুর দুঃখ যন্ত্রণা সত্ত্বেও 'অসীমকে' খৃস্টের সসীম দেহের মধ্যে সীমায়িত করিতে বাধ্য হন।

তাহা ছাড়া, রামকৃষ্ণের ভাবাবেশ-কালে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সত্য প্রকাশের স্বাভাবিক পথেই ঘটিয়াছিল। মিঃ স্টারবাক এ-সম্বন্ধে 'দি সাইকোলজি অফ্ রিলিজন' (ধর্মের মনস্তত্ত্ব) নামে যে সকল দলিলপত্র সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি দ্রষ্টব্য। মিঃ উইলিয়াম জেম্‌স্‌ও এই সংগ্রহই ব্যবহার করিয়াছেন। প্রায় প্রতি বারেই এইরূপ ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে, যখনই চেষ্টার অবসান হইয়াছে, তখনই বেদনার মধ্য দিয়া আত্মার জয় হইয়াছে। নৈরাশ্যই পুরাতন আত্মাকে বিধ্বস্ত করিয়া নূতন আত্মার পথ রচনা করিয়া দিয়াছে।

আবার ইহাও লক্ষণীয় যে, সমস্ত শ্রেষ্ঠ দিব্যদৃষ্টিই আলোক ও সামুদ্রিক বন্যার মধ্য দিয়াই দেখা দিয়াছে। মিঃ উইলিয়াম জেম্‌স রচিত 'ভ্যারাইটিজ অব রিলিজিয়াস একস্‌পিয়েরেন্স' দ্রষ্টব্য। উহাতে প্রেসিডেণ্ট ফিন্নের দিব্য দর্শনের একটি সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে:

"সত্যই মনে হইল, তরলিত প্রীতির উচ্ছ্বাস তরংগের পর তরংগে বহিয়া আসিতেছে।……এই তরংগমালা কেবলই বারে বারে আমার উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল; আমাকে আচ্ছন্ন করিল, গ্রাস করিল। অতঃপর শক্তি সঞ্চয় করিয়া আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, 'যদি এই তরংগের স্রোত আর আমার উপর বহিতে থাকে তবে আমি বাঁচিব না।' বলিলাম, 'প্রভু! আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না!' অথচ আমার কোনো মৃত্যুভয় ছিল না!"

এই সংগে টমাস ম্যা ন'র কর্তৃক লক্ষিত ও বর্ণিত শ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয় সাধকগণের চমকপ্রদ কাহিনীগুলিও তুলনীয়।

লাগিলেন। চক্ষুর, দেহের ও মনের উপর সকল অধিকার হারাইয়া ফেলিলেন। একটি ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহার সময় কাটিতে লাগিল। তিনি মার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর অকস্মাৎ রামকৃষ্ণ বুঝিলেন, মা তাঁহাকে ভর করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ আর বাধা দিলেন না "Fiat Voluntas tua!…[১]" মা-ই তাঁহাকে ব্যাপ্ত পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। কুয়াশার অস্পষ্টতার মধ্য হইতে ধীরে ধীরে মার বস্তুগত রূপ জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সর্বপ্রথমে একখানি হাত, তারপর নিঃশ্বাস, কণ্ঠস্বর এবং অবশেষে সমগ্র দেহ। নিম্নে কাব্যকল্পনার অপূর্ব একটি উদাহরণ উদ্ধৃত হইল। এমন আরো বহু আছে:

সন্ধ্যা হইয়াছে। দৈনিক কৃত্য সমাপান্তে মাকে নিদ্রিত ভাবিয়া রামকৃষ্ণ তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ঘুমাইতে পারিলেন না, কান পাতিয়া রহিলেন।…শুনিলেন, মা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং বালিকাসুলভ চাপল্যের সহিত দ্বিতলে চলিয়া গেলেন। চলার সময় তাঁহার পায়ের নূপুর রুণুঝুণু বাজিতে লাগিল। রামকৃষ্ণ বিস্মিত হইলেন। তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিতে লাগিল। রামকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে উঠানে আসিয়া উপরের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন, মা দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া গঙ্গার জলধারা দেখিতেছেন। দেখিতেছেন, সুন্দর রাত্রির বুকে সেই স্রোতধারা দীপদীপ্ত কলিকাতার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।…

তারপর রামকৃষ্ণের দিন রাত্রি মার অবিরাম সান্নিধ্যেই কাটিতে লাগিল। নদী-স্রোতের মতো নিরবচ্ছিন্ন চলিল তাঁহাদের ভাববিনিময়। অবশেষে রামকৃষ্ণ দেবীর সহিত এক হইয়া গেলেন। ক্রমেই তাঁহার অন্তরতর দৃষ্টির আলোক-প্রভাবও বাহিরে প্রকাশিত হইল। তাঁহার দেহ যেন বাতায়ন, সেই পথে বিভিন্ন দেবতার রূপ দেখা দিতে লাগিল। একদিন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণির জামাতা মন্দিরের মালিক মথুরবাবু রামকৃষ্ণের কক্ষের ঠিক বিপরীত দিকে তাঁহার নিজের কক্ষে বসিয়াছিলেন। তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া রামকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ বারান্দায় এ-দিকও-দিক পায়চারি করিতেছেন। অকস্মাৎ মথুরবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন, রামকৃষ্ণ একদিকে

১ **Fiat voluntas tua !**—তোমার অভিলাষই পূর্ণ হোক!

যাইবার সময় শিবমূর্তি এবং অন্যদিকে যাইবার সময় কালিকা মূর্তি ধারণ করিতেছেন।

অধিকাংশ লোকের নিকট রামকৃষ্ণের প্রেমোন্মত্ততা অত্যন্ত নিন্দার্হ ছিল। মন্দিরের কৃত্য অনুষ্ঠানগুলি তিনি আর করিতে পারিতেন না। অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেই তিনি আকস্মিকভাবে সংজ্ঞাহীন হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেন। তাঁহার অংগপ্রত্যংগের সংযোগস্থলগুলি প্রস্তর মূর্তির মতো কঠিন হইয়া উঠিত। আবার অন্য সময়ে তিনি দেবীর সংগে এমন ঘনিষ্ঠ আচার-ব্যবহার করিতেন, যাহা অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিত।[১] তাঁহার দৈহিক ক্রিয়াকলাপ কখনো কখনো সাময়িকভাবে বন্ধ থাকিত। তাঁহার চক্ষে পলক পড়িত না। তিনি আহার পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সংগে থাকিতেন। তিনি রামকৃষ্ণের অপরিহার্য প্রয়োজনগুলির দিকে লক্ষ্য না দিলে রামকৃষ্ণের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। এই অবস্থায় ইহার অনুগামী কুফলগুলিও দেখা দিল। পশ্চিমদেশীয় দ্রষ্টারাও সেগুলির হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। দেহের ত্বক ভেদ করিয়া রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা চুয়াইতে লাগিল। মনে হইল, তাঁহার সারা দেহে যেন আগুন জ্বলিতেছে। তাঁহার আত্মা একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, যাহার নৃত্যমান শিখাগুলি এক একটি দেবতা। কিছুকাল বাদে যখন তিনি আশেপাশে লোকদিগের মধ্যেও দেবতাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি নিজেই ভগবানে পরিণত হইলেন। (তিনি একজন গণিকার মধ্যে সীতাকে এবং বৃক্ষের পাশে পায়ের উপর পা দিয়া দণ্ডায়মান কোনো ইংরেজের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেন।) তিনি হইলেন কালী, রাম, রাধা[২], সীতা এবং মহাবীর হনুমান[৩]। এ-গুলি ছিল সমস্ত দেবতাকে আত্মসাৎ

১ যে-সকল পৃষ্ঠপোষক চিরদিন তাঁহাকে বিশ্বস্ততার সহিত সকল আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও তিনি আর কোনো প্রকার পক্ষপাত দেখাইতেন না। একদা মন্দিরের ধনী সেবাইত ও প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণি প্রার্থনাকালে অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার সামান্য চিন্তাগুলিও লক্ষ্য করিলেন এবং সকলের সম্মুখেই তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু রাসমণি শান্ত রহিলেন, ভাবিলেন, মা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন।

২ পরে রামকৃষ্ণ ছয় মাসের জন্য কৃষ্ণ-প্রেমিকা গোপিনীর রূপ ধারণ করেন।

৩ রূপগ্রহের এই ধারাটি অতি সুন্দর। প্রথমে তিনি দীনতম হনুমান হইতে সুরু করিয়া যাঁহারাই রামচন্দ্রের সেবা করিতেন, তাঁহাদের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে রামরূপ লাভ করেন। অবশেষে, রামকৃষ্ণের নিজের ধারণা, পুরস্কার স্বরূপ সীতা তাঁহার নিকট আবির্ভূতা হন। এবারেই প্রথম তিনি চক্ষু মুদিয়া দিব্য দর্শন লাভ করেন। পরেও তিনি যে সকল দর্শনলাভ করিয়াছেন, সেগুলিও এমনি বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া

করিবার অতৃপ্ত একটি লালসা—আবেগের তাড়নায় উন্মত্ত, ভয়াল তরংগাঘাতে দোলায়মান আত্মার প্রলাপ। ইহার না ছিল নিবারণ, না ছিল নিয়ন্ত্রণ। এগুলির বিশদ বিবরণ আমি দিতে চাই না, তবে এইগুলিকে অবহেলা করিবার মতো ইচ্ছাও আমার নাই। পরে দেবতারাও অবশ্য প্রতিশোধ লইলেন, তাঁহারা সকলেই রামকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে চাহিলেন। আমার পশ্চিমদেশীয় পাঠকদিগকে আমি প্রতারণা করিতে চাহি না। এই ভগবৎ-উন্মত্তকে উন্মাদ-আগারে পাঠানো উচিত ছিল কিনা, তাহা তাঁহারা নিজেরাই বিচার করিবেন। এ-বিষয়ে আমার মতো তাঁহাদেরও বিচারের স্বাধীনতা আছে। কারণ, উন্মাদ-আশ্রমে পাঠাইবার পক্ষেও কয়েকটি যুক্তি পাওয়া যাইবে। এমন কি ভারতবর্ষের বহু শ্রদ্ধেয় সাধু ব্যক্তিও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় রামকৃষ্ণ ধৈর্যের সহিত চিকিৎসকদের হাতে আত্মসর্পণ করেন এবং তাঁহাদের ব্যর্থ উদ্ধত ব্যবস্থাগুলিকে মানিয়া চলেন। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার অতীত দিনগুলির কথা ভাবিয়া দেখেন এবং যে অতল গভীরতা হইতে তিনি রক্ষা পাইয়াছেন তাহার পরিমাপ করেন, তখন অবাক হইয়া ভাবেন, তিনি পাগল হইয়া যান নাই কেন।

কিন্তু বুদ্ধিভ্রষ্ট হইবার পরিবর্তে রামকৃষ্ণ সগৌরবে 'ঝঞ্ঝার অন্তরীপ' প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিলেন। ইহা আমাদের নিকট যেমনই অসামান্য, তেমনি মূল্যবান। না, রামকৃষ্ণের এই দৃষ্টিভ্রমকে একটি প্রয়োজনীয় সোপান বলিয়াই মনে হয়। ঐ সোপান হইতেই তাঁহার আত্মা পূর্ণ আনন্দ এবং সুসংগত শক্তির মধ্য দিয়া মানব কল্যাণের জন্য একটি প্রচণ্ড বাস্তবতায় পরিণত হইতে পারিয়াছিল। ইহা এমন একটি বিষয় যাহা দেহ ও মন, উভয়ের চিকিৎসককেই গবেষণায় প্রলুব্ধ করে। সমগ্র মানসিক সংগঠনের ধ্বংস এবং মনের মূল বস্তুগুলির বিচ্যুতি, যাহা আপাত-

আসিয়াছে। প্রথমে তিনি মূর্তিগুলিকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করেন। পরে মূর্তিগুলি তাঁহার মধ্যে আসে। অবশেষে সেগুলি তাঁহার সহিত এক হইয়া যায়। এই অক্লান্ত সৃজন কার্যটি বিস্ময়কর লাগে। তবে তাঁহার মতো অপূর্ব রূপশিল্পী-প্রতিভার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। যখনই তিনি কোনো চিন্তাকে মূর্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে চান, তাহা মূর্তিমান হইয়া উঠে। ভাবুন, রামকৃষ্ণ এই অসংখ্য নিরবচ্ছিন্ন চিত্র রচনাকালে শেকস্পীয়ায়ের অন্তরতম সত্তার মধ্যে বাস করিতেছিলেন।

১ "অস্বীকার করিব না, আমার গবেষণায় এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া আমি রচনা বন্ধ করিয়াছিলাম। এবং পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণ জ্ঞানের যে-শিখরদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার কিছু সংকেত যদি আমি না পাইতাম, তবে সম্ভবত এই পুস্তক রচনার কাজ আরো দীর্ঘকাল বন্ধ থাকিত।

দৃষ্টিতে এখানে সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহা প্রমাণ করাও বিশেষ কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু পুনরায় কিরূপে তাহা একত্রিত হইয়া উচ্চতম শ্রেণীর একটি পরিপূর্ণ সত্তায় পরিণত হইল? কিরূপে এই বিধ্বস্ত গৃহ কেবল ইচ্ছা শক্তিতেই বৃহত্তর একটি প্রাসাদে গড়িয়া উঠিল? আমরা পরে দেখিব, রামকৃষ্ণ তাঁহার মত্ততা এবং যুক্তি—ভগবান এবং মানুষ, উভয়ের উপরই সমান আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। কখনো কখনো তিনি তাঁহার আত্মারূপী সমুদ্রের প্লাবন-পথগুলি খুলিয়া দিতেন, আবার কখনো বা হাস্যে, বুদ্ধিতে, বিদ্রূপে শিষ্যদের সহিত আলাপ করিতেন, যেন কোনো আধুনিক সক্রেতিস।[১]

কিন্তু ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে, যে-সময়ের ঘটনা এখানে বর্ণিত হইতেছে, তখনো রামকৃষ্ণ এই শক্তির অধিকারী হইতে পারেন নাই, তখনো সুদীর্ঘ পথ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইবে। আমি এখানে যদি রামকৃষ্ণের মৃত্যুর ইংগিত দিয়া থাকি, আর তাহা আমি দিয়াছিও, আমার ইউরোপীয় পাঠকগণকে তাঁহাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য। কারণ, অনুরূপ সিদ্ধান্ত আমি নিজেও করিয়াছিলাম। ধৈর্যের প্রয়োজন! আত্মার কার্যকলাপ অতীব দুর্বোধ্য, বিভ্রান্তিকর। শেষ পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরিতে হইবে!

বাস্তবিক পক্ষে, ঐ সময় ভগবৎ-পথিক রামকৃষ্ণ অন্ধের মতো চোখ বুজিয়া পথ চলিতেন। পথ দেখাইবার মতো কেহই তাঁহার সংগে ছিলেন না। তাই তিনি পথ ছাড়িয়া বিপথে গিয়া কাঁটার বেড়া ভেদ করিয়াই পথ ধরিতে চাহিলেন, কখনো বা গভীর খাদে গিয়া পড়িলেন। যাহাই হউক, তবু তিনি অগ্রসর হইলেন। যতোবার তিনি মাটিতে পড়িলেন, প্রতিবারই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আবার চলিলেন।

তিনি দাম্ভিক বা একগুঁয়ে ছিলেন, এমন ভাবিবেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ। আপনি যদি তাঁহাকে বলেন, তিনি অসুস্থ, তবে তিনি আপনাকে রোগের ঔষধ বাৎলাইয়া দিতে বলিবেন। রোগ সারাইবার চেষ্টা করিতেও তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে কামারপুকুরে তাঁহার স্বগৃহে পাঠানো হইল। বিবাহ দিলে তাঁহার ভগবৎ-উন্মাদনা কাটিয়া যাইবে, এই আশায় তাঁহার মা তাঁহাকে

১ সক্রেতিস—বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। খৃস্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আথেন্স রাজ্যে তাঁহার জন্ম হয়। দার্শনিক মতবাদের জন্য বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।—অনুঃ

বিবাহ দিতেও চাহিলেন। রামকৃষ্ণ আপত্তি করিলেন না। বাস্তবিক পক্ষে, একথা ভাবিয়া তিনি একান্ত নির্দোষ আনন্দও লাভ করিলেন। কিন্তু কী অদ্ভুত সে বিবাহ। দেবীর সহিত তাঁহার যে সম্পর্ক, তাহার অপেক্ষা এ-মিলন অধিকতর বাস্তব ছিল না। বরং ছিল অল্পতরই। কন্যার বয়স তখন (১৮৫৯ খ্রীঃ) মাত্র পাঁচ বৎসর। লেখার সময় আমি বেশ বুঝিতেছি, এই বিবাহ আমার পশ্চিম-দেশীয় পাঠকদিগকে ব্যস্ত ও বিস্মিত করিবে। করুক। বাল্যবিবাহের ভারতীয় প্রথা ইউরোপে এবং আমেরিকায় প্রায়ই নিন্দিত হয়। সম্প্রতি মিস মেয়ো এই নিন্দার জয়ধ্বজা উড়াইয়াছেন, যদিও ঐ ধ্বজা ছেড়া ন্যাকড়ার অধিক কিছুই নহে। কারণ, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ,—রবীন্দ্রনাথ, বা গান্ধী[১]—এবং ব্রাহ্মসমাজ দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই এই প্রথার নিন্দা করিতেছেন। অবশ্য, এই প্রথাকে বাস্তবিক বিবাহ বলার অপেক্ষা বৈবাহিক অনুষ্ঠান বলাই ভালো। পশ্চিমদেশীয় বাগদান প্রথার মতোই ইহা একান্ত সহজ এবং সরল ধর্মানুষ্ঠান মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে, উভয়ের যৌবন-লাভের পূর্ব পর্যন্ত এই বিবাহ পূর্ণাংগ হয় না। মিস্ মেয়োর চক্ষে রামকৃষ্ণের বিবাহটি দ্বিগুণ গর্হিত হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচ বৎসর বয়স্কা বালিকার সহিত তেইশ বৎসর বয়স্ক যুবকের বিবাহ! যাহারা লজ্জিত উত্তেজিত হইয়াছেন, তাহারা শান্ত হউন! এই বিবাহ ছিল দুটি আত্মার বিবাহ। যৌন-মিলনের দিক হইতে এই বিবাহ চিরদিনই ছিল অপূর্ণ। 'আর্লি চার্চের' যুগে যাহাকে খ্রীস্টান বিবাহ বলা হইত, ইহা ছিল তাহাই। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণের এই বিবাহ সুন্দর একটি বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। ফলের দ্বারাই বৃক্ষকে চিনিতে হইবে। এ বিবাহের ফল ছিল বিধাতার ফল—নিকষিত নিষ্কাম ভালোবাসা। তাই শিশু

১ বাল্যবিবাহের অভিজ্ঞতা গান্ধীজীর অত্যন্ত অধিক পরিমাণেই ছিল। (যে সমস্ত বালক-বালিকা বাল্যবিবাহের অকালপক্ব অভিজ্ঞতার জটিল প্রশ্নকে সমস্ত জীবন জীয়াইয়া রাখে, গান্ধীজী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম)। পূর্বে গান্ধীজী বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। অবশ্য, এ কথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, কচিৎ দুই-এক ক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ এবং নীতিপরায়ণ নরনারীর পক্ষে এই আশৈশব সম্পর্ক হইতে শুদ্ধ সুফলও দেখা যায়। বাড়ন্ত বয়সে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যে সকল অস্বাস্থ্যকর চিন্তা জমিয়া উঠে, সেগুলিকে এই সম্পর্ক দূর করে এবং স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে এক পবিত্র বন্ধুত্বের রূপ দেয়। যে বালিকার ভাগ্য একদা গান্ধীজীর ভাগ্যের সহিত জড়িত হইয়াছিল তিনি গান্ধীজীর দুর্গম জীবনের যাত্রাপথে কতো বড়ো সহযাত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা কাহারো অবিদিত নাই।

সারদামণি[১] এক বয়স্ক বন্ধুর শুদ্ধমতি শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনীতে পরিণত হইলেন—হইলেন রামকৃষ্ণের বিশ্বাস ও পরীক্ষার নিষ্কলংক সহচরী। রামকৃষ্ণের শিষ্যরা তাঁহাকে 'মা' এই পবিত্র নামে রামকৃষ্ণের পুণ্য নামের সহিত জড়াইয়া রাখিয়াছেন।[২]

বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হবার পর প্রথা অনুসারে বালিকা সারদামণিকে কিছুদিনের জন্য তাঁহার পিতামাতার নিকট পাঠানো হইল। ইহার পর দীর্ঘ আট নয় বৎসরের মধ্যে স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল না। রামকৃষ্ণও মার কাছে থাকিয়া কতক পরিমাণে তাঁহার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন, মনে হইল। তিনি পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন।

কালী কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। মন্দিরের দরজা পার হইতে না হইতেই রামকৃষ্ণের মধ্যে ভাবোন্মত্ততা পূর্বাপেক্ষা আরো ভয়াবহভাবে দেখা দিল। নেসাসের[৩] পরিচ্ছদে আবৃত হারকিউলিসের মতোই রামকৃষ্ণ একটি জ্বলন্ত চিতার

১ সারদামণির পিতৃকুলের পদবী ছিল মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে ইনি সারদা দেবী নামে পরিচিত হন।

২ তাঁহাকে 'মা' বলিয়াই ডাকা হইত। সদ্বংশীয় ভারতীয়রা বয়োকনিষ্ঠা হইলেও স্ত্রীলোকদিগকে 'মা' বলিয়া ডাকার সুন্দর প্রথাটি চিরদিনই মানিয়া চলেন।

৩ নেসাস ও হারকিউলিস—হারকিউলিস গ্রীক পুরাণে বর্ণিত সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। দেবরাজ জিউসের ঔরসে এবং আম্ফিট্রিয়নের পত্নী আল্‌কমেনের গর্ভে এঁর জন্ম হয়। তাই ইনি পুরাণে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে দেবাত্মজ। এঁর দ্বিতীয়া পত্নী ডিআনেরা ছিলেন ক্যালিডনের রাজা এনিউসের কন্যা। ডিআনেরার পতিগৃহে যাত্রাকালে পথে নেসাস দৈত্যের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। ডিআনেরার রূপে মুগ্ধ হইয়া নেসাস তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে। ফলে হারকিউলিস বিষাক্ত শরাঘাতে নেসাসকে নিহত করেন। মৃত্যুকালে নেসাস ডিআনেরাকে তাহার রক্ত সাবধানে রক্ষা করিতে বলে; কারণ, নেসাস বলে, ঐ রক্তে পরিচ্ছদ সিক্ত করিয়া কাহারো নিকট পাঠাইলে সে তাহার প্রেমিকাকে অবহেলা করিতে পারিবে না।

পরবর্তী কালে হারকিউলিস একিলিআরাজ ইউরিটাসের কন্যা ইঅলকে ভালবাসেন। ফলে, ডিআনেরা এই সংবাদ পাইয়া নেসাসের রক্তে একটি পরিচ্ছদ সিক্ত করিয়া তাঁহার স্বামী হারকিউলিসের নিকট প্রেরণ করেন। নেসাসের রক্তে বাস্তবিক কোনো যাদুশক্তি ছিল না; তাহা ছিল ভয়ংকর মারাত্মক বিষ। হারকিউলিসের উপর উক্ত বিষের ক্রিয়া শুরু হইল। হারকিউলিস যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া 'এটা' পর্বতের শিখরে আসিলেন এবং চিতা সজ্জিত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। একটি মেষপালক হারকিউলিসের অনুরোধ-ক্রমে ঐ চিতায় অগ্নিসংযোগ করিল। হারকিউলিস দগ্ধ হইলেন। এইরূপে তাঁহার পার্থিব নশ্বর অংশ বিনষ্ট হইল এবং দিব্য অবিনশ্বর অংশ স্বর্গে চলিয়া গেল। হারকিউলিস পুনরায় পূর্ণ দেবতায় পরিণত হইলেন এবং স্বর্গে হিবিকে বিবাহ করিলেন।—অনুঃ

মধ্যে বাস করিতেছিলেন। দেবতার অক্ষৌহিণী তাঁহাকে ঝটিকাবর্তের মতো আক্রমণ করিল। রামকৃষ্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেন। তাঁহার উন্মত্ততা দশ গুণ ফিরিয়া আসিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার মধ্য হইতে দানবীয় প্রাণী সকল বাহির হইতেছে। প্রথমে আসিল একটি কৃষ্ণকায় মূর্তি। উহা পাপের প্রতীক। অতপরঃ আসিলেন এক সন্ন্যাসী। দেবদূতের ন্যায় পাপকে তিনি হত্যা করিলেন। (আমরা ভারতবর্ষে আছি, না হাজার বছর আগেকার পশ্চিমদেশীয় কোনো খৃষ্টান মঠে আছি?) রামকৃষ্ণ নিস্তব্ধ নিশ্চল হইয়া রহিলেন; নিজের দেহ হইতে ওই সকল বস্তুর নির্গমন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন; ভয়ে তাঁহার সর্বাংগ অবশ হইল। আবার দীর্ঘকালের জন্য তাহার চক্ষে পলক পড়িল না[১]। উন্মাদ রোগ দেখা দিতেছে, রামকৃষ্ণ এমনও অনুভব করিলেন। আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া তিনি 'মার' নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কালীর ধ্যানই হইল তাঁহার একমাত্র ভরসা। এমনি ভাবে মানসিক উন্মত্ততা ও নৈরাশ্যের মধ্যে রামকৃষ্ণের দুই বৎসর কাটিল।[২]

অবশেষে সাহায্য মিলিল।

১ তিনি বলেন, ছয় বৎসরের জন্য।

২ ১৮৬১ খৃস্টাব্দে রামকৃষ্ণের রক্ষয়িত্রী রাসমণির মৃত্যু হয়। সৌভাগ্যবশত রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু রামকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত থাকেন।

৩

জ্ঞানের পথপ্রদর্শক দুইজন ঃ

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তোতাপুরী

এই পর্যন্ত রামকৃষ্ণ দেবের উপর নির্ভর করিয়া একাকী আত্মার তরংগাবর্তের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। তিনি এক রকম ক্লান্ত হইয়াই পড়িয়াছিলেন, এমন সময়ে দুইজনের সাক্ষাৎ মিলিল। তাঁহারা রামকৃষ্ণের মস্তককে তরংগাঘাতের ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিলেন, নদী পার হইবার জন্য জলস্রোতকে কি ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও তাঁহাকে শিখাইলেন।

ভারতের যুগব্যাপী আধ্যাত্মিক ইতিহাস সংখ্যাতীত মানবের ইতিহাস। তাঁহারা পরমতম সত্যকে জয় করিবার জন্য অভিযান করিয়া চলিয়াছেন। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, পৃথিবীর সকল মহাপুরুষেরই মূল লক্ষ্য ওই এক। তাঁহারা সকলেই জয়ের আশায় বাহির হইয়াছেন, যুগ যুগ ধরিয়া সত্যকে জয় করিবার জন্য আক্রমণ চালাইয়াছেন—যে সত্যের তাঁহারা নিজেরা অংশ মাত্র, যে-সত্য তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিতে, আঘাত করিতে, উত্তীর্ণ হইতে প্রলুব্ধ করে। কখনো কখনো তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়েন। যতক্ষণ না তাঁহারা সম্পূর্ণ জয়ী বা পরাজিত হন, ততক্ষণ এইরূপ চলিতে থাকে। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই সত্যের একই প্রকাশ দেখিতে পান না। সত্য যেন সুরক্ষিত একটি বিরাট নগর-দুর্গ। ইহার বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন বাহিনী বেষ্টন করিয়া আছে, কিন্তু বাহিনীগুলির মধ্যে সাদৃশ্য নাই। বিভিন্ন বাহিনীর স্ব স্ব আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি ও অস্ত্র-শস্ত্র রহিয়াছে। আমাদের পশ্চিমদেশীয়[১] জাতিগুলি দুর্গের বহিঃপ্রাচীরের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। তাহারা প্রকৃতির বস্তুগত শক্তিকে পরাভূত করিতে চায়, প্রকৃতির নিয়মগুলিকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে। এবং

---

১ আমার বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমি পূর্ব এবং পশ্চিমদেশীয় এই দুইটি অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি আশা করি বুদ্ধিমান পাঠকরা আমার মতোই পশ্চিমের বিভিন্ন বিভাগ-গুলির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন। সাধারণত, প্রাচ্য বলিতে আমরা নিকট প্রাচ্য বা ইহুদি প্রাচ্যকেই বুঝি। কিন্তু আমার মতে, এই প্রাচ্য বলিতে যাহা বোঝা যায়, তাহা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা হইতে অনেক পৃথক। এবং এই পার্থক্য শ্লাভ, জার্মাণিক বা নর্ডিক প্রভৃতি পশ্চিমী জাতিগুলি হইতেও অধিক। ইণ্ডোইউরোপীয় মূল জাতি হইতে নিজেদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে-সকল বিরাট ইউরোপীয় জাতি পশ্চিম দিকে বা এটলান্টিকের অপর পারে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অর্থ করিয়াই কাহিনীর এই অংশে আমি পশ্চিমদেশীয় কথাটি ব্যবহার করিয়াছি।

সেগুলি হইতেই দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য এমন অস্ত্র রচনা করে, যাহার দ্বারা তাহারা সমগ্র দুর্গকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিতে পারে।

ভারতবর্ষ ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছে। অদৃশ্য অফিসে যেখানে প্রধান সেনাপতি রহিয়াছেন, সে সেই কেন্দ্রে গিয়াই সোজাসুজি পৌছিয়াছে। কারণ, সে যে-সত্যের সন্ধান করিতেছে, তাহা বস্তুর অতীত সত্য। তবে পশ্চিমী 'বস্তুবাদের' বিপরীত অর্থে ভারতীয় 'ভাববাদ'কে বুঝিলে চলিবে না। এ বিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। কারণ, দুইটি-ই বাস্তববাদী। ভারতীয়রা মূলত বাস্তববাদী, কারণ, তাঁহারা ভাব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না। তাঁহারা স্বতন্ত্র উপায়ে আনন্দ এবং অনুভূতির মধ্য দিয়াই তাঁহাদের কল্প-বস্তুকে আয়ত্ত করেন। ভাবগুলিকে দেখা, শোনা, স্পর্শ বা আস্বাদ করা তাঁহাদের চাই-ই। অনুভবের সম্পদ এবং কল্পনা-শক্তির অপূর্বতা, উভয় দিক হইতেই তাঁহারা পশ্চিমদেশীয়দিগকে পিছনে ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন।[১] পশ্চিমী যুক্তির নামে আমরা কেমন করিয়া ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করি? আমাদের দৃষ্টিতে যুক্তি হইল নৈর্ব্যক্তিক একটি পথ, যাহা সকল মানুষের কাছেই অবারিত। কিন্তু যুক্তি কী সত্যই নৈর্ব্যক্তিক? বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা কতোখানি সত্য? ইহার কি কোনো ব্যক্তিক সীমা নাই? আর, ইহাও কি লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, ভারতীয় মনীষীরা যাহা উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকট অতি-ব্যক্তিক মনে হইলেও, ভারতবর্ষে তাহা ঐরূপ কিছুই নহে? ভারতবর্ষে তাহা বহু শতাব্দীব্যাপী পরীক্ষিত, লিপিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক রীতি এবং সতর্ক পরীক্ষা-প্রতিপরীক্ষার যুক্তিগত ফলমাত্র। প্রত্যেক মহাপুরুষ তাঁহার শিষ্যদিগকে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, যাহাতে এই পথে তাঁহারাও বিনা সংশয়ে ওই একই দিব্য দৃষ্টির অধিকারী হইতে পারেন। অবশ্য পূর্ব এবং পশ্চিমদেশীয় উভয় রীতির মধ্যেই বৈজ্ঞানিক সংশয় ও সাময়িক বিশ্বাসের অবকাশ প্রায় সমানভাবেই রহিয়াছে। আজিকার সত্যকারের বৈজ্ঞানিক মনে যে ব্যাপক ভ্রান্তি দেখা যায়, তাহা যদি অকপট হয়, তবে তাহা একটি সম্পর্কিত সত্য মাত্র। যদি দিব্য দর্শন মিথ্যা

১ ভারতীয় মনীষিগণ তাঁহাদের চিন্তা-শক্তিকে অন্বয়ের মধ্যে সংহত করিতে পারেন না, এমন কথা আদৌ বলিতেছি না। তবে, এমন কি অদ্বৈত বেদান্তের নিরাকারকেও তাঁহারা অনেকাংশে তীব্র অনুভব-চেতনার মধ্য দিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন! এমন কি নিরাকার যদি নির্গুণ এবং দর্শনাতীত হন, তাহা হইলেও কি এ-কথা স্থির হয় যে, নিরাকার ব্রহ্ম সকল প্রকার দুর্বোধ্য প্রহেলিকাময় স্পর্শের ঊর্ধ্বে? সকল সত্যের প্রকাশই কি এক প্রকার ভয়ঙ্কর স্পর্শ নহে?

হয়, তবে সেই দৃষ্টিভ্রমের কারণ নির্ণয় করাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। এবং এই নির্ণয়ের পরে অন্যান্য যুক্তি হইতে এই ভ্রমের ঊর্ধ্বে কোনো উন্নততর এক সত্যে উপনীত হওয়াও সম্ভব।

ভারতীয়রা স্পষ্ট বুঝুন, বা অস্পষ্টভাবে অনুভব করুন, তাঁহাদের সকলের এই বিশ্বাস যে, বিশ্বাত্মার—অনন্ত ব্রহ্মের[১] মধ্যে ভিন্ন কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। বিশ্বময় যাহাই রহিয়াছে, সেগুলির সমস্তর বিভিন্ন মূর্তির জন্ম হইয়াছে তাঁহারই মধ্যে। ঐ একই বিশ্বাত্মা হইতে বিশ্বের সমস্ত বাস্তবতার উদ্ভব হইয়াছে। বিশ্বাত্মার ভাবই হইল বিশ্বের বাস্তব রূপ। আমরা খণ্ড আত্মা। আমরা ভিন্ন ভিন্ন অংশ রূপে বিশ্বাত্মাকে গড়িয়া তুলি, বহুরূপময়, পরিবর্তনময় বিশ্বের ভাবটিকে দেখিতে পাই, এবং উহার উপর এক স্বতন্ত্র বাস্তবতাকে আরোপ করি। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা না অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে পারি, ততোক্ষণ আমরা 'মায়ার' দ্বারা বিভ্রান্ত হইতে থাকি। এই মায়ার কোনো আরম্ভ নাই। ইহা কালের অতীত। সুতরাং আমরা যাহাকে চিরন্তন সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা অবিরাম অপস্রিয়মান বিশ্বস্রোত ছাড়া আর কিছুই নহে। এবং এই বিশ্বস্রোত সেই অদ্বিতীয় সত্যের[২] অদৃশ্য উৎস হইতেই নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে।

অতএব আমাদের চারিদিকে যে-মায়ার স্রোতাবর্ত চলিতেছে, তাহার কবল হইতে আমাদিগকে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে এবং উজানবাহী মৎস্যের ন্যায় সকল বাধা-অন্তরায়, জলপ্রপাত পার হইয়া উৎসে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইহাই আমাদের অনিবার্য নিয়তি, ইহাই আমাদের মুক্তির পথ। এই বেদনাময়, শৌর্যময় মহাসংগ্রামের নামই সাধনা। যাঁহারা এই সংগ্রাম করেন, তাঁহারাই সাধক। তাঁহাদের ক্ষুদ্র বাহিনী যুগে যুগে নূতন করিয়া নির্ভীক আত্মাদের লইয়া রচিত হয়। কারণ, তাঁহারা যুগব্যাপী পরীক্ষা-প্রতিপরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত সুব্যবস্থিত রীতি এবং কঠিন নিয়মতান্ত্রিকতার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা দুই প্রকার পথ বা অস্ত্র[৩] গ্রহণ করিতে পারেন। এই দুইটিতেই দীর্ঘকাল প্রয়োগ

---

১ স্থূল এবং সূক্ষ্ম সকল বস্তুই ব্রহ্ম। কেবলমাত্র এক এবং অখণ্ড ব্রহ্মের মধ্যে সকল কিছুর অস্তিত্ব রহিয়াছে।

২ স্বামী সারদানন্দ তাঁহার Sri Ramkrishna, the Great Master গ্রন্থের গোড়ায় যে নিপুণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আমি তাহা হইতে সংক্ষিপ্ত সার গ্রহণ করিয়াছি।

৩ আরো অনেক পথ বা অস্ত্র রহিয়াছে। সেগুলি সম্পর্কে আমি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিবেকানন্দের দর্শন এবং ধর্ম সংক্রান্ত চিন্তাধারার আলোচনাপ্রসংগে আলোচনা করিব। সেখানে আমি ভারতীয় যোগের বিশদ ব্যাখ্যা দিবার সুযোগ পাইব।

এবং অবিরাম অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। "ইহা নহে! ইহা নহে!"[১]—এই হইল প্রথম পথ। ইহাকে পরিপূর্ণ অস্বীকারের দ্বারা 'জ্ঞান'-লাভের পথ বলা চলে। ইহা জ্ঞানীর অস্ত্র। "ইহা! ইহা!"—এই হইল দ্বিতীয় পথ। উহাকে ক্রমাগত স্বীকারের দ্বারা 'জ্ঞান'-লাভের পথ বলা চলে। ইহা ভক্তের অস্ত্র। প্রথমটি কেবলমাত্র বুদ্ধিজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যখনই কিছু ইহার বাহিরে থাকে, বা ইহার বাহিরে আছে এমন হয়, তখনই ইহা তাহাকে বর্জন করে এবং পরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্থিরসংকল্পে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় পথ প্রেমের। পরম প্রেমময়ের প্রেমই (উহা যতই পবিত্রতর হইতে থাকে, ততোই উহার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতে থাকে) অন্য সমস্ত কিছুকেই ত্যাগ করিতে শেখায়। জ্ঞানের পথ অব্যয় দেহাতীত ভগবানের পথ। ভক্তির পথ দেহধারী ভগবানের পথ—অন্তত পক্ষে, এই পথের যাত্রী যাঁহারা, তাঁহারা অবশেষে জ্ঞান-পথ-যাত্রীদের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে দীর্ঘকাল এই পথেই অপেক্ষা করেন।

রামকৃষ্ণের অন্ধ দিশাহারা অনুভূতি তাঁহার অজ্ঞাতসারেই ভক্তির পথ বাছিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এ-পথের কুটিল গতি এবং গোপন বিপদ সম্পর্কে তাঁহার কোনো ধারণা ছিল না। প্যারী হইতে জেরুজালেম[২] পর্যন্ত যাত্রার পূর্ণ বিবরণী ছিল সত্য। তাহাতে যাত্রার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র পথ, পথের বিপদ-শংকা, পর্বত-উপত্যকা, বিশ্রাম-স্থল, সমস্ত কিছুর সুদক্ষ সংকেত এবং সতর্ক বিবরণী ছিল, এ-ও সত্য। কিন্তু কামারপুকুরের এই যাত্রীটি এইরূপ কোনো ভ্রমণকাহিনীর অস্তিত্বের কথা জানিতেন না। তাঁহার উন্মত্ত হৃদয় এবং চরণযুগল তাঁহাকে যেখানে লইয়া গিয়াছে, তিনি সেইখানেই গিয়াছেন। কোনো সাহায্যকারী বা পথপ্রদর্শক না থাকায় অবশেষে তাঁহার ঐ অতিমানুষিক চেষ্টায় তিনি ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। গভীর অরণ্যের স্তব্ধ নির্জনতা তাঁহাকে পাগল করিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইয়াছে, তিনি পথ হারাইয়াছেন, তাঁহার ফিরিবার আর আশা নাই। এই ভাবেই তিনি প্রায় তাঁহার বন্ধুর পথের শেষ বিশ্রাম-

১ উপনিষদের রচয়িতারা ব্রহ্মকে নেতি ('ইহা নহে!') এই আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে খৃস্টান অতীন্দ্রিয় সেণ্ট ডেনিস দি এয়ারোপাগিটে-রচিত 'ট্রিটিজ অন মিস্টিক থিওলজি' তুলনীয়। উহাতে তিনি বলেন যে, বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুগুলির যিনি পরম স্রষ্টা, তাঁহাকে বুদ্ধির দ্বারা কোনো মতেই কল্পনা বা চিন্তা করা সম্ভব নহে। সেখানে এই শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-বিজ্ঞানী ভগবানের সূত্র নির্ধারণ সম্পর্কে এক পৃষ্ঠা ধরিয়া ভগবান কি নহে, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

২ এখানে শ্যাতোব্রিয়াঁ-রচিত সুবিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনীর কথা বলা হইয়াছে।

স্থলটিতে আসিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় সাহায্য মিলিল। সাহায্য আনিলেন একজন স্ত্রীলোক।

একদিন রামকৃষ্ণ বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া গঙ্গার বুকে নৌকাগুলিকে দেখিতেছিলেন। নৌকাগুলি রং-বেরঙের পাল তুলিয়া এ-দিক ও-দিক চলিয়াছে। এমন সময় তিনি দেখিলেন, একটি নৌকা বাঁধের কোলে আসিয়া লাগিল। নৌকা হইতে একজন স্ত্রীলোক সিঁড়ি দিয়া বাঁধের উপরে উঠিয়া আসিলেন। স্ত্রীলোকটি সুন্দরী, দীর্ঘকায়া। মস্তকে দীর্ঘ আলুলায়িত কেশ। পরণে সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন।[১] পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ বয়ঃক্রম। দেখিলে আরো অল্প মনে হয়। রামকৃষ্ণ তাঁহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্ত্রীলোকটি রামকৃষ্ণকে দেখিয়াই আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন :

"বৎস! বহুদিন ধরিয়া আমি তোমারই সন্ধান করিতেছি।"[২]

মহিলাটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া। বাঙ্গালী বৈষ্ণব[৩] ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম। সুশিক্ষিতা। শাস্ত্রে, বিশেষত, ভক্তি-শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত। তিনি বলিলেন, তিনি এতোদিন এমন একটি মানুষের সন্ধান করিতেছেন, যিনি ভগবৎ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। ঐ রকম একজন মানুষ যে রহিয়াছেন, তাহা তাঁহার অন্তরাত্মা তাঁহাকে জানাইয়াছেন। এবং তাই রামকৃষ্ণের জন্য একটি বাণী তিনি বহন করিয়া বেড়াইতেছেন। সন্ন্যাসিনীর আর কোনো পরিচয়, এমন কি নামটি পর্যন্ত শুধাইবার আগেই (ভৈরবী ব্রাহ্মণী ছাড়া তাঁহার অন্য নাম কেহই জানে না)

---

১ ম্যাক্স্ মুলারের মতে, যিনি সর্বত্যাগী, যিনি পার্থিব সমস্ত বাসনাকে বিসর্জন দিয়াছেন, তিনিই সন্ন্যাসী। ভগবৎ-গীতার সূত্র হইল তিনিই সন্ন্যাসী, "যিনি কিছুকে ঘৃণা করেন না।" আমরা পরে দেখিব, এই মহিলাটি সেইরূপ দিব্য ঔদাসীন্যের অবস্থা তখনো প্রাপ্ত হন নাই।

২ আরব্যোপন্যাসের কাহিনীর মতো সহজ সৌন্দর্যে ভরা এই সাক্ষাতের দৃশ্যটি ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছে। ম্যাক্স্ মুলারের মতোই তাঁহারাও এই খণ্ড কাহিনীর মধ্যে রামকৃষ্ণের মানসিক উদ্বর্তনের প্রতীক লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু যে ছয় বৎসরকাল এই শিক্ষাদাত্রী রামকৃষ্ণের সাহচর্যে ছিলেন, ঐ সময়ে তাঁহার ব্যক্তিত্বে এমন বহু ব্যক্তিগত লক্ষণের প্রকাশ ঘটিয়াছে, (যেগুলি তাঁহার পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে গৌরবজনকও নহে), যাহার ফলে তিনি যে বাস্তবিক কোনো স্ত্রীলোক ছিলেন, এবং স্ত্রীলোকসুলভ দুর্বলতাও তাঁহার ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না।

৩ বৈষ্ণবদিগের পন্থা মূলত প্রেমের পন্থা। রামকৃষ্ণ নিজেও বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন সূর্য দেবতা বিষ্ণু। তিনি তাঁহার বিভিন্ন অবতারের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে সার্বভৌম বিস্তার করিয়াছেন। এই অবতারদিগের মধ্যে প্রধান হইলেন কৃষ্ণ এবং রাম। এই দুই দেবতাই বর্তমান কাহিনীর নায়কের মধ্যে দেখা দিয়াছেন। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণও ভগবানের নূতন অবতার বা নর-নারায়ণ রূপে পূজা পাইয়াছেন।

তাহার এবং কালিকাপূজারী রামকৃষ্ণের মধ্যে মাতাপুত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। শিশুর সারল্যে রামকৃষ্ণ তাঁহাকে সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন, ভগবৎজীবন যাপন এবং সাধনা করিতে গিয়া কী কঠিন অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করিয়াছেন, কিরূপ দৈহিক মানসিক বেদনা পাইয়াছেন, সব। অতঃপর বিনীত উদ্বিগ্নকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেকে তাঁহাকে উন্মাদ মনে করেন, তাঁহারা ঠিকই বলেন, না ভুল করেন? রামকৃষ্ণের স্নেহোদার-স্বীকারোক্তি শুনিয়া ভৈরবী তাঁহাকে মায়ের ন্যায় স্নেহ-সান্ত্বনা দিলেন। বলিলেন, ভয়ের কোনো কারণ নাই। ভক্তিশাস্ত্রে সাধনার যে-সকল উচ্চস্তরের বর্ণনা রহিয়াছে, রামকৃষ্ণ নিজের অনির্দেশিত চেষ্টার ফলেই নিঃসংশয়ে সেখানে উপনীত হইয়াছেন। তিনি যে-দুঃখযন্ত্রণা পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার ঊর্ধ্বগতির পরিমাপমাত্র। ভৈরবী রামকৃষ্ণের দৈহিক উন্নতির দিকে মন দিলেন এবং তাঁহার অন্তর হইতে সকল অন্ধকার দূর করিলেন। রাত্রির অন্ধকারে চোখ-বাঁধা অবস্থায় রামকৃষ্ণ যে-জ্ঞানের পথে ইতিপূর্বে একাকী চলিয়াছিলেন, সেই পথে ভৈরবী তাঁহাকে প্রকাশ্য দিবালোকে এবার সাথে করিয়া লইয়া গেলেন। যে-আত্মোপলব্ধি লাভের জন্য অতীন্দ্রিয়-বিজ্ঞানীরা বহু শতাব্দী ব্যয়িত করিয়াছেন, রামকৃষ্ণ তাঁহার অনুভূতির দ্বারাই মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহা আয়ত্ত করিলেন। কিন্তু এই আত্মোপলব্ধি কিরূপে কোন্ পথে তিনি পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাকে না দেখানো পর্যন্ত তিনি তাহাকে বশীভূত করিতে পারিতেছিলেন না।

প্রেমের পথেই ভক্তদের জ্ঞান-লাভ হয়। তাই ভগবানের যে কোন একটি মূর্তিকেই তাঁহারা স্বীয় আদর্শরূপে নির্বাচন ও গ্রহণ করিয়া সাধনা শুরু করেন। রামকৃষ্ণ 'মা'কেই তাঁহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকালের জন্য তাঁহার এই প্রেমের মধ্যেই নিমগ্ন রহিলেন। কিন্তু প্রথমে তিনি তাঁহার প্রেম-পাত্রকে লাভ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে তিনি তাঁহাকে দেখিলেন, স্পর্শ করিলেন, তাঁহার সহিত কথা কহিলেন। ইহার পর ভগবানের জীবন্ত অস্তিত্ব অনুভব করিবার জন্য তাঁহার সামান্য মাত্র মনোনিবেশের প্রয়োজন হইত। সকল কিছুর মধ্যে সকল আকারে ভগবান আছেন, এই বিশ্বাস থাকায়, রামকৃষ্ণ সত্বর অনুভব করিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা দেবী মূর্তির মধ্য হইতেও অন্যান্য দেবদেবীরা নির্গত হইতেছেন। তাই এই দিব্য বহুরূপিতা তাঁহার সমস্ত দৃষ্টি ভরিয়া রহিল এবং পরে এক সময় এই অসংখ্য দেব-দেবীর ঐকতানে তিনি এমন পরিপূর্ণ হইয়া রহিলেন যে, তাঁহার মধ্যে আর অন্য কিছুর বিন্দুমাত্র স্থান রহিল না। বস্তু-জগৎ অন্তর্হিত হইল। এই অবস্থার নাম সবিকল্প সমাধি—বস্তু-চেতনার ঊর্ধ্বে এই আনন্দোচ্ছ্বাস। এই অবস্থায় আত্মা

তখনো চিন্তার অন্তর্জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং ভগবানের সহিত একাত্ম হইবার ভাবটিকে উপভোগ করে। কিন্তু যখন কোনো একটি ভাব আত্মাকে পাইয়া বসে, তখন অন্যান্য ভাবগুলি ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং আত্মা তখন তাঁহার চরম লক্ষ্য ব্রহ্মের সহিত মিলন বা নির্বিকল্প সমাধির অতি নিকটে গিয়া পৌঁছে। পরিপূর্ণ ত্যাগের দ্বারা চিন্তা-বিরতির মধ্যে অবশেষে যে অব্যয় পরম মিলন ঘটে, এই অবস্থা হইতে তাহা অধিক দূর নহে।[১] রামকৃষ্ণ তাঁহার এই আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রার তিন-চতুর্থাংশ পথ অন্ধের মতোই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন।[২] তিনি ভৈরবীকে তাঁহার আধ্যাত্মিক মাতা, গুরু ও শিক্ষকরূপে বরণ করিয়াছিলেন। ভৈরবী তাঁহার অতিক্রান্ত সমস্ত পথের পর্যায় ও অর্থ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। ভৈরবী নিজে ধর্ম অনুষ্ঠান ও সাধনকার্যে সুপটু ছিলেন। জ্ঞানের সকল পথই তাঁহার নিকট বিদিত ছিল। তাই শাস্ত্রোক্ত রীতি অনুসারে একে একে সকল প্রকার সাধনমার্গগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি রামকৃষ্ণকে উৎসাহিত করিলেন। সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক যে তান্ত্রিক সাধনা—যাহাতে রক্তমাংসের অনুভূতি ও কল্পনাকে জয় করিবার জন্য সমস্ত আধ্যাত্ম ও অনুভব-শক্তিকে রক্তমাংসের লালসা এবং কল্পনার আক্রমণের গোচর করা হয়—তাহাও তিনি রামকৃষ্ণকে শিখাইলেন। কিন্তু এই পথ বড়ো পিচ্ছল, দুর্গম, ইহার পার্শ্বেই থাকে অধঃপতন ও উন্মত্ততার গভীর গিরি-গহ্বর। যাঁহারা এই পথে যাইতে দুঃসাহস করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই আর ফিরেন নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণ যেমন নিষ্কলুষ অবস্থায় যাত্রা করিয়াছিলেন, তেমনি

১ আমি ব্যাখ্যার জন্য এখানেও স্বামী সারদানন্দের আলোচনার উপর নির্ভর করিতেছি। রুইসব্রয়েক রচিত *De Ornatu Spiritalium Naptiarum* তুলনীয়: অগ্রসর হও! ভগবানই কথা কহিতেছেন।···তিনিই অন্ধকারের মধ্যে আত্মার সহিত আলাপ করিতেছেন। আত্মা নিমগ্ন হইতেছে, অপসৃত হইতেছে। এই পূত তমসার মধ্যেই আত্মাকে আত্মহারা হইতে হইবে। এখানেই মানুষ আপনা হইতে আপনাকে মুক্ত করিবে। এবং এইরূপেই মানুষের চিন্তা কল্পনার অনুরূপভাবে নিজেকে সে আর কখনো ফিরিয়া পাইবে না। এই গিরিগহ্বরের মধ্যে, যেখানে প্রেম মৃত্যুর আগুন জ্বালাইয়া দেয়, সেখানেই আমি শাশ্বত সনাতন জীবনের প্রত্যূষ লগ্ন প্রত্যক্ষ করিতেছি।···ভূমার মহাসমুদ্রে জ্বালাময় অন্ধকারের মধ্যে আত্মহারা হইবার জন্যই আমরা নিজেদের কাছে নিজদিগকে ধ্বংস করি, নিজেদের কারাগৃহ হইতে নিজদিগকে দিই মুক্তি। এ বিপুল প্রেমের জোরেই আমরা তাহাতে আনন্দ লাভ করি।”

২ কিন্তু মানুষ এই যাত্রাপথের শেষ অংশে আসিয়া যে চৌরাস্তার মোড়ে তাহার দেহধারী ভগবান এবং তাঁহার প্রেমের নিকট অবকাশ গ্রহণ করে, সেখানে আসিয়া পৌঁছতেই রামকৃষ্ণকে থামিতে হইল। রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জননী ভৈরবীও এই স্থান অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য রামকৃষ্ণকে তাগাদা দিলেন না। তাঁহারা উভয়ে স্বতঃই এই অন্ধ দিব্যদৃষ্টি, দুর্গম গিরি-গহ্বর, নৈর্ব্যক্তিকের নিকট দূরে সরিয়া রহিলেন।

নিষ্কলুষ অবস্থায়, এবং বহ্নিদগ্ধ ইস্পাতের মতোই শীতাতপের অতীত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

প্রেমের দ্বারা ভগবানের সহিত মিলনের সকল রীতিই রামকৃষ্ণ এবার আয়ত্ত করিলেন। এই রীতিগুলি হইল "উনিশ প্রকার মনোভাব"—প্রভুভৃত্য, মাতা-পুত্র, বন্ধু, প্রেমিক, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি ভগবানের প্রতি আত্মার বিভিন্ন ভাবাবেগ। দিব্য নগর-দুর্গের সকল দিকই রামকৃষ্ণ জয় করিলেন। এবং যিনি ভগবানকে জয় করেন, তিনি ভগবৎ প্রকৃতির অংশও গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণের দীক্ষা-গুরু ভৈরবী রামকৃষ্ণের মধ্যে ভগবানের অবতারকে লক্ষ্য করিলেন। তাই তিনি দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিতদিগের এক সভা ডাকিলেন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু আলোচনার পর, রামকৃষ্ণকে 'নব অবতার' বলিয়া ঘোষণা করার জন্য ধর্মের শীর্ষস্থানীয়দের চাপ দিলেন।

এইরূপে রামকৃষ্ণের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যিনি কেবল একটি মাত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন নাই, সকল সাধনাতেই সিদ্ধ হইয়াছেন, সেই বিস্ময়কর মানুষটিকে দেখিবার জন্য দূর হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। রামকৃষ্ণ এখন সকল মার্গের মোড়ে বসিয়া সেগুলির আধিপত্য করিতেছিলেন। তাই সাধু, সন্ন্যাসী, সাধক, যাঁহারা কোনো না কোনো পথে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে চান, তাঁহারাই তাঁহার উপদেশ-পরামর্শ লইতে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের বিবরণীতে রামকৃষ্ণের দেহ-লাবণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণের দেহ দীর্ঘকাল ভাবাবেশের বহ্নিদাহে দগ্ধ নিকশিত হইয়া এক স্বর্ণাভ দিব্য জ্যোতি[১] লাভ করিয়াছিল। দান্তের[২] মতো রামকৃষ্ণ নরক হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন সমুদ্র হইতে রত্ন আহরণ করিয়া। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রামকৃষ্ণ অতি সরল সহজ মানুষটিই ছিলেন; তাঁহার মধ্যে দম্ভের চিহ্ন মাত্রও ছিল না। কারণ, ভগবৎ উন্মাদনায় তিনি এমন তন্ময় থাকিতেন যে, নিজের কথা ভাবিবার মতো তাঁহার সময় থাকিত না। তিনি কী করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা, তাঁহার কী করিতে বাকী আছে, তাহার কথাই

---

১ ভাবাবেশের ফলে রক্তের যে উচ্ছ্বাস ঘটে, তাহার এই ফল সম্পর্কে ভারতীয় যোগীরা চিরদিনই উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পরে দেখিব, ধার্মিক ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ-কালে রামকৃষ্ণ তাঁহাদের বক্ষদেশ দেখিয়াই, তিনি ভগবৎ শিখার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিনা, বলিতে পারিতেন।

২ দান্তে—(১২৬৫-১৩২১) ইনি ইতালির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'ডিভিনা কমেডিআ'।—অনুঃ

তাঁহাকে অনেক বেশি ব্যস্ত রাখিত। তিনি অবতার, এইরূপ কোনো উল্লেখ তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি যখন এমন অবস্থায় আসিলেন, যখন সকলে, এমন কি, তাঁহার পথ-দ্রষ্টা ভৈরবীও বলিলেন যে, তিনি চূড়ান্ত অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন, তখনো তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, আরোহণের শিখর সীমান্তের পানে তাকাইয়া রহিলেন। এবং একদা সেখানে আসিতেও বাধ্য হইলেন।

কিন্তু এই শেষ আরোহণের জন্য তাঁহার পুরাতন পথ-প্রদর্শকরাই যথেষ্ট ছিলেন না। তাই তাঁহার আধ্যাত্মিক মা, ভৈরবী, যিনি তাঁহাকে সযত্নে সগর্বে তিন বৎসর লালন করিয়াছিলেন, এখন রামকৃষ্ণকে কঠোরতর সজীবতর একজন গুরুর উচ্চতর নির্দেশ গ্রহণ করিতে দেখিয়া সহজে সহ্য করিতে পারিলেন না। সন্তান যখন মাতার স্তন্যের নির্ভর ত্যাগ করে, তখন অন্যান্য অনেক মা-ও এমনিটি অনুভব করেন।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি, রামকৃষ্ণ সেই সবে মাত্র সাকার ভগবানকে জয় করিয়াছিলেন, এমন সময় নিরাকার ভগবানের দূত আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। দূত তখনো জানিতেন না যে, কী দৌত্য লইয়া তিনি আসিয়াছেন। ইনি অনন্যসাধারণ বৈদান্তিক পণ্ডিত ও সাধক,—উলঙ্গ তোতাপুরী। তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর প্রস্তুতির পর পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি মুক্তাত্মা—তাঁহার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি পরিপূর্ণ নির্লিপ্তির সহিত এই মায়াময় বিশ্বকে অবলোকন করে।

দীর্ঘকাল ধরিয়া রামকৃষ্ণ অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহার চারিদিকে এক নিরাকার ব্রহ্ম এবং তাঁহার দূতগণের[১] এক অমানুষিক, অতিমানুষিক নির্লিপ্তি সঞ্চারিত হইতেছে। এই দূতগণ পরম হংস। ইঁহারা এক ব্যোমস্পর্শী উচ্চতা লাভ করিয়াছেন। দেহ ও মনে উলঙ্গ, সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী। অন্তরের পরম-রত্ন যে ভগবৎ প্রেম, তাহাও তাঁহারা বিসর্জন দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তখন রামকৃষ্ণ যে বেদনা অনুভব করিতেন না এমনও নহে। দক্ষিণেশ্বরে থাকার প্রথমের দিকে রামকৃষ্ণ ইঁহাদের প্রতি একটি ভয়ানক আকর্ষণ অনুভব করিতেন। তাঁহার মনে হইত, তিনিও হয়তো একদা এইরূপ জীবন্ত শবে পরিণত হইবেন। এ কথা ভাবিলেই রামকৃষ্ণ কাঁদিয়া ফেলিতেন। রামকৃষ্ণের মতো একজন আজন্ম প্রেমিক এবং শিল্পী, যাঁহাকে আমি ভগবৎ-উন্মত্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাঁহার পক্ষে এই চিন্তাও কিরূপ পীড়াদায়ক ছিল, কল্পনা করুন। প্রীতির পাত্রকে দেখিবার, স্পর্শ করিবার, আত্মসাৎ করিবার প্রয়োজন ছিল রামকৃষ্ণের। যতোক্ষণ পর্যন্ত না তিনি অই জীবন্ত মূর্তিকে

১ Missi Dominici—প্রভুর দূতবৃন্দ।

স্পর্শ করিতেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার তৃপ্তি ছিল না। এমনি একটি মানুষকে আজ অন্তরের গৃহত্যাগ করিতে হইবে! সমস্ত দেহ-মনকে এক নিরাকার ভাবময়ের মধ্যে নিমজ্জিত করিতে হইবে! এইরূপ চিন্তা আমাদের পশ্চিমদেশীয় কোনো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যতোখানি পীড়াদায়ক ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল রামকৃষ্ণের পক্ষে।[১]

কিন্তু এই চিন্তার হাত হইতে তাঁহার অব্যাহতি ছিল না। তাঁহার আতঙ্ক কেবলই তাঁহাকে বিষধরের চক্ষুর মতো আকর্ষণ করিতে লাগিল। উচ্চতার কথা ভাবিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু শিখরদেশে যিনি আরোহণ করিয়াছেন, শিখরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাঁহাকে পৌছিতেই হইবে। ভগবৎ-মহাদেশের আবিষ্কারক পর্যটক যাঁহারা, দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য নীল নদীর উৎস সন্ধান না করা পর্যন্ত তাঁহাদের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

আমি আগেই বলিয়াছি, নিরাকার ভগবান তাঁহার সকল আতঙ্ক এবং আকর্ষণ লইয়া রামকৃষ্ণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট গেলেন না। তাই তোতাপুরী এই কালী-প্রেমিককে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন।

রামকৃষ্ণকে তোতাপুরী প্রথমে লক্ষ্য করিলেন, যদিও রামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিলেন না। কারণ, তোতাপুরী তিন দিনের বেশী কোথাও থাকিতেন না। তিনি দেখিলেন, মন্দিরের তরুণ পুরোহিত[২] আপনার ধ্যানের গোপন আনন্দে তন্ময় হইয়া আছেন। তোতাপুরী বিস্মিত হইলেন।

বলিলেন, "বৎস, দেখিতেছি তুমি ইতিমধ্যেই সত্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছ। সুতরাং, তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে পরবর্তী সোপানে পৌছিবার জন্য সাহায্য করিতে পারি। আমি তোমাকে বেদান্ত শিক্ষা দিব।"

রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, মাকে জিজ্ঞাসা করি। রামকৃষ্ণের সহজ সারল্য কঠোর সন্ন্যাসীকেও মুগ্ধ করিল। সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন। মা রামকৃষ্ণকে অনুমতি দিলেন। এবং রামকৃষ্ণ বিনীতভাবে এই ভগবৎ-প্রেরিত গুরুর নিকট পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত আত্মসমর্পণ করিলেন।

১ ইহা লক্ষণীয় যে, রামকৃষ্ণ কাব্যকল্পনা এবং শিল্প-প্রতিভার অধিকারী হইলেও, অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল না। বিবেকানন্দের মনের গঠন কিন্তু ছিল অন্যরূপ। শিল্পের প্রতি তাঁহার অনুরাগ রামকৃষ্ণের অপেক্ষা অল্প না থাকিলেও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রচুর।

২ তখন রামকৃষ্ণের বয়স আঠাশ।

কিন্তু দীক্ষার পূর্বে রামকৃষ্ণকে পরীক্ষা দিতে হইল। প্রথম শর্ত হইল, রামকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণের উপবীত, পুরোহিতের পদমর্যাদা, এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে। রামকৃষ্ণের নিকট ইহা ছিল অতীব তুচ্ছ। কিন্তু কেবল ইহাই নহে; রামকৃষ্ণ যাহা লইয়া এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, সেই সাকার ভগবান এবং তাঁহার প্রতি স্নেহ, মমতা, মায়া—এখানে বা অন্যত্র প্রেম বা ত্যাগের দ্বারা তিনি যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া ছিলেন, তাহা, সমস্তই, তাঁহাকে এক মুহূর্তে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিতে হইবে। পৃথিবীর মতো নগ্ন হইয়া তাঁহাকে প্রতীক-রূপে আপনার শবদাহ করিতে হইবে। তাঁহার আমিত্বের—তাঁহার অন্তরের শেষ অবশেষটুকুকেও মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিতে হইবে। তখনই কেবল তিনি সন্ন্যাসীর গৈরিকবাসে আপনাকে পুনরায় আচ্ছাদিত করিতে পাইবেন। এই নব বস্ত্র তাঁহার নব জীবনের প্রতীক। এবার তোতাপুরী তাঁহাকে অদ্বৈত বেদান্তের[১] প্রধান কথা, অদ্বিতীয় অভিন্ন ব্রহ্ম, সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন। শিক্ষা দিলেন কিরূপে 'অহম্'-এর সন্ধানে গভীরে নিমগ্ন হইতে হইবে—যাহার ফলে ব্রহ্মের সহিত মিলন এবং সমাধির মধ্য দিয়া ব্রহ্মের মধ্যে অহম্‌কে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে।

একথা ভাবিলে ভুল হইবে যে, এমন কি যিনি সমাধির অন্যান্য সকল স্তর পার হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষেও শেষ সমাধির সংকীর্ণ তোরণটি পার হওয়া সহজ ছিল। এ-সম্বন্ধে তিনি নিজে যে বিবরণী দিয়াছেন, এখানে তাহা

১ বেদান্তের মধ্যে 'অদ্বৈত' (যাহার দ্বিতীয় নাই) বেদান্তই সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং ভাবপূর্ণ। ইহা পরিপূর্ণরূপে Non-Dualism—দ্বৈতবাদের অস্বীকার। একমাত্র অনন্ত সত্য ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সত্যের নাম চিন্ময়, ভগবান, অসীম, অব্যয়, ব্রহ্ম, আত্মা ইত্যাদি। কারণ, এই সত্য নির্গুণ, সূত্র দিবার পক্ষে সাহায্য করার মতো ইহার কোনো গুণ নাই। সূত্র নির্দেশের জন্য শংকর যতোবারই চেষ্টা করিয়াছেন, প্রতিবারই তিনি ডেনিস দি এরোপাগিটের মতোই কেবল একটি মাত্র উত্তর পাইয়াছেন: "নয়! নয়!" আমাদের মন এবং অনুভূতির জগৎ—যাহা কিছুরই অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাই একটি ভ্রান্তি ('অবিদ্যা') সমাচ্ছন্ন অব্যয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। শংকর এবং তাঁহার শিষ্যরা অবিদ্যার কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা সহজে দিতে পারেন নাই। এই অবিদ্যার বশেই ব্রহ্ম বহু নাম ও আকার ধারণ করেন—যে আকার ও নাম অনস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই নহে। এই 'অহম' মায়ার বিশ্বপ্লাবনের মধ্যে একমাত্র যে অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাহাই সত্য সত্তা, অদ্বিতীয় পরমাত্মা। সৎ কর্ম এই পরমাত্মার উপলব্ধির জন্য কোনো সাহায্য করিতে পারে না। তবে সৎ কর্মের সাহায্যে এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে পারে, যাহা হইতে চৈতন্যের উদয় হওয়া সম্ভব। কিন্তু একমাত্র এবং প্রত্যক্ষ চৈতন্য হইতেই কেবল আত্মার মুক্তি সম্ভব। তাই গ্রীকরা যখন বলিয়াছিলেন, "নিজেকে জানো" তখন ভারতীয় বৈদান্তিকেরা বলিয়াছেন, "আত্মাকে দেখ, আত্মা হও"। তৎ ত্বম্ অসি। (তুমি তাহাই।)

উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। কারণ, তাহা কেবল ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ নহে, তাহা পশ্চিমদেশীয় সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলিরও অঙ্গ। তাহার মধ্যে আত্মার আত্মপ্রকাশ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক রীতি-নীতিগুলি লিপিবদ্ধ ও গচ্ছিত রহিয়াছে।

"উলঙ্গ তোতাপুরী আমাকে সকল বস্তু হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মার গভীরে তাহাকে নিক্ষেপ করিতে শিখাইলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা সত্ত্বেও আমি নাম এবং আকারের সীমা অতিক্রম করিয়া সেই অনপেক্ষিত সত্তার মধ্যে আপনাকে লইয়া যাইতে পারিলাম না। অবশ্য জ্যোতির্ময়ী মার সেই সুপরিচিত মূর্তি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বস্তু হইতে আমার মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে আমি বিশেষ অসুবিধা বোধ করি নাই। মা ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানের সার। তাই তিনি আমার সম্মুখে জীবন্ত বাস্তবতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। তিনি সুদূরের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্বৈত বেদান্তের বাণীগুলিতে আমার মনকে নিবিষ্ট করিতে আমি কয়েকবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু প্রতিবারেই মাতৃমূর্তি আসিয়া বাধা ঘটাইল। অবশেষে হতাশ হইয়া আমি তোতাপুরীকে বলিলাম: 'ইহাতে কোনো লাভ হইতেছে না। আমি আমার মনকে কখনো সেই "অনপেক্ষিত" অবস্থায় লইয়া গিয়া আত্মার সম্মুখীন হইতে পারিব না।' তিনি ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, 'কি বলিলে? পারিবে না? তোমাকে পারিতেই হইবে।' বলিয়া তিনি ইতস্ততঃ চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া একটি কাচ-খণ্ড সংগ্রহ করিলেন এবং আমার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে রাখিয়া বলিলেন, 'ও দিকেই তোমার সমগ্র মন নিয়োজিত কর!' অতঃপর আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়া ধ্যান করিতে লাগিলাম এবং যখনই আমার চোখের সম্মুখে সেই সুললিত মাতৃমূর্তি আবির্ভূত হইল, তখনই আমি তাহাকে আমার বিচার-রূপ তরবারির আঘাতে দ্বিধা বিভক্ত করিলাম। এইরূপে শেষ অন্তরায় অন্তর্হিত হইল; আমার মন অবিলম্বে 'অপেক্ষিতের' সীমা পার হইয়া ধাবিত হইল এবং আমি সমাধিস্থ হইলাম।"

অনধিগম্যের এই তোরণদ্বার কেবলমাত্র প্রবল চেষ্টা ও অপরিসীম দুঃখ-দহনের মধ্য দিয়াই উন্মুক্ত করা যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণ এই তোরণ-দ্বার পার হইতে না হইতেই সমাধির শেষ স্তর—নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন। এই সমাধির মধ্যে ব্যক্তি ও বিষয়, উভয়ই অন্তর্হিত হইল।

"বিশ্ব নির্বাপিত হইল। স্থানও লয় পাইল। প্রথমে অন্তরের অস্পষ্ট গভীরে ভাবের ছায়াগুলি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। অহমের একটি অস্পষ্ট দুর্বল চেতনা কেবলই অবিরাম এক ঘেয়ে ভাবে স্পন্দিত হইয়া চলিল। কিন্তু

অবশেষে তাহাও থামিয়া গেল। 'অস্তিত্ব' ভিন্ন আর কিছুই রহিল না। আত্মা সত্তায় মগ্ন হইলেন, দ্বৈততা নিশ্চিহ্ন হইল। সসীম এবং অসীম বিস্তার এক হইয়া গেল; শব্দের অতীত, চিন্তার অতীত হইয়া তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন।"

যে-সিদ্ধিলাভ করিতে তোতাপুরীর চল্লিশ বৎসর লাগিয়াছিল, রামকৃষ্ণ তাহা একদিনেই লাভ করিলেন। এই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার ফল দেখিয়া স্তব্ধবিস্মিত হইলেন। দিনের পর দিন রামকৃষ্ণের দেহ কঠিন ও নিঃসাড় অবস্থায় রহিল। যে আত্মা সকল জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহারই পরম প্রশান্ত জ্যোতিতে দেহ লাবণ্যময় হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে সন্ন্যাসী তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

তোতাপুরী তাঁহার নিয়ম অনুসারে একস্থানে মাত্র তিন দিন থাকিতে পারিতেন। কিন্তু যে শিষ্য গুরুকে অতিক্রম করিয়া গেল, তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তিনি ওখানে এগারো মাস রহিয়া গেলেন। এবার তাঁহাদের ভূমিকায় পরিবর্তন ঘটিল। তরুণ বিহঙ্গ আকাশের ঊর্ধ্বতর লোক হইতে অবতরণ করিলেন। এই ঊর্ধ্ব লোক হইতে তিনি উচ্চতম পর্বতেরও গণ্ডী ছাড়াইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। বৃদ্ধ 'নাগা'[১] সন্ন্যাসীর তীক্ষ্ণ সংকীর্ণ চক্ষুর অপেক্ষা এ তরুণ বিহঙ্গের আয়তত্তর অক্ষি এক বিশালতর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাই বিহঙ্গ এবার সর্পকে শিক্ষা দিতে লাগিল।

কিন্তু বিনা বিরোধিতায় ইহা ঘটিল না।

আসুন, আমরা এই দুইজন দ্রষ্টাকে মুখোমুখি লক্ষ্য করি।

রামকৃষ্ণের দেহ ক্ষুদ্র, বর্ণ হরিদ্রাভ, গুম্ফ হ্রস্ব, এবং চক্ষু দুটি অর্ধনিমীলিত, সুন্দর···"long dark eyes, full of light, obliquely set, and slightly veiled.[২] এই চক্ষুর দৃষ্টি অন্তরে বাহিরে সুদূরে চালিত হয়। অর্ধ-বিকশিত বদন, তাহারই ফাঁকে উজ্জ্বল শ্বেত দন্তে মৃদু মায়াবী[৩] হাসি। সেই হাসিতে স্নেহ ও দুষ্টামি দুই আছে। নাতিদীর্ঘ ক্ষীণকায়, অত্যন্ত দুর্বল মানুষটি।[৪] তাঁহার

১ তোতাপুরী যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাহার নাম 'নাগা'। 'নাগ' শব্দের অর্থ সর্প। (এখানে মঁসিয়ে রোলাঁ ভুল করিয়াছেন। 'নাগা' শব্দটি 'নাংগা' বা 'নগ্ন' হইতে আসিয়াছে, নাগ বা সর্প হইতে নহে।—অনুঃ।)

২ মুখার্জী। (ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়।—অনুঃ)

৩ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৪ পরে যখন তিনি মথুরবাবুর সহিত ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন তিনি অবিলম্বেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। তিনি হাঁটিতে পারিতেন না। তাঁহাকে বহিয়া লইয়া যাইতে হইত।

মানসিক অবস্থা ছিল অসাধারণ অনুভূতিশীল। দৈহিক মানসিক সুখ-দুঃখের সকল হাওয়াই অতি সহজে তাঁহাকে স্পর্শ করিত। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে যাহাই ঘটিত, তাহাই তাঁহার মধ্যে ভিতরে বাহিরে, দুই দিকেই প্রতিফলিত হইত। সত্যই, তাঁহাকে জীবন্ত একটি মুকুর বলা চলে। তিনি অদ্বিতীয় শিল্প-প্রতিভার অধিকারী হওয়ায় তাঁহার আত্মা মুহূর্তে নিজেকে অন্যের আত্মার অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পাইত। কিন্তু তাহাতে নিজের অটল নগর দুর্গ[১]—অনন্ত গতির অক্ষয় অস্থির কেন্দ্রটিকে কখনো হারাইত না।" তিনি ঘরোয়া বাংলায় কথা বলিতেন। ···ঈষৎ তোৎলামি ছিল, তাহা ভালোই লাগিত। তোৎলামি সত্ত্বেও তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্য লোকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়া থাকিত। রামকৃষ্ণের ছিল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অতুলনীয় সম্পদ, তুলনা ও উপমার অফুরন্ত ভাণ্ডার, লক্ষ্য করিবার অতুলনীয় শক্তি, সরস সহাস্য রসিকতা, সর্বজনের প্রতি সমান সহানুভূতি এবং অবিরাম অনর্গল জ্ঞান।[২] "

রামকৃষ্ণ যেন গঙ্গা। গঙ্গার মতোই তিনি গভীর; গঙ্গার মতোই তাঁহার বুকে প্রতিবিম্ব পড়ে; গঙ্গার মতোই বাহিরে তিনি তরল। তাঁহারও স্রোত আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে বহন করিয়া পোষণ করিয়া চলে। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে যে-মানুষটি, তিনি জিব্রল্টার পাহাড়ের মতো উন্নত। সুদীর্ঘ সুদৃঢ় বিপুল তাঁহার দেহ, দুর্ধর্ষ-দুর্দম—যেন সিংহের মূর্তিতে তিনি কোনো পর্বত। তাঁহার দেহ ও মন দুই-ই লৌহের মতো। অসুস্থতা বা পীড়া কী বস্তু, তাহা তিনি জানেন না। সেগুলি তাঁহার নিকট তুচ্ছ ও হাস্যকর বস্তু মাত্র। বহু মানুষের নেতৃত্ব করিবার মতো তাঁহার প্রচুর শক্তি রহিয়াছে। পর্যটকের জীবন গ্রহণ করিবার

১ অর্থাৎ, যখন তিনি সকল প্রকার আকার ও গতির সূত্রকে তাহাদের কেন্দ্র, ব্রহ্মের সহিত মিলিত করিতে সমর্থ হইলেন, তখন হইতে। এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এগুলি কর্তৃক পৃথকভাবে প্রভাবিত হইতেন।

[এখানে মূলে "feste Burg" কথা দুইটি রহিয়াছে। ইহা জার্মান ভাষা। ইহার অর্থ—'অটল নগর-দুর্গ'। প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রবর্তক লুথার যখন ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বিচারার্থে জার্মানির রাজ-দরবারে আনীত হন, তখন যে গানটি গাওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রথম কলি ছিল "Ein feste Burg ist unser Gott"—ভগবানই আমাদের নিশ্চিত অটল দুর্গ"। রোলাঁ এখানে সম্ভবতঃ তাহারই ইংগিত করিতেছেন। —অনুঃ]

২ এই বর্ণনার শেষাংশ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি হইতে লওয়া হইয়াছে। ইনি এখনো জীবিত আছেন। তাঁহার নাম নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ('প্রবুদ্ধ ভারত', মার্চ ১৯২৭ এবং 'দি মডার্ণ রিভিউ', মে, ১৯২৭, দ্রষ্টব্য)

পূর্বে তিনি পাঞ্জাবে একটি মঠে সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ মঠে শত সন্ন্যাসী বাস করিতেন। নিয়মানুবর্তিতার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ। ফলে তাঁহার দেহ ও মনের সহজ চাঞ্চল্য বিনষ্ট হইয়াছে।[১] বিপদ-আপদ, ভাবাবেগ, ভাবের আকুলতা মহামায়ার যাদুশক্তি—যাহা সমগ্র অস্তিত্বে তুমুল তরঙ্গ তুলে—সে সমস্ত কিছুই যে তাঁহার সার্বভৌম ইচ্ছাশক্তিকে ব্যাহত করিতে পারে, এমন কথা তিনি কখনো কল্পনাও করেন নাই। তাঁহার নিকট মায়া এমন একটি বস্তু, যাহার কোনো অস্তিত্ব নাই, যাহা শূন্যতা, যাহা মিথ্যা। তাহাকে চিরদিনের জন্য দূর করিতে হইলে কেবল তাঁহার নিন্দার প্রয়োজন। কিন্তু রামকৃষ্ণের নিকট মহামায়াই ভগবান, কারণ সমস্ত কিছুই ভগবান, তাহা ছাড়া মায়া ব্রহ্মের একদিক। কেবল তাহাই নহে, রামকৃষ্ণ যখন বিক্ষোভের মধ্য দিয়া শিখর-দেশে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তিনি উত্থান-পথের বেদনা, আনন্দোচ্ছ্বাস এবং আকস্মিক বাধা-বিপত্তির কিছুই ভুলিলেন না। সামান্যতম দৃশ্যও তাঁহার স্মৃতিকে জড়াইয়া রহিল। সেগুলি স্ব স্ব স্থানে, কালের ও স্থানের স্বাতন্ত্র্যে, শিখরগুলির শোভাকে বিচিত্র করিয়া তুলিল। কিন্তু সেখানে ঐ 'নগ্ন সন্ন্যাসীর' স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখিবার মতো কী ছিল? তাঁহার দেহের মতোই তাঁহার মনও ছিল ভাবাবেগশূন্য, আকর্ষণশূন্য। কোন একজন ইতালীয় উম্ব্রিআর শ্রেষ্ঠ চিত্রকরকে[২] 'পরফিরির মস্তিষ্ক'[৩] এই আখ্যা দিয়াছিলেন। তোতাপুরী সম্পর্কেও এই আখ্যাটি সংগত। তাঁহার মতো কোনো প্রস্তর ফলকে কিছু ক্ষোদিত করিতে হইলে প্রয়োজন ছিল বেদনার—ফলপ্রসূ বেদনার। এবং তাহা হইলও।

অতুলনীয় বুদ্ধির অধিকারী হইয়াও তোতাপুরী বুঝিতে পারিলেন না, যে-সকল পথে ভগবানের সাক্ষাৎ মিলে, প্রেমও তাহাদের অন্যতম একটি। তাই তিনি রামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতাকে ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন, উপাসনার মন্ত্র, সংগীত,

১ ধ্যানের মুদ্রাগুলির মধ্যে যে রীতি অবলম্বন করা হইত, তাহা আমাদের কালের শিক্ষামূলক মন-দেহতত্ত্বের গবেষণার বিষয় হইত পারে। প্রথমে, সচ্ছন্দ আসন; পরে কঠিন হইতে কঠিনতর আসন; পরে অনাচ্ছাদিত ভূমিতে আসন এবং সম্পূর্ণ উপবাসী ও নগ্ন না হওয়া পর্যন্ত অন্ন ও বস্ত্রের ক্রমিক হ্রাস। এই দীক্ষার পরে তরুণ ব্রহ্মচারীরা দেশের নানা স্থানে ঘুরিতে থাকেন। প্রথমে তাঁহাদের সঙ্গী থাকে। পরে বহির্জগতের সমস্ত বাধা-বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন না করা পর্যন্ত তাঁহারা একাকী পরিভ্রমণ করিতে থাকেন।

২ রাফাএলের গুরু, পিএত্রো পেরুজিনো। তাঁহার সম্বন্ধে ভাসারি এই কথা বলিয়াছিলেন।

৩ পরফিরি—এক প্রকার লাল প্রস্তর।—অনু:

স্তোত্র এবং ধর্ম-সংক্রান্ত নৃত্য প্রভৃতি বাহিরের অনুষ্ঠানগুলির তিনি তীব্র নিন্দা করিলেন। সন্ধ্যায় যখন রামকৃষ্ণ করতালি দিয়া তালে তালে ভগবানের নাম জপ করিতেন, তখন ব্যংগভরে তিনি প্রশ্ন করিতেন, ওহে, রুটি বানাইতেছ নাকি ?

কিন্তু তাঁহার বাধাদান সত্ত্বেও তাঁহার উপর জাদু কাজ করিতে লাগিল। রামকৃষ্ণ মধুর কণ্ঠে যে সকল স্তোত্র গান করিতেন, সেগুলির কয়েকটি তাঁহাকে এমন অভিভূত করিত যে, তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িত। বাংলার বিশ্বাসঘাতক অলস জলবায়ুও পাঞ্জাবী তোতাপুরীর উপর কাজ করিল, যদিও সে প্রভাবকে তিনি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার শক্তিতে শৈথিল্য আসায়, তিনি আর তাঁহার ভাবাবেগগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেন না। এমন কি, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মনের মধ্যেও বৈপরীত্য থাকে, যদিও সেই বৈপরীত্য অধিকাংশ সময় ঐ সকল মনের অধিকারীদের নিকট ধরা পড়ে না। সকল প্রকার অনুষ্ঠানকে তোতাপুরী বিদ্রূপ করিলেও অগ্নির মধ্যে তিনি একটি প্রতীক লক্ষ্য করিতেন। কারণ, তিনি নিজের পাশে সর্বদাই আগুন জ্বালাইয়া রাখিতেন। একদিন একজন ভৃত্য ধুনী হইতে কয়েকটি কাঠ সরাইতে গেলে, তিনি ভৃত্যের এইরূপ অশ্রদ্ধাচরণের প্রতিবাদ করিলেন। তাহা দেখিয়া রামকৃষ্ণ শিশুসুলভ উচ্চহাস্যে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন :

"দেখুন ! দেখুন ! আপনিও মহামায়ার দুর্ধর্ষ শক্তির কাছে হার মানিলেন।"

তোতাপুরী স্তম্ভিত হইলেন। তিনি কি সত্যই তবে নিজের অজ্ঞাতসারে মায়ার নিকট হার মানিয়াছেন ? কিছুদিন পীড়িত হওয়ার ফলেও তাঁহার এই গর্বিত আত্মা নিজের সীমা-সংকীর্ণতা বুঝিতে পারিল। কয়েক মাস বাংলা দেশে থাকায় তাঁহার কঠিন আমাশয় হইল। তিনি বাংলাদেশ হইতে অন্যত্র গেলেই পারিতেন, কিন্তু গেলেন না। কারণ, তাহা দুঃখ অমঙ্গলের ভয়ে পলায়ন মাত্র হইবে। তিনি ক্রমেই একগুঁয়ে হইয়া উঠিলেন। "দেহের নিকট আমি কোনো মতেই হার মানিব না।" তাঁহার কষ্ট ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। দেহ হইতে তাঁহার আত্মা আপনাকে কোনোরূপে মুক্ত করিতে পারিল না। তিনি চিকিৎসা করাইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না। বেলা পড়ার সঙ্গে যেমন ছায়া বাড়ে, প্রতিটি নূতন দিনের সঙ্গেই তেমনি তাঁহার ব্যাধিও বাড়িতে লাগিল। অবশেষে তাহা এমন বাড়িল যে সন্ন্যাসী ব্রহ্মের চিন্তায় আর মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। তিনি দেহের এই ক্ষয়প্রাপ্তি লক্ষ্য করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং গঙ্গায় ইহাকে বিসর্জন দিতে গেলেন। কিন্তু কোনো

এক অদৃশ্য হস্ত যেন তাঁহাকে বাধা দিল। তিনি নদীতে নামিয়া দেখিলেন, ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবার মতো ইচ্ছা বা শক্তি তাঁহার নাই। তিনি অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মায়ার শক্তি বুঝিলেন। কি জীবনে, কি মৃত্যুতে, কি গভীরতম ব্যথায়, কি দেবীর মধ্যে—মায়া সর্বত্রই বিরাজ করিতেছে। তিনি সমস্ত রাত্রি একাকী চিন্তায় কাটাইলেন। প্রত্যুষে তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি রামকৃষ্ণের নিকট স্বীকার করিলেন, ব্রহ্ম এবং শক্তি বা মায়া এক, অদ্বিতীয়। দেবী সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীকে ব্যাধিমুক্ত করিলেন।

অতঃপর সন্ন্যাসী জ্ঞানের অধিকারী হইয়া তাঁহার প্রাক্তন শিষ্য ও বর্তমান গুরুর নিকট বিদায় লইয়া আপনার গন্তব্যপথে যাত্রা করিলেন।[১]

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ তোতাপুরী সম্পর্কে তাঁহার দুইরূপ অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেন:

"যখন আমি পরম সত্তাকে নিষ্ক্রিয়রূপে কল্পনা করি—যখন তিনি সৃষ্টি করেন না, রক্ষা করেন না, বা ধ্বংস করেন না—তখন তাঁহাকে আমি বলি ব্রহ্ম বা পুরুষ,—নিরাকার বিধাতা। অন্যপক্ষে, আমি যখন তাঁহাকে সক্রিয়রূপে কল্পনা করি—যখন তিনি সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন, ধ্বংস করেন, তখন তাঁহাকে বলি 'মায়া' বা প্রকৃতি—সাকার বিধাতা। কিন্তু তাঁহাদের এই বিভিন্নতার অর্থ পার্থক্য নহে। নিরাকার ও সাকার, দুই একই সত্তা,—যেমন দুধ আর দুধের শাদা রঙ, হীরক আর তাহার জ্যোতি, সাপ এবং তাহার সর্পিলতা। একেকে বাদ দিয়া অপরটিকে ভাবা অসম্ভব। মা এবং ব্রহ্ম দুই-ই এক।"[২]

---

১ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি সময়ে তোতাপুরী প্রস্থান করেন। আজ খুদিরামের পুত্র যে-রামকৃষ্ণ নামে সুবিখ্যাত হইয়াছেন, তাহা সম্ভবত তোতাপুরীই সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তাঁহাকে দিয়াছিলেন। (সারদানন্দকৃত 'সাধকভাব' ২৮৫ পৃষ্ঠা, টিকা ১—দ্রষ্টব্য।)

২ কালীর প্রতি রামকৃষ্ণের এই প্রেম-ধর্ম এবং আপাত দৃষ্টিতে যাহাকে বিগ্রহপূজা বলিয়া মনে হয়, সেই গভীর বিশ্ব-ঐক্য-বোধ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কী মতামত গড়িয়া ওঠা উচিত, তাহা অন্য একটি রচনা হইতেও পাওয়া যায়। এই রচনা অপেক্ষাকৃত পরিচিত না হইলেও অপেক্ষাকৃত বিস্ময়কর যে, তাহাতে সন্দেহ নাই:

"তোমরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বল, কালীর সহিত তাঁহার কোনো পার্থক্য নাই। কালী হইলেন আদিম শক্তি। এই শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকেন, তখন আমরা তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি; কিন্তু যখন সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কাজ করেন, তখন বলি শক্তি বা কালী। তোমরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলো, এবং আমি যাঁহাকে কালী বলি, তাঁহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই—যেমন কোনো পার্থক্য নাই অগ্নি এবং তাহার দহন-শক্তির মধ্যে। একের কথা ভাবিলে আপনা হইতেই অন্যের কথা ভাবিতে হয়। কালীকে গ্রহণ করাই ব্রহ্মকে গ্রহণ করা। ব্রহ্মকে গ্রহণ করাই কালীকে গ্রহণ করা। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি পৃথক নহে। এবং তাহাকেই আমি শক্তি বা কালী বলি।"

[শংকরাচার্য এবং রামানুজের দর্শন সম্পর্কে নরেন (বিবেকানন্দ) ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহিত রামকৃষ্ণের আলোচনা।—'দি বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় (নভেম্বর, ১৯১৬) প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে।]

৪

অব্যয়ের সহিত ঐক্যবোধ

এই মহান চিন্তা অভিনব কিছুই নহে। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের আধ্যাত্মিকতা ইহার দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে এবং এই ভাবেই বেদান্ত দর্শনের দ্বারা ইহা নানা রূপ অধ্যায়ের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এই দুই বিরাট মতবাদী বৈদান্তিকগণের মধ্যে এ বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছে, অথচ কোনো শেষ বা মীমাংসা হয় নাই। প্রথম দল, অর্থাৎ পরিপূর্ণ অদ্বৈতবাদী যাঁহারা, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, বিশ্ব অবাস্তব, অব্যয় বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। দ্বিতীয় দল, যাঁহারা পরিপূর্ণ অ-দ্বৈতবাদী নন, তাঁহারা ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সত্য, তবে তাঁহারা প্রতীয়মান বিশ্বকে, ব্যষ্টিগত আত্মাকে, কতকগুলি পরিবর্তন বা রীতির রূপ বলিয়াই মনে করেন; মনে করেন, সেগুলি মায়া নহে,—সেগুলি ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণের জ্যোতিবিকাশ মাত্র। এমনি হইল চিন্তা এবং শক্তি—যে শক্তি প্রাণী-বৃদ্ধির বীজ বপন করে[১]। এই দুই দল মতবাদীই পরস্পরকে সহ্য করিয়া চলেন। তবে দ্বিতীয় দল মানবিক দুর্বলতার সংগে একটা সাময়িক আপোষ করিতেছে বা কম্পিত পদে ঊর্ধ্বলোকে উত্থিত হইবার কালে একটা ভর করিবার মতো কিছুর আশ্রয় করিতে চাহিতেছে, এইরূপ ভাবিয়া প্রথম দলের চরমপন্থীরা দ্বিতীয় দলকে অবহেলার চক্ষেই দেখেন। মায়ার সারবস্তু কি, তাহার সূত্র নির্ধারণই সর্বদা উভয় দলের আলোচনার মূলকথা হইয়াছে। ইহা আপেক্ষিক, কিম্বা অব্যয়? শংকর নিজেও মায়ার কোনরূপ সূত্র দিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল মাত্র বলিয়াছেন, মায়া রহিয়াছে এবং অদ্বৈত দর্শনের উদ্দেশ্য হইল সেই মায়াকে ধ্বংস করা। অপর পক্ষে, রামানুজের মতো আপেক্ষিক অদ্বৈতবাদী যাঁহারা, তাঁহারা এই মায়াকে কোনো রূপে ব্যক্তিগত আত্মার উদ্‌বর্তনের কাজে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন।

সুতরাং, এই দুই দলের মতাবলম্বীর মধ্যে তবে ঠিক কোথায় রামকৃষ্ণের স্থান? রামকৃষ্ণের স্বাভাবিক শিল্পমুখিতা তাঁহাকে কতক পরিমাণে রামানুজের আপোষপন্থী

১ এইরূপে *Natura Naturans* (প্রকৃতি যাহা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করে)-এর সোপান সর্বদাই গতিশীল, এবং ক্রমবর্ধমান উহার নিহিত শক্তি। ম্যাকস্ মুলার এবং তাঁহার পরে বিবেকানন্দ ইহার মধ্যে বিবর্তনবাদের বীজ লক্ষ্য করেন।

সমাধানের অনুকূল করিয়া তোলে। আবার, অপর পক্ষে, তাঁহার বিশ্বাসের তীব্রতা তাঁহাকে পরিপূর্ণ অদ্বৈতবাদের চরমপন্থিতারও সমর্থক করে। রামকৃষ্ণ নিজের প্রতিভা-গুণে আবিষ্কার করেন যে, অত্যন্ত বিশদ বর্ণনা, বা নিপুণ রূপক-উপমার দ্বারা কেবল যে ব্যাখ্যা করাই যায় না, তাহাই নহে, এমন কি, বুদ্ধির দ্বারা তাহার সমীপবর্তী হওয়াও যায় না। বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয় বস্তু যদি না থাকে, তবে পরিশুদ্ধি, 'পরম বুদ্ধির'-ও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই প্রতিবাদের উত্তরে শংকরাচার্য বলিয়াছিলেন, "আলোকিত করার মতো বস্তু না থাকিলেও সূর্য আলোক-দান করে।" এই সূর্যে, অর্থাৎ "অনপেক্ষিত আত্মায়" রামকৃষ্ণ একরকম দৈহিক সম্পর্ক আরোপ করেন। তবে তাঁহার প্রকাশ-ভংগীর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি-শক্তি এমন প্রখর ছিল যে, আলোকিত করা যায় এমন বস্তুর পাশ দিয়া যাইবার সময়ে, এমন কি যখন তিনি সেগুলিকে অস্বীকারও করিতেন, সেগুলিকে লক্ষ্য না করিয়া পারিতেন না। তিনি বলেন, 'সূর্য' ভালো ও মন্দ, উভয়ের উপরেই সমানভাবে আলোকপাত করেন। 'তিনি' প্রদীপের মতো। প্রদীপের আলোতে একজন যখন শাস্ত্র পাঠ করেন, তখন অন্যজন রচনা করে জাল দলিল। 'উহা' চিনির পাহাড়ের মতো। পিপীলিকারা আপনাদের সাধ্যমতো চিনি লইয়া যায়। 'উহা' লবণ সমুদ্রের মতো—যে সমুদ্রের ধারে লবণের পুতুল গভীরতা মাপিবার জন্য নামে, এবং নামিবার সংগে সংগেই গলিয়া যায় ও আত্ম-হারা হইয়া অদৃশ্য হয়[১]। এই "অনপেক্ষিত সত্তা" এমন কিছু যাহাকে ধরা যায় না। 'ইহা' ধরা দেয় না, পলাইয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, আমাদের অস্তিত্ব নাই। আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে, ভালো মন্দ সকল প্রকার জ্ঞান ও অজ্ঞানতাকে, 'ইহা' আলোকিত করে। আমরা 'ইহার' বাহিরের কঠোর আবরণে কেবলমাত্র ঠোকরাইতেছি। কিন্তু 'ইহা' যখন আমাদিগকে 'ইহার' বিরাট মুখের মধ্যে গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করে, তখন 'ইহার' সহিত আমাদের মিলনও ঘটে। উহা কোথা হইতে আসিল? কিন্তু এই মিলনের পূর্বে ঐ লবণের পুতুল কোথায় ছিল? ঐ পিপীলিকারাই বা কোথায় ছিল? সাধু বা জালিয়াৎ যিনিই প্রদীপের

---

১ "একদা একটি লবণের পুতুল ছিল। সে একবার সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার ইচ্ছায় একটি মাপকাঠি হাতে লইয়া সমুদ্রের তীরে গেল। এবং জলের ধারে পৌঁছিয়া বিপুল সমুদ্রকে প্রত্যক্ষ করিল। এই পর্যন্ত সে লবণের পুতুলই রহিল। কিন্তু যদি সে আর এক পদ মাত্র অগ্রসর হইত এবং যদি একটি পা সমুদ্রের জলে দিত, তবে সে সমুদ্রের সহিত মিশিয়া যাইত। মহা-সমুদ্রের গভীরতা কতো তাহা বলিবার জন্য ঐ লবণের পুতুল আমাদের কাছে আর কখনো ফিরিয়া আসিত না।" (রামকৃষ্ণ কথামৃত)

আলোকে কাজ করুন, তাঁহার গৃহই বা কোথায় ছিল, কোথায় ছিল তাঁহার পাঠ্য বিষয়, কোথায় বা ছিল তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ?

রামকৃষ্ণ বলেন, এমন কি ভগবৎ প্রেরণা দ্বারা লিখিত পবিত্র মন্ত্রগুলিও সমস্তই কমবেশী অপবিত্র হইয়াছে। কারণ, সেগুলিও মানুষের মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে। কিন্তু এই অপবিত্রতা কী সত্যকারের অপবিত্রতা ? (কারণ, ইহা তো পূর্ব হইতে ব্রহ্মরূপ পবিত্রতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।) যে-মুখ, যে-ওষ্ঠাধর ভগবান রূপ আহার্যের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর অস্তিত্ব কোথায় ?

বিশেষ করিয়া শেষ আশ্রয়ের সহিত "সম্পর্ক"—"অপৃথকীকৃতের সহিত পৃথকীকৃতের মিলনই" যখন, রামকৃষ্ণের নিজের ভাষায়, "বেদান্তের সত্যকারের লক্ষ্য[১]," তখন যাহা "পৃথকীকৃত" তাহা "সম্পর্কহীন" হইলেও "অপৃথকীকৃতের" অংশ না হইয়া পারে না[২]।

বস্তুতঃ, রামকৃষ্ণ দিব্য দর্শনের দুইটি পৃথক স্তর ও পর্যায় নির্দেশ করিয়াছেন : এক, যে-মায়া "পৃথকীকৃত" বিশ্বের সত্যতা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া ; দুই, পরিপূর্ণ ধ্যান বা সমাধির মধ্য দিয়া—এই সমাধির মধ্যে অসীমের সহিত একটি মুহূর্তের যোগই আমাদের এবং অপর মানুষের, সকলের "পৃথকীকৃত" অহমের মায়াকে অচিরেই দূর করিতে যথেষ্ট। কিন্তু রামকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছেন, যতোক্ষণ আমরা বিশ্বের অংশরূপে রহিয়াছি বা নিজেদের ঐক্যবোধের জন্য ইহার নিকট হইতে বাস্তবতার অনির্বাণ বিশ্বাসের শিখাকে (যদিও ইহা আমাদের গোপন প্রদীপেই জ্বলিতেছে) গ্রহণ করিতেছি, ততোক্ষণ এই বিশ্বকে অবাস্তব বলিয়া বৃথা ভান করা নিতান্তই অসম্ভব। এমন কি, সাধুরা যখন তাঁহাদের সমাধি হইতে সাধারণ জীবনের স্তরে নামিয়া আসেন, তখন তিনিও তাঁহার "পৃথকীকৃত" অহমের—সে

১ এখানে লক্ষণীয় যে এই অদ্বৈতবাদী অব্যয়ের অধিবিদ্যার (metaphysics) সংগে প্রাক্-সক্রেতিসীয় গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদের সাদৃশ্য রহিয়াছে। যথা, আইওনিয়াবাসী দার্শনিক এনাক্সিমিন্দরের "অস্থির বা অনির্ণেয়"—যাহাতে তিনি বলিয়াছেন, পৃথকীকরণের দ্বারাই সকল বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে। অবশ্য, এই প্রথম যুগের গ্রীক দার্শনিকদের সহিত ভারতীয় দার্শনিক অগ্রদূতদের চিন্তার ছিন্ন যোগসূত্রকে আবিষ্কার ও গ্রথিত করিতে হইলে এ-বিষয়ে প্রচুর গবেষণা ও সন্ধান করিতে হইবে।

২ এজন্য আমি তাঁহার ১৮৮২ খৃস্টাব্দের সাক্ষাৎকারগুলির উপরই নির্ভর করিয়াছি। এই সাক্ষাৎকারগুলি তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেই ঘটিয়াছিল। সুতরাং এ-গুলির মধ্যে তাঁহার চিন্তার মূল কথাগুলি নিহিত আছে।

অহম্ যতোই ক্ষীণ বা শুদ্ধীকৃত হউক না কেন—আবরণের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। আপেক্ষিকতার বিশ্বে তাঁহাকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। "তাঁহার অহম্ তাঁহার নিকট আপেক্ষিকভাবে যতোখানি সত্য, এই বিশ্বও তাঁহার নিকট ততোখানিই সত্য হইবে। কিন্তু তাঁহার আত্মা যখন শুদ্ধীকৃত হয়, তখন তিনি সমস্ত বিশ্বকেই ইন্দ্রিয়ের নিকট 'পরমের' বহু রূপে প্রত্যক্ষ করেন।"

তখনই 'মায়া' তাহার সত্যকারের রূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। বুঝা যায়, ইহা একই সময়ে সত্য এবং মিথ্যা, জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা (বিদ্যা ও অবিদ্যা), প্রত্যেকটি বস্তু, যাহা ভগবানের নিকটে লইয়া যায়, আবার প্রত্যেকটি বস্তু যাহা ভগবান হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। সুতরাং, ইহার অস্তিত্ব আছে।

বিজ্ঞানীদের, অর্থাৎ অতি-জ্ঞানের অধিকারী যে-সকল ব্যক্তি নিজেদের জীবনে দেহগত ও দেহাতীত ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের সপক্ষে ধর্মপ্রচারক সেণ্ট টমাসের[১] ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের যথেষ্ট মূল্য ছিল। কারণ, তিনি ভগবানকে দেখিয়াছিলেন, স্পর্শ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের এই সাক্ষ্যেরও তেমনি একটি মূল্য রহিয়াছে। কারণ, তিনিও নিজে ঐ বিজ্ঞানীদেরই একজন ছিলেন।

তাঁহারা ভগবানকে অন্তরে এবং বাহিরে উভয়ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভগবান 'নিজেকে' তাঁহাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। দেহধারী ভগবান তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন: "আমিই অব্যয়, আমিই পরম। আমিই সকল 'পৃথকীকরণের' মূলাধার।" পরম পুরুষ হইতে যে দিব্য শক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহার মূলে তাঁহারা সেই ভাবকে অনুভব করিয়াছেন, যাহা পরমাত্মা এবং বিশ্বকে পৃথক করিয়াছে, এবং 'পরম পুরুষ' ও 'মায়ার' মধ্যে যাহার কোনো পার্থক্য নাই। মায়া বা শক্তি বা প্রকৃতি ভ্রান্তি মাত্র নহে। শুদ্ধ সমন্বয়ের নিকট 'তাহা' পরম আত্মার প্রকাশ এবং বিশ্ব জীবাত্মার অপূর্ব নির্ঝর ধারা মাত্র।

ঐ সময় হইতে সকল কিছুই সহজ হইয়া গেল। ব্রহ্মের অগ্নিসমুদ্র হইতে তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তিনি সানন্দে দেখিলেন, সমুদ্রতীরে 'মা' তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এবার তিনি 'তাঁহাকে' নূতন চক্ষে দেখিলেন; 'তাঁহার' মধ্যে এক গভীর অর্থ আবিষ্কার করিলেন—'তিনি' ও পরম পুরুষ অভিন্ন। 'তিনিই' অব্যয়। মানুষের নিকট নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য দেহাতীত তিনি লোকের—

১ সেণ্ট টমাস—ইনি যীশুখৃস্টের প্রাথমিক বারোজন শিষ্যের একজন।—অনু:

স্ত্রীলোকের[১] রূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনিই সকল অবতারের মূল, তিনিই অসীম ও সসীমের মধ্যে দিব্য সংযোগ-সাধিকা।[২]

তাই রামকৃষ্ণ মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করেন :

"আমার 'মা' সেই পরম পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে। তিনিই একই সংগে এক এবং বহু, এবং এক ও বহুর অপেক্ষাও বেশী। আমার মা বলেন, 'আমিই বিশ্বের জননী, আমিই বেদান্তে বর্ণিত 'ব্রহ্ম', আমিই উপনিষদে বর্ণিত আত্মা। আমিই সেই ব্রহ্ম —যিনি পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাল এবং মন্দ, দুই-ই একভাবে আমার

১ ভারতবর্ষে দেহধারী ভগবানকে নারী ভাবেও কল্পনা করা হইয়াছে : প্রকৃতি, শক্তি।

২ খৃস্টান অতীন্দ্রিয়বাদেও 'পুত্রের' ভূমিকাটি লক্ষ্য করুন :

ভগবান বলিতেছেন—"Effulgence of my glory, Son Beloved,
Son, in whose face invisible is beheld
Visibly, what by Deity I am,
And in whose hand what by decree I do,
Secnod Omnipotence !......

—মিল্টন কৃত *Paradise Lost*, VI, 680

সম্ভবত 'Second' কথাটি বাদ দিলে রামকৃষ্ণও এই কথাগুলিই বলিতে পারিতেন। যে পরম ইচ্ছাশক্তি বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছে, 'Second' কথাটি থাকায় তাহার প্রকাশকে তাঁহার অধীন করা হইয়াছে। কিন্তু উভয়ই সর্বশক্তিমান। রামকৃষ্ণের ব্রহ্মের ন্যায় মিল্টনের ভগবানও পরম পুরুষ, সুতরাং তাঁহার প্রকাশ নাই, এবং তিনি কর্ম করিতে পারেন না ; তিনি ইচ্ছা করেন ; ফলে তাঁহার 'পুত্রই', যিনি 'স্রষ্টা ভগবান', তিনিই ভগবানের হইয়া কাজ করেন. (রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে যেমন কালিকা)। 'পুত্রই' 'শব্দ', তিনিই কথা বলেন, তাঁহার মৃত্যু হয়, জন্ম হয়, তিনিই প্রকটিত হন। পরম পুরুষ হইলেন অদৃশ্য ভগবান।

"Fountain of light, Thyself invisible..."

—*Paradise Lost*, III, 874

তিনি চিন্তার অতীত, স্পর্শের অতীত। তিনি সর্বব্যাপী, তিনি নিশ্চল। কারণ, সমস্ত বস্তুর মধ্যেই তিনি আছেন :

"The Filial Power arrived, and sat him down
With his great Father ; for he also went
Invisible, yet stayed (such privilege
Hath Omnipresence)..."

—*Paradise Lost*, VII, 588

ডেনিস সোরা কৃত *Milton and Christian Materialism in England*, 1928 দ্রষ্টব্য। এই অতীন্দ্রিয়বাদ দুইটির মধ্যে সাদৃশ্য সুস্পষ্ট এবং স্বাভাবিক। দুইটিরই জন্ম প্রাচ্যে, মানুষের মস্তিষ্কের একই সীমাবদ্ধ ক্রিয়ার ফলে দুইটিরই উদ্ভব।

আদেশ পালন করে। কর্মের[1] নিয়ম রহিয়াছে সত্য। কিন্তু আমিই সেই নিয়মের স্রষ্টা। আমিই নিয়ম ভাঙি, নিয়ম গড়ি। ভালো এবং মন্দ সকল কর্মই আমি নিয়ন্ত্রিত করি। আমার কাছে এসো! ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্ম—যাহার মধ্য দিয়াই হউক এসো, কারণ, সব কিছুই ভগবানের পথে লইয়া যায়ঃ আমি তোমাকে এই বিশ্বের, এই কর্ম-সমুদ্রের মধ্য দিয়া লইয়া যাইব। তুমি যদি চাও তবে তোমাকে পরম সত্তা সম্পর্কে জ্ঞানও দান করিব। আমার নিকট হইতে তুমি পলাইতে পার না। এমন কি যাহারা সমাধিস্থ হইয়া পরমতম সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহারাও আমার আদেশে আমার কাছে ফিরিয়া আসে।' আমার মা সেই আদিমতম শক্তি। তিনি সর্বব্যাপী। তিনি দৃশ্যমান জগতের বাহিরে এবং ভিতরে সর্বত্রই রহিয়াছেন। তিনি বিশ্বের জননী, তিনি সমগ্র বিশ্বকে বক্ষে বহন করেন। তিনি উর্ণনাভ; এই বিশ্ব তাঁহার উর্ণার বয়ন; তিনি ঐ লূতাতন্তু আপনার মধ্য হইতে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং অতঃপর আপনার চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছেন। আমার 'মা' একই সংগে ধৃতা এবং ধারিণী[2]। তিনিই খোসা, তিনিই শাঁস।"

এই অকৃত্রিম জপ মন্ত্রের সারবস্তু ভারতের প্রাচীন উপাদানগুলি হইতে গৃহীত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ এবং তাঁহার শিষ্যেরাও এই চিন্তা অভিনব বলিয়া কখনো দাবী করেন নাই।[3] প্রভুর প্রতিভা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রূপ। এই চিন্তার মধ্যে যে-সকল দেবদেবী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন এবং নবরূপে জন্ম দিলেন। তিনি জাগাইয়া তুলিলেন "ঘুমন্ত অরণ্য-সৌন্দর্যের" নির্ঝরগুলিকে। এবং নিজের যাদুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের উত্তাপ-স্পর্শে করিয়া তুলিলেন উষ্ণ।

১ কর্ম—ক্রমাগত অস্তিত্বের সৃজনী শক্তি।

২ রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য 'ম' কথিত "রামকৃষ্ণ-কথামৃত"। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, ১৯২২-২৪ এর শেষ সংস্করণ।

৩ বিপরীত পক্ষে, এমন কি যেখানে তাঁহারা মৌলিকতা দাবী করিতে পারিতেন, সেখানেও তাঁহারা মৌলিকতাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের সত্য যে অতি প্রাচীনকালের সত্য,-সনাতন সত্য, একমাত্র সত্য, এই নিশ্চয়তাদানের মধ্যেই আধুনিক ভারতের মহা ধর্ম মনীষীদের এবং, আমার বিশ্বাস, অন্যান্য সকল দেশের ধর্ম-মনীষীদের সকলের শক্তি নিহিত আছে। 'আর্য সমাজের' কঠোর প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দকে তাঁহার কোনো ভাবের অভিনবত্বের কথা বলিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন।

সুতরাং তাঁহার অকৃত্রিম জপ-মন্ত্র ভাবে, ছন্দে, সংগীতে এবং আবেগময়ী প্রীতির বন্দনায় তাঁহার নিজস্বই ছিল[১]।

কান পাতিয়া এই সংগীত শুনুন। অপূর্ব, মহান এই সংগীত। সীমাহীন, অথচ সংগতিহীন নয়। উহা কোনো কাব্যসুলভ পরিমিত চেহারার মধ্যেও আবদ্ধ নয়, কিন্তু তথাপি এক সুশৃঙ্খল সৌন্দর্য এবং আনন্দের মধ্য দিয়া উহা উৎসারিত। বিনা চেষ্টাতেই মায়ার আবেগময় প্রেমের সহিত এখানে অব্যয়ের প্রতি ভক্তিও মিলিত হইয়াছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের মুখের কথা শুনিয়া এই প্রেমের গভীরতা পরিমাপ করিতে পারি, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই ভালোবাসার আকুলতাই শুনিতে থাকিব। বিবেকানন্দের মতো প্রচণ্ড যোদ্ধাও 'মায়ার' বন্ধনে পড়িয়াছিলেন এবং বন্ধন ভাঙিতে চাহিয়াছিলেন। তাই মায়ার সহিত তাঁহাকে অবিরাম সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। কিন্তু রামকৃষ্ণের এইরূপ কোনো অবস্থা কখনো ঘটে নাই। কখনো কিছুর সহিত তাঁহার সংগ্রাম বাধে নাই। শত্রুকে তিনি প্রেমিকের মতোই ভালোবাসিতেন; কোনো কিছুই তাঁহার আকর্ষণ নিবারণ করিতে পারে নাই। তাঁহার শত্রুও অবশেষে তাঁহাকে ভালোবাসিয়াছেন। 'মায়া' তাঁহার বাহুপাশে রামকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের ওষ্ঠাধর মিলিত হইয়াছে।

১ এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ইহার কাব্যিক এবং সাংগীতিক উপাদানগুলি বাংলার জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চিত সম্পদ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণবকবিদের গানগুলি যাত্রা প্রভৃতি লোকাভিনয়ের প্রচলিত রূপের মধ্য দিয়া তাঁহার মনে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই (৭-৮ পৃষ্ঠায়) দেখিয়াছি। কবীরের একটি দোঁহা তিনি প্রায়ই গাহিতেন। কিন্তু আধুনিক কবি ও সাংগীতিকদের বহু রচনাও তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল। ("রামকৃষ্ণ-কথামৃত"—দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন কবিদের মধ্যে তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামপ্রসাদ। 'মার' নিকট রামকৃষ্ণ তাঁহার রচিত গানগুলি গাহিতেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার বহু চমৎকার উপমা রামপ্রসাদের রচনা হইতেই সংগ্রহ করেন। (যথা, ঘুড়ির উপমাটি ; ইহা আমরা পরে উল্লেখ করিয়াছি।) মায়ের কয়েকটি বিশেষ রূপের বর্ণনাও তিনি রামপ্রসাদ হইতে গ্রহণ করেন। (যথা, মা যখন তাঁহার প্রিয় সন্তানকে বিভ্রান্ত করার জন্য, 'মায়া' ব্যবহার করেন, তখন তাঁহার চোখের কোণে দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠে।)

"কথামৃতে" আরো যে-সকল গীতি-কবির উল্লেখ আছে, তাঁহাদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের পণ্ডিত ও শাক্ত কবি কমলাকান্ত : ঐ সময়ের অন্য একজন শাক্ত কবি নরেশচন্দ্র ; ঐ যুগের বাংলার বৈষ্ণব কবি ও জনপ্রিয় গীতি রচয়িতা কুবীর ; অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবি, কেশব-শিষ্য প্রেমদাস (আসল নাম ত্রৈলক্য সান্ন্যাল, তিনি রামকৃষ্ণের টুকরা সাময়িক রচনা হইতে তাঁহার বহু কবিতার প্রেরণা পাইয়াছিলেন) ; এবং বিখ্যাত নাট্যকার ও রামকৃষ্ণের শিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ (তাঁহার 'চৈতন্য লীলা' এবং 'বুদ্ধ চরিত' প্রভৃতি নাটকের গানগুলি) প্রধান।

আরমিড রেনোর সন্ধান পাইয়াছেন[১]। যে-সির্সি[২] তাহার পাণিপ্রার্থীর জনতাকে মায়ামুগ্ধ করিয়াছে, সেই তাঁহার কাছে আরিয়াডনের রূপে ধরা দিল এবং আরিয়াডনে যেমন থেসিউসকে গোলকধাঁধার মধ্যে পথ দেখাইয়াছিলেন, তিনিও তেমনি তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। সর্বশক্তিশালিনী 'মায়া,' যিনি তাঁহার শিকারী পক্ষীর চোখ বাঁধিয়া রাখেন, তিনি রামকৃষ্ণের চোখ খুলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে নিজের হাত হইতে আকাশের বিস্তৃত সাম্রাজ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মাতৃস্বরূপিণী[৩] মায়া; তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য এবং দিব্য রূপের মধ্য দিয়া তাঁহার সন্তানগণের নিকট আত্ম-উন্মোচন করেন। তাঁহারা ভালোবাসা দিয়া, হৃদয়ের আগুন দিয়া, তিনি মানুষের অহমের আবরণটিকে এমনভাবে ঢালাই করেন যে, তাহা এমন একটি বস্তুতে পরিণত হয়, "যাহার দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু বিস্তার নাই",—একটি রেখা, একটি বিন্দু, যাহা এই সুনিপুণ পরিস্রুতকারিণীর যাদু করস্পর্শে বিগলিত হইয়া ব্রহ্মে লয় পায়।

১ আরমিড—রেনো। এখানে টরকোয়াটো টাসোর কবিতা 'জেরুজালেম লিবার্টা'র দুইটি চরিত্রের কথা বলা হইতেছে।

[টাসোর এই কাহিনী অবলম্বনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে খৃস্তফ গ্লুক একটি অপেরা রচনা করেন, যাহা বিখ্যাত হইয়া আছে। কাহিনীতে বলা হইয়াছে, একাদশ শতাব্দীতে ডামাস্কাসে আরমিডা নামে এক মায়াবিনী ছিল। রিনাল্ডো নামে এক দুঃসাহসী বীরের সহিত তাহার পরিচয় হয়। রিনাল্ডোর প্রচুর আত্মবিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, এই মায়াবিনীর জাদুশক্তি তাঁহাকে বশীভূত পরাভূত করিতে পারিবে না। কিন্তু আরমিডার জাদু ক্রমেই কাজ করিতে লাগিল। রিনাল্ডো বশীভূত হইলেন। আরমিডা রিনাল্ডোকে হত্যা করিতে চাহিল। কিন্তু হত্যা করিতে গিয়া আরমিডা পারিল না। উদ্যত ছুরিকা তাহার শিথিল কম্পিত হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। আরমিডা বুঝিল, সে রিনাল্ডোকে ভালোবাসিয়াছে। অতঃপর আরমিডা জাদু-বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিল।—অনুঃ]

২ সির্সি—পাশ্চাত্যদেশীয় একটি পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হইয়াছে, এয়েআ দ্বীপে এক মায়াবিনী জাদুকরী বাস করিত। গ্রীক বীর ইউলিসিস ভ্রমণকালে ঐ দ্বীপে উপস্থিত হন। ইউলিসিস ইউরিলকাসকে একদল লোক লইয়া ঐ দ্বীপের খোঁজ-খবর লইতে পাঠান। কিন্তু মায়াবিনী সির্সি ইউরিলকাসের সহচরগণকে সম্মোহিত করিয়া লুকাইয়া রাখে। অতঃপর ইউলিসিস সির্সিকে দমন করিয়া তাঁহার সাথীদের মুক্ত করেন। এই কাহিনীটি 'ওডিসি' কাব্য গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।—অনুঃ

৩ কিম্বা "জ্যেষ্ঠা সহোদরা"। অন্যত্র রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেনকে বলেন, "স্বর্গীয়া মা-ই তাঁহার সৃষ্টি-পরিকল্পনার অংশরূপে 'মায়া' সৃষ্টি করিয়াছেন"। বিশ্ব লইয়া মা ক্রীড়া করেন। বিশ্ব তাঁহার ক্রীড়নক মাত্র। "তিনি উড়ন্ত ঘুড়িকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল মায়ার সুতা দিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখেন।" (অক্টোবর, ১৮৮২)

সুতরাং সেই অঞ্জলি ও বারির জয় হউক! জয় হউক ঐ মুখমণ্ডল এবং অবগুণ্ঠনের। সমস্ত কিছুই ভগবান। সমস্ত কিছুর মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন। তিনি আলোকেও আছেন, ছায়াতেও আছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ "নীতিবাদীদের"[১] দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া হিউগো[২] লিখিয়াছিলেন যে, সূর্যই একমাত্র ভগবানের ছায়া[৩]। রামকৃষ্ণ হইলে বলিতেন, ছায়াও আলো।

সত্যকার ভারতীয় মনীষীদের মতোই, তিনি যাহা নিজের সমগ্র সত্তা দিয়া 'উপলব্ধি' করেন নাই, এমন কিছুই বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার সমস্ত চিন্তাই জীবনের রসে পুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মধ্যে যখনই কোনো চিন্তার 'সঞ্চার' হয়, তখনই তাহা তাঁহার সাধারণ সহজ দৈহিক দ্যোতনাটিকে পুনরায় লাভ করে। বিশ্বাস করা হইল বুকে গ্রহণ করা এবং গ্রহণ করিবার পর পরিবর্ধমান ফলকে বুকের মধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত করা।

রামকৃষ্ণ যখনই এইরূপ কোনো সত্যের নিবিড় স্পর্শ বারেকের জন্যও অনুভব করিয়াছেন, তখনই তাহা আর তাঁহার মধ্যে চিন্তাময় হইয়া থাকে নাই। তাহা চকিতে জীবনলাভ করিয়াছে এবং তাঁহার বিশ্বাসের মন্ত্রে উর্বর হইয়া তাঁহার 'উপলব্ধির' উদ্যানে পত্রে-পুষ্পে বিকশিত হইয়া ফলবতী হইয়া উঠিয়াছে। তখন সেগুলি আর কেবল ছিন্ন ভাবময় চিন্তা মাত্র নহে। তখন সেগুলি সুনির্দিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য, তখনি সেগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা হইয়াছে। তিনি যে 'দিব্য রক্তমাংস' আস্বাদ করিয়াছেন, তাহাই বিশ্বের উপাদান; সকল ধর্মে, সকল ভোজে, তিনি তাহারই আস্বাদ পাইতেন। তিনি 'প্রভুর নৈশ ভোজে'ও[৪] অমরতার আহার্য গ্রহণ করিবেন। তবে তাঁহার সহিত কেবল দ্বাদশ ধর্ম প্রচারকই থাকিবেন না, থাকিবেন অগণ্য বুভুক্ষু আত্মা—সমগ্র বিশ্ব।

* * * *

১৮৬৫ খৃস্টাব্দের শেষাশেষি তোতাপুরীর প্রস্থানের পর রামকৃষ্ণ ছয় মাসেরও অধিক কাল, যতোক্ষণ তাঁহার দৈহিক শক্তিতে সহিল, এই যাদু-শক্তিসম্পন্ন

১ ডেনিস সোরা কৃত "*Milton and Christian Materialism in England*" ৫২ পৃষ্ঠা।

২ হিউগো (১৮০২-১৮৮৫)—ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।—অনুঃ

৩ মিল্টনের: "Dark with excessive light thy skirts appear."

—*Paradise Lost*, III, 374

৪ সশিষ্য যিশু খৃস্টের শেষ নৈশ ভোজের কথা বলা হইতেছে।

অগ্নিমণ্ডলের মধ্যেই রহিলেন এবং পরস্পরের সহিত একাত্মবোধ করিলেন। যদি একথা বিশ্বাস করা যায়, রামকৃষ্ণ ছয় মাস কাল অংগ-সঞ্চালন-রহিত সমাধির মধ্যে কাটাইলেন। পুরাতন ফকিরদের বর্ণনা মনে পড়ে—আত্মা-পরিত্যক্ত দেহ শূন্য গৃহের মতো, সকল প্রকার ধ্বংসশক্তির আক্রমণ-স্থল। রামকৃষ্ণের একজন ভ্রাতুষ্পুত্র যদি রামকৃষ্ণের মালিকহীন পরিত্যক্ত দেহের রক্ষাণাবেক্ষণ না করিতেন, বা তাঁহার দৈহিক শক্তিগুলিকে সযত্নে জিয়াইয়া না রাখিতেন, তবে তিনি সম্ভবত বাঁচিতেন না[১]। "নিরাকারের" সহিত সমাধি-মিলনে আর অধিক কাল কাটানও ছিল অসম্ভব। তাহা ছাড়া ইহাই ছিল যৌগিক অবস্থার চূড়ান্ত কাল। ব্যাপারটি সম্ভবতঃ আমার ফরাসী পাঠকগণকে বিমূঢ়, না, বিরক্ত করিতেছে। কারণ তাঁহারা মাটিতে হাঁটিতেই অভ্যস্ত; তাঁহারা সুদীর্ঘ কাল এই আধ্যাত্মিক অগ্নিশিখার স্পর্শলাভ করেন নাই। 'তাই' তাঁহারা ক্ষণকাল ধৈর্য ধরুন। আমরা সিনাই শিখর[২] হইতে অবিলম্বেই—মানুষের মধ্যে অবতরণ করিব।

---

১ কথিত আছে, ঐ সময় একজন সন্ন্যাসী অকস্মাৎ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। রামকৃষ্ণ প্রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দেখিয়া তিনি রামকৃষ্ণের দেহে মুষ্ট্যাঘাত করিতে থাকেন এবং এইরূপে রামকৃষ্ণের পলায়মান জীবনকে ফিরাইয়া আনেন।

রামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য সারদানন্দ হিন্দু অধিবিদ্যায় (metaphysics) সুপণ্ডিত ছিলেন। অন্যান্য যাঁহারা সংসর্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা তিনি রামকৃষ্ণের মানসিক গঠন সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ভালো বুঝিতেন। তিনি রামকৃষ্ণের এই ছয়মাস কালব্যাপী নির্বিকল্প সমাধির বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন, রামকৃষ্ণের এই অচেতন অবস্থায় অহম্ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। কেবলমাত্র তাহা মাঝে মাঝে অতি সন্তর্পণে তাহার পূর্ণ উপলব্ধির উপর একটি আবরণের মতো ফিরিয়া আসিত। সারদানন্দের মতে, এই অর্ধ-চেতন অবস্থায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাত্মার নির্দেশ অনুভব করিতেন। (বিশ্বাত্মার নির্দেশ না বলিয়া ইহাকে আমরা জীবনী শক্তির অস্পষ্ট তাড়না ও নির্যাতনও বলিতে পারি।) এই নির্দেশ তাঁহাকে "ভাবমুখ" অবস্থায় থাকিতে বাধা করিত। ইহা যেন বলিত, অহমের পূর্ণ চেতনা হারাইও না; পরম পুরুষের সহিত আপনাকে একাত্ম করিও না। কিন্তু, অনুভব করো, বিশ্বাত্মা, যাঁহার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের অসংখ্য রূপ জন্মলাভ করিতেছে, তিনি তোমার মধ্যেই রহিয়াছেন; জীবনের প্রতি মুহূর্তে তুমি তাঁহাকে লক্ষ্য করো এবং বিশ্বের কল্যাণ করো।"

সুতরাং দীর্ঘকালীন সমাধি হইতে অবতরণের সময়েই রামকৃষ্ণ তাঁহার স্বর্গীয় আদর্শকে উপলব্ধি করেন। ইহা অকস্মাৎ একদিনে ঘটে নাই, ধীরে ধীরেই ঘটিয়াছিল। যাহাই হউক, ইহা ঘটিয়াছিল ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের প্রথমার্ধেই।

২ সিনাই শিখর—ওল্ড টেস্টামেণ্টে বর্ণিত কাহিনী হইতে জানা যায়, মিশর হইতে মুসা তাঁহার অনুচরদের উদ্ধার করিয়া আনিলে পর ভগবান ঐ পর্বতশিখরে তাঁহার এই নির্বাচিতদের জন্য কয়েকটি নীতি এবং নিয়ম ঘোষণা করেন।—অনুঃ।

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি, যেন বিধাতাপুরুষকে প্রলোভন দেখাইতেছিলেন এবং তিনি যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার। এইরূপ কোনো পরীক্ষার বশীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেন। এমন কি, এইরূপ পরীক্ষায় বসিতে তিনি বিবেকানন্দকেও নিষেধ করেন। তিনি বলেন, অপরের সেবার জন্য যে-সকল মহাপুরুষকে নিজেদের ব্যক্তিগত আনন্দ বিসর্জন দিতে হইবে, এইরূপ আনন্দ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ[১]। তরুণ নরেন (বিবেকানন্দ) যখন রামকৃষ্ণকে 'নির্বিকল্প সমাধির' তোরণদ্বার—যে ভয়ংকর তোরণদ্বার অব্যয়ের মহাসমুদ্রের পথে গিয়া মিশিয়াছে—তাঁহার নিকট উন্মুক্ত করিতে বলিলেন, তখন রামকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অথচ রামকৃষ্ণ কখনো কাহারও উপর রুষ্ট হন নাই।

---

১ সাধারণ মানুষকে তবে ইহা হইতে বিরত থাকিবার জন্য তিনি কীরূপেই না বলিয়াছেন! জীবনে যাহাদের গতিপথ সংকীর্ণ, তাহারা ইহার প্লাবনে ভাসিয়া যাইবে। ফলে, তাহার এবং সমাজের হইবে ক্ষতি। তিনি তাঁহার সাংকো পাঙ্গা তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয় এবং ধনী পৃষ্ঠপোষক মথুরবাবুকে, এই সমাধির নিষিদ্ধ ফল-ভক্ষণের লোভ হইতে কীরূপে নিরাময় করিয়াছিলেন, তাহা সার্ভেন্টিসের উপযুক্ত রসিকতা এবং সুবুদ্ধিরই পরিচয় দেয়।

হৃদয় ছিলেন অতি মাটির মানুষ; পিতৃব্যের একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু মাটির দোষটুকুও তাঁহার ছিল। তিনি তাঁহার পিতৃব্যের খ্যাতির অংশ গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ভাবিলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সুযোগ-সুবিধা হইতে তিনি উপকৃত হইতে পারেন। রামকৃষ্ণের নির্লিপ্ত নিঃস্বার্থপরতা সহিবার মতো ধৈর্য তাঁহার ছিল না। সমাধির পরীক্ষা হইতে বিরত থাকিবার জন্য তাঁহার পিতৃব্যের সকল পরামর্শই ব্যর্থ হইল। হৃদয় সমাধির পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন, ফলে তাঁহার মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বিকৃতি ঘটিল। তিনি মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে মৃগীরোগে পাইল। রামকৃষ্ণ বলিলেন, "মা গো! তুমি এই নির্বোধের বুদ্ধি লোপ করিয়া দাও!" হৃদয় মাটিতে লুটাইয়া পিতৃব্যকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। "কাকা! এ তুমি কি করিলে? আমি এই অবিস্মরণীয় পুলক আর কখনো অনুভব করিব না।" রামকৃষ্ণ দুষ্টামি করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিবার সুযোগ দিয়া ঘরে একাকী ফেলিয়া বাহিরে গেলেন। হৃদয় অবিলম্বে ভয়াবহ দৃশ্য সকল দেখিতে লাগিলেন। ফলে, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ইহার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি পিতৃব্যকে অনুরোধ করিলেন।

ধনী মথুরবাবুরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে। রামকৃষ্ণ যাহাতে তাঁহার সমাধি ঘটাইয়া দেন, সেজন্য রামকৃষ্ণকে তিনি অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ অনেক দিন অস্বীকার করিবার পর অবশেষে বলিলেন: "বেশ, তাই হোক।" বহু আকাংখিত সমাধির ফলে মথুরবাবু তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি ও উৎসাহ হারাইলেন। কিন্তু মথুরবাবু এতোখানি চান নাই। তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। সুতরাং চিরদিনের জন্য তাঁহার উপর হইতে সমাধি সরাইয়া লইবার জন্য তিনি রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন। রামকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন।

তাহা ছাড়া, তাঁহার এই প্রিয় শিষ্যের মনে কোনোরূপ আঘাত না দিতে তিনি সর্বদা সযত্নে চেষ্টাও করিয়াছেন। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন: "তোমার লজ্জা করে না? আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি বটবৃক্ষের মতো, তোমার ছায়ায় তুমি হাজার হাজার লোককে আশ্রয় দিবে। তা না হইয়া তুমি স্বার্থপরের মতো নিজের মংগল খুঁজিতেছ? না, তাহা করিও না। এ সকল ক্ষুদ্র জিনিস তোমার জন্য নহে। এই একদর্শী আদর্শ লইয়া তুমি সন্তুষ্ট হইবে কেমন করিয়া? তোমাকে সর্বদর্শী হইতে হইবে। তুমি সর্বপ্রকার উপায়ে ভগবানকে উপভোগ করো।" (এই কথার দ্বারা তিনি বলিতে চাহিলেন যে, চিন্তার এবং কর্মের, উভয়ের মধ্যেই তুমি ভগবৎ আনন্দ লাভ করো। অর্থাৎ নিজেকে পরম সেবায় নিয়োগ করো।)

ত্যাগের কঠিন কর্তব্য গ্রহণে ভগ্ন-হৃদয় এবং হতমান নরেন কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি স্বীকার করেন, তাঁহার গুরুদেবের এই কঠোরতা অন্যায় ছিল না। তিনি দীনতা, সহিষ্ণুতা এবং দুঃসাহসের সংগে মানবের সেবায় জীবন নিয়োগ করিলেও, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভগবানের সহিত এই ভয়ংকর মিলনের জন্য একটি তীব্র আকাংখা অনুভব করেন।

কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা কাহিনীর যে অংশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি,, সেখানে রামকৃষ্ণের শিক্ষানবীশীর যুগ শেষ হয় নাই। এবং সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণত আমরা অধিকাংশ লোকেই, অন্ততপক্ষে আংশিকভাবে, সকলের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা হইতেই আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু রামকৃষ্ণ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য সকল দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সকল মূল্য তিনি নিজেই দিয়াছিলেন।

তিনি যে সমাধি অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সেজন্য তাঁহার ক্ষমতা বা নিজের ইচ্ছাই দায়ী নহে। তিনি বলেন, দৈহিক দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়া 'মা'-ই তাঁহাকে মানুষের প্রতি তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিলেন। আমাশয়ের কঠিন অক্রেমণের ফলেই তিনি ধীরে ধীরে নির্বিকল্প সমাধি হইতে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। এই আমাশয় দীর্ঘ ছয় মাস কাল ছিল।

দৈহিক এবং মানসিক উভয়বিধ যন্ত্রণাই তাঁহাকে মৃত্তিকার সহিত আবদ্ধ করিল। একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে চিনিতেন[১], তিনি বলেন, ব্রহ্মের সহিত

১ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "*The Face of Silence*" দ্রষ্টব্য।

মিলনের এই সমাধি হইতে প্রত্যাবর্তনের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যে রামকৃষ্ণ একবার দুইজনকে সক্রোধে কলহ করিতে দেখিয়া যন্ত্রণায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত বেদনার সহিত, সে-বেদনা যতোই অপবিত্র, প্রাণঘাতী হোক না কেন—নিজেকে একাত্মিত বোধ করেন। এইরূপে তাঁহার সমস্ত হৃদয় বেদনায় বিক্ষত হইয়া গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও তিনি জানিতেন, মানুষের যতো মতভেদ, যতো সংগ্রাম, সমস্তই সেই মায়ের নিকট হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। এই "সর্বশক্তিমান বিভেদ"-ই বিধাতার প্রকাশ। সুতরাং মানুষের সকল অবস্থায়, সকল রূপে তাহা যতোই বিরুদ্ধতাপূর্ণ হোক, তাহাকে ভগবানকে ভালোবাসিতেই হইবে। সর্বোপরি এই সকল মানুষের সকল ভগবানকে ভালোবাসিয়াই তাঁহাকে ভালোবাসিতে হইবে তাঁহার ভগবানকে।

অর্থাৎ, তিনি বুঝিলেন, সকল ধর্মই বিভিন্ন পথে ঐ একই ভগবানে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত পথই তিনি পরিক্রম করিয়া দেখিতে চাহিলেন। কারণ, তাঁহার নিকট বুঝিবার অর্থই হইল অস্তিত্ব এবং কর্ম।

৫

মানুষে প্রত্যাবর্তন

রামকৃষ্ণের পরিক্রমণের প্রথম পথ ছিল ইসলাম-ধর্মের পথ। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের শেষে সম্পূর্ণ সুস্থ না হইতেই তিনি এই পথে যাত্রা সুরু করেন।

মন্দির হইতেই তিনি বহু মুসলমান ফকিরকে দেখিতে পাইতেন। রাসমণি ছিলেন "নয়া বড়লোক" এবং জাতিতেও নিম্নশ্রেণীর। তাই তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তাঁহার মহানুভবতা ও উদারতার ফলে সকল ধর্মের অতিথিদের থাকার জন্য এখানে কয়েকটি কামরা ছাড়িয়া দেন। এখানেই রামকৃষ্ণ একজন মুসলমান সাধুকে উপাসনারত অবস্থায় দেখেন। সাধুর নাম ছিল গোবিন্দ রায়। গোবিন্দ রায়ের ভূলুণ্ঠিত দেহের বহিরবয়ব দেখিয়া রামকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, এই ব্যক্তি ইসলামের মধ্য দিয়া ভগবানকে "উপলব্ধি" করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য গোবিন্দ রায়কে অনুরোধ করিলেন এবং এইরূপে কয়েকদিন কালীর পূজারী রামকৃষ্ণ আপনার দেবদেবীকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া রহিলেন, তাঁহাদের পূজা করিলেন না, এমন কি তাঁহাদের চিন্তাও করিলেন না। রামকৃষ্ণ মন্দিরের উঠানের বাহিরে বাস করিতে লাগিলেন, বারে বারে আল্লার নাম উচ্চারণ করিলেন, মুসলমানের পোষাক পরিধান করিলেন এবং—কী মহাপাপ ভাবুন!—সকল প্রকার নিষিদ্ধ খাদ্য, এমন কি গোমাংস ভক্ষণ করিতেও প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার মনিব এবং পৃষ্ঠপোষক মথুরবাবু তাঁহাকে এই বীভৎস কাজ হইতে বিরত হইতে বলিলেন। তিনি রামকৃষ্ণকে অশুদ্ধির হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একজন মুসলমানের নির্দেশক্রমে গোপনে ব্রাহ্মণ পাচককে দিয়া আহারও প্রস্তুত করাইলেন। অন্য একটি চিন্তার জগতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করায় সেই চিন্তাগুলিও তাঁহার নিকট দৃশ্যের মধ্য দিয়া বাস্তব হইয়া উঠিল। এই আবেগময় শিল্পী যতোবারই এইভাবে আধ্যাত্মিক যাত্রা করিয়াছেন, ততোবারই এরূপ ঘটিয়াছে। এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর, শ্মশ্রুশুভ্র। (সম্ভবত রামকৃষ্ণ মহম্মদেরই কল্পরূপ দেখিয়াছিলেন।) তিনি রামকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া তাঁহার মধ্যে মিশিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণ মুসলমানদের ভগবান, "সগুণ ব্রহ্মকে" উপলব্ধি করিলেন। অতঃপর তিনি ঐ অবস্থা হইতেই নির্গুণ "ব্রহ্মের" মধ্যে গিয়া উপনীত হইলেন। এইরূপে ইসলামের নদীস্রোত তাঁহাকে

পুনরায় মহাসমুদ্রের মধ্যেই উপস্থিত করিল। ইসলাম সাধনার ফলেও রামকৃষ্ণ অব্যয়ের মধ্যে মহাসমাধি লাভ করায়, তাঁহার এই অভিজ্ঞতাকে তাঁহার ব্যাখ্যাতা-গণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, ভারতের দুই দল বিরুদ্ধবাদী সন্তান হিন্দু এবং মুসলমান কেবলমাত্র নিরাকার ব্রহ্ম বা অদ্বৈতের মধ্য দিয়াই মিলিত হইতে পারেন। ভারতবর্ষে এই ব্যাখ্যার প্রচুর গুরুত্ব আছে। তাই রামকৃষ্ণ মিশন হিমালয়ের উপত্যকায় ভগবানের যে পূজাবেদী রচনা করিয়াছেন, তাহা সকল ধর্মের বিপুল সমন্বয় মন্দির হিসাবেই রচিত হইয়াছে।

সাত বৎসর পরে অনুরূপ একটি অভিজ্ঞতার ফলে রামকৃষ্ণ খৃস্টান ধর্মকেও উপলব্ধি করেন। (বিষয়টিকে স্পষ্ট করিবার জন্যই আমি সমস্ত ঘটনাগুলিকে একত্রে সন্নিবিষ্ট করিতেছি।) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণেশ্বরের আশেপাশে এক বাগানবাড়ির মালিক কোনো মল্লিকবাবু রামকৃষ্ণকে বাইবেল পড়িয়া শোনান। খৃস্টের সহিত রামকৃষ্ণের এই সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটিল। অচিরেই কিন্তু খ্রীস্ট নামটি তাঁহার নিকট রক্তমাংসের মানুষ হইয়া উঠিলেন। যীশুর জীবন গোপনে তাঁহাকে ব্যাপ্ত করিল। একদা রামকৃষ্ণ তাঁহার ধনী হিন্দু বন্ধুর বাড়ীতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার চোখে পড়িল, দেওয়ালে টাঙানো ম্যাডোনা এবং যীশুর ছবি। মুহূর্তে ছবির মূর্তিগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিলেন। তারপর রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক গঠনভঙ্গী অনুসারে যাহা আশা করা যাইতেছিল, হুবহু তাহাই ঘটিল। দিব্য মূর্তি দুইটি তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত মিশিয়া গেলেন। ইসলামের ক্ষেত্রে যেরূপটি হইয়াছিল, এবারে কিন্তু অন্তর্মুখী প্লাবনটি তাহা অপেক্ষাও প্রবলতর হইল। ইহা সকল বাধা অন্তরায় ভঙ্গ করিয়া রামকৃষ্ণের সমগ্র আত্মাকে ব্যাপ্ত করিল। হিন্দু ভাবগুলি ভাসিয়া গেল। রামকৃষ্ণ আতংকগ্রস্ত হইয়া সেই স্রোতাবর্তের মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন: "মা! তুমি কী করিতেছ? আমাকে সাহায্য করো!" কিন্তু আর্তনাদ ব্যর্থ হইল। এই বিপুল স্রোতোচ্ছ্বাস যাহা কিছু সম্মুখে পাইল ভাসাইয়া দিল। হিন্দু আত্মার পরিবর্তন ঘটিল। তাঁহার মধ্যে খৃস্ট ভিন্ন অন্য কিছুর স্থান রহিল না। কয়েকদিন ধরিয়া তিনি কেবল খৃস্টান প্রেমে বিভোর রহিলেন, মন্দিরে যাওয়ার কথা ভাবিলেন না। তারপর দক্ষিণেশ্বরে একদিন অপরাহ্নে রামকৃষ্ণ দেখিলেন একটি সুদর্শন পুরুষ তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিতেছেন। সুন্দর আয়ত তাঁহার অক্ষি, গৌরবর্ণ, প্রশান্ত মূর্তি। যদিও রামকৃষ্ণ জানিতেন না এই ব্যক্তি কে, তথাপি তিনি এই আগন্তুকের যাদু-শক্তির

বশীভূত হইলেন। সুদর্শন পুরুষ রামকৃষ্ণের নিকটবর্তী হইলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার আত্মার গভীরে কাহার সুমধুর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল শুনিলেন:

"ঐ ত্যাখো, খৃষ্ট আসিতেছেন—যিনি বিশ্বের মুক্তির জন্য আপনার অন্তরের রক্ত দান করিয়াছেন, যিনি মানুষকে ভালোবাসিয়া অপরিসীম বেদনা সহিয়াছেন। তিনিই, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী—যিনি ভগবানের সহিত চিরকালের জন্য একান্বিত হইয়াছেন। তিনিই প্রেমের অবতার, যীশু…।"

ভারতের দ্রষ্টা, মায়ের সন্তান, রামকৃষ্ণকে 'মানব-পুত্র' যীশু আলিংগন করিলেন এবং তাঁহার মধ্যেই মিশিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণ সমাধিতে আত্মহারা হইলেন। পুনরায় ব্রহ্মের সহিত তিনি একাত্ম অনুভব করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি মাটির জগতে ফিরিয়া আসিলেন। এবং সেই সময় হইতেই তিনি ভগবানের অবতার যীশু খৃষ্টের দেবত্বে বিশ্বাসী হইলেন। কিন্তু যীশুই তাঁহার নিকট ভগবানের একমাত্র অবতার হইয়া উঠিলেন না। বুদ্ধ এবং কৃষ্ণও অন্যান্য অবতার রহিলেন।[১]

আমি কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, একথা শুনিয়া আপোষবিরোধী খৃস্টানরা—যাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র ভগবানের একমাত্র অবতারকেই সযত্নে হৃদয়ে লালন করিয়া থাকেন, ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিতেছেন:

"কিন্তু আমাদের ভগবানের তিনি কী বোঝেন? ইহা তাঁহার দৃষ্টিভ্রম, অলীক কল্পনা মাত্র। ইহা তাঁহার পক্ষে এতো সহজ হইয়াছিল, কারণ, তিনি এই মতবাদ সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না।"

সত্যই এই মতবাদ সম্পর্কে তিনি অতি সামান্যই জানিতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ভক্ত। ভক্তের বিশ্বাস প্রেমের মধ্য দিয়াই জন্মে। জ্ঞানীরা বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাস করেন। জ্ঞানীদের জ্ঞানের অধিকার বলিয়াও তিনি কখনো নিজেকে দাবী করেন নাই। কিন্তু উক্ত উভয় ধনু যখন সুনিপুণভাবে ধৃত হয়, তখন তাহাদের শর কি একই সন্ধানে গিয়া পৌঁছে না? যাঁহারা যাত্রার শেষ অবধি পৌঁছেন,

১ অবশ্য অবতার কথাটি তিনি অতি সহজে ব্যবহার করিতেন না। তীর্থংকরগণ (জৈন ধর্মের প্রবর্তকগণ) এবং শিখধর্মের দশজন গুরু,—ইঁহাদের প্রতি তাঁহার প্রভূত শ্রদ্ধা থাকিলেও, ইঁহাদিগকে তিনি অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার নিজের কক্ষে যে সকল দেবতার পট ছিল, সেগুলির মধ্যে একটি ছিল খৃস্টের। সকালে ও সন্ধ্যায় এই পটের সম্মুখে তিনি দীপ জ্বালিতেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় খৃস্টানরা রামকৃষ্ণকে যীশুর প্রত্যক্ষ প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং তাঁহাকে দেখিয়া ভাবাকুল হন।

তাঁহাদের কাছে অই উভয় পথই কি একত্রে মিলিত হয় না? রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য সুপণ্ডিত বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেন :

"তিনি ছিলেন বাহিরে ভক্ত এবং অন্তরে জ্ঞানী।"[১]

তীব্রতা এমন একটি অবস্থায় আসিয়া পৌছে, যখন প্রেমের বোধশক্তি জন্মে এবং বুদ্ধি হৃদয়কে পশ্চাতে সরিয়া যাইতে বাধ্য করে। তাহা ছাড়া, খৃস্টানরা প্রেমের শক্তিকেও অস্বীকার করিতে পারেন না। এই প্রেমই গ্যালিলির দরিদ্র ধীবর-দিগকেও তাঁহাদের ভগবানের নির্বাচিত শিষ্যে এবং খৃস্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠাতায় পরিণত করিয়াছিল। অনুতপ্ত অপরাধী[২] ছাড়া আর কাহার কাছেই বা খ্রীস্ট প্রথমে দেখা দিয়াছিলেন। অনুতপ্ত অপরাধীর একমাত্র যোগ্যতা ছিল তাহার প্রেমের অশ্রু। অশ্রু দিয়াই সে খৃস্টের পদধৌত করিয়া মাথার কেশ দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়াছিল। সর্বশেষে, লোকে কতো বই পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যার উপর তাহার জ্ঞান নির্ভর করে না। প্রাচীন ভারতের মতোই রামকৃষ্ণের ভারতেও মৌখিক ভাবেই সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলিত। তাই রামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনে বহু সহস্র সাধু, তীর্থযাত্রী, পণ্ডিত, এবং ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সর্ববিধ জ্ঞান-দর্শন লইয়া ব্যস্ত বহু মানুষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বকীয় চিন্তার দ্বারা গভীরতর হইয়া উঠিয়াছিল।[৩]

১ এবং বিবেকানন্দ বলেন : "কিন্তু আমার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত।" আর একজন ভারতীয় ধর্ম-চিন্তায় মহামনীষী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক সকলের অপেক্ষা ইউরোপীয় চিন্তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হন। তিনি ভক্ত রামকৃষ্ণের পদতলে ভক্তিসহকারে আসিয়া বসিতেন। কারণ, ভক্ত রামকৃষ্ণের হৃদয়ই লিপিবদ্ধ জ্ঞানের তলায় কী গোপন আছে, তাহার সন্ধান দিয়াছিল।

২ মেরী ম্যাগদালেন। [খৃস্টের জীবনীগুলিতে কয়েকজন মেরী আছেন। তাঁহাদের হইতে ইঁহাকে পৃথক করার জন্য ইঁহার বাসস্থান বা জন্মস্থান 'ম্যাগদালেন' অনুসারে ইঁহাকে মেরী ম্যাগদালেন বলা হয়। অনুঃ]

৩ রামকৃষ্ণ সংস্কৃতে কথা বলিতে না পারিলেও সংস্কৃত বুঝিতেন। তিনি বলেন : "আমার বাল্য-কালে আমার একজন পড়শীর বাড়ীতে সাধুরা কি পড়িতেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম ; অবশ্য, প্রত্যেকটি শব্দের পৃথক অর্থ আমি বুঝিতাম না। কোনো পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় কিছু বলিলে আমি তাহার কথা বুঝিতে পারিতাম। তবে আমি নিজে সংস্কৃত বলিতে পারিতাম না।"—'কথামৃত' ২য় খণ্ড, ১৭।

একদিন রামকৃষ্ণের জনৈক শিষ্য রামকৃষ্ণের জ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করেন: 'আপনি এতো জ্ঞানের অধিকারী কিরূপে হইলেন?' রামকৃষ্ণ জবাবে বলেন, 'আমি পড়ি নাই, পণ্ডিত ব্যক্তিদের মুখে শুনিয়াছি। আমি তাঁহাদের জ্ঞান হইতেই মাল্য রচনা করিয়া গলায় পরিয়াছি এবং মার চরণে এই মাল্য অর্ঘ্যরূপে ডালি দিয়াছি।'

তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতে পারিতেন:

"আমি হিন্দু, মুসলমান এবং খৃস্টান, সকল ধর্মই অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছি; হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পন্থাও অনুসরণ করিয়াছি।…দেখিয়াছি, বিভিন্ন পথে হইলেও সকলেই সেই একমাত্র ভগবানের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিয়াছেন। প্রত্যেক বিশ্বাসকে পরীক্ষা করিয়া, প্রত্যেক পথকে পরিক্রম করিয়া তোমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য দেখা উচিত।[১] আমি যখন যেদিকে তাকাই, তখনই দেখি মানুষে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব এবং আরো অন্যান্য ধর্মের নামে পরস্পরের সহিত কলহ করিতেছে। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে, যিনিই কৃষ্ণ, তিনি আদ্যা শক্তি, যীশু, আল্লা, রাম আরো হাজারো নাম—সব। একই পুষ্করিণীর ঘাট। কোনোটিতে হিন্দুরা কলসী ভরিতেছে, তখন বলে 'জল', কোনোটিতে মুসলমান তাহাদের ভিস্তি ভরিতেছে, তাহারা বলে 'পানি'; আবার কোনোটিতে বা খৃস্টানরা পাত্র ভরিতেছে, তাহারা বলে 'ওঅটার'। কিন্তু আমরা কি ভাবিতেও পারি যে, এই বারি 'জল' নহে, কেবল 'পানি', কিম্বা কেবল 'ওঅটার'? কী হাস্যকর ব্যাপার! বস্তু একই, কেবল বিভিন্ন নামে এবং প্রত্যেকেই সেই একই বস্তুরই সন্ধান করিতেছে; জলবায়ু, মানসিক অবস্থা এবং নাম ভিন্ন আর কিছুর কোনো পার্থক্য নাই।[২] প্রত্যেকেই তাঁহার নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করুন। সত্যই যদি কেহ অকপট ও আন্তরিকভাবে ভগবানকে জানিতে চান, তবে তিনি শান্তিতে তাহা করুন। তিনি নিশ্চয়ই ভগবানের সাক্ষাৎ পাইবেন।"

* * * *

১৮৬৭ খৃস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারে আর কোনো উল্লেখযোগ্য রত্ন সংগৃহীত হয় নাই।[৩] কিন্তু যে সকল রত্ন তিনি আহরণ করিয়া-

১ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, ১৭

২ ঐ গ্রন্থ ২য় ভাগ, ২৪৮

৩ খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছাড়া। সময়ের দিক হইতে ঐ অভিজ্ঞতা ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে ঘটিলেও আমি যথাস্থানে পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছি।

ছিলেন, সেগুলি তিনি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছিলেন বাহিরের জগতের সহিত সেগুলির যোগাযোগ ঘটাইলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি অন্যান্য মানবিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইল এবং তিনি নিজে যে রত্ন লাভ করিয়াছেন, তাহার অতুলনীয়তা সম্বন্ধে তিনি আরো পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিলেন। এই কয়েক বৎসরেই মানুষের কাছে তাঁহার মহৎ আদর্শ এবং বর্তমান কর্তব্য কি, সে সম্পর্কে তিনি সচেতন হইলেন।

আসিসির সেই দরিদ্র ক্ষুদ্র মানুষটির[১] সহিত শারীরিক, মানসিক, বহুদিক হইতেই রামকৃষ্ণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সমস্ত প্রাণীর প্রতিই তাঁহারও এমন একটি সুকোমল ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। এই স্নেহ ও সহানুভূতির রসধারায় তিনি এমন নিবিড়ভাবে পুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি অপর সবাইকে নিজের আনন্দের অংশ দিতে না পারিলে তৃপ্তি বোধ করিতেন না। গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইবার পূর্বক্ষণে, মা তাঁহাকে নিকটে আকর্ষণ করিতেন, তিনি মার কাছে প্রার্থনা করিতেন, "মাগো! আমাকে তুমি মানুষের মধ্যে থাকিতে দাও! আমাকে নীরস সন্ন্যাসীতে পরিণত করিও না!"

এবং মাও তাঁহাকে 'মহাসমুদ্রের' গভীর স্রোতাবর্ত হইতে জীবনের বেলাভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিতেন (অর্ধ-চেতন অবস্থায় রামকৃষ্ণ মায়ের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পান):

"মানুষের ভালোবাসার জন্যে তুমি আপেক্ষিক চেতনার দ্বারদেশে অবস্থান করো!"[২]

এইরূপেই রামকৃষ্ণ মানুষের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রথম অভিজ্ঞতারূপে মানবিকতার উষ্ণ ও সহজ স্রোতেই অবগাহন করিলেন। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের মে মাসে কঠিন রোগ-ভোগের পর তখনও তিনি দুর্বল ছিলেন, ছয় সাত মাসের

১ ফ্রান্সিস অব আসিসি—ইতালীর আসিসিতে ১১৮২ খৃস্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১২২৬ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অন্যতম সেণ্ট; তিনি খৃস্টধর্মের অন্যতম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।—অনু:

২ এই সময় হইতেই রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ অবস্থায় মৃত্যুর সকল প্রলোভনকে প্রতিরোধ করিয়া বিপদ এড়াইয়া চলিয়াছিলেন। বিপজ্জনক অনেক আবেশ-অনুভূতিকেও তিনি এড়াইয়া চলিতেন—যেমন ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে গয়াতীর্থ দর্শন। কারণ, এমন সকল স্মৃতিতে পূর্ণ এই গয়াতীর্থ যে, রামকৃষ্ণ জানিতেন, সেখান হইতে তিনি কখনো তাঁহার আত্মাকে সাধারণ জীবনের স্তরে ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন না। অপরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে থাকিতে তিনি অন্তর হইতে আদেশ পাইয়াছিলেন।

বিশ্রামের জন্য রামকৃষ্ণ তাঁহার নিজ গ্রাম কামারপুকুরে আট বৎসরব্যাপী অনুপস্থিতির পর ফিরিয়া আসিলেন।[১] রামকৃষ্ণ তাঁহার স্বগ্রামের সহজ মানুষের ঘনিষ্ঠ সহৃদয়তার মধ্যে আপনাকে শিশুর মতো সহজ আনন্দে ছাড়িয়া দিলেন। যে-গদাধরের বিস্ময়কর খ্যাতি গ্রামবাসীদের কাছেও পৌছিয়াছিল এবং যে গদাধর সম্পর্কে তাঁহাদের উদ্বেগ-আশঙ্কার অন্ত ছিল না, সেই ক্ষুদ্র শীর্ণদেহ গদাধরকে দেখিয়া তাঁহাদের উল্লাসের আর সীমা রহিল না। শহরের পণ্ডিত এবং মন্দিরের ভক্তদের অপেক্ষা এই সরল গ্রামবাসী কৃষকরাই রামকৃষ্ণের বিশ্বাস ও আদর্শের অধিক সমীপবর্তী ছিলেন।

এইবার গ্রামে অবস্থানকালেই তিনি তাঁহার কিশোরী স্ত্রীকে বুঝিতে শিখেন। সারদা দেবীর বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বৎসর। তিনি তাঁহার পিতামাতার সহিত বাস করিতেন, স্বামী আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া এবার তিনি কামারপুকুরে আসিলেন। বয়সের তুলনায় তাঁহার কিশোর নিষ্কলংক হৃদয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতি বেশীই হইয়াছিল। তাই স্বামীর আদর্শের কথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব ঘটিল না। স্বামীর জীবনে কী নিষ্কাম প্রীতি ও নিঃস্বার্থ স্নেহের অংশ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও অবিলম্বে তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি রামকৃষ্ণকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

১ ভৈরবী ব্রাহ্মণীও রামকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে যে ঘটনা ঘটে, তাহা ভৈরবী ব্রাহ্মণীর পক্ষে গৌরবাত্মক নয়। এই বিখ্যাত মহিলার চরিত্র তাঁহার বুদ্ধির অনুরূপ ছিল না এবং তাঁহার ধ্যান-সাধনাও তাঁহাকে সাধারণ মানুষের দুর্বলতার উর্ধ্বে তুলিতে পারে নাই। রামকৃষ্ণকে দীক্ষা দিয়া এবং তাঁহাকে আত্মোপলব্ধি করিতে শিখাইয়া ভৈরবী তাঁহার উপর মালিকানা স্বত্ব দাবী করিয়া বসিলেন। তোতাপুরীর প্রাধান্যের ফলে তিনি ইতিপূর্বেই বহু যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। এইবার রামকৃষ্ণকে তাঁহার জন্মস্থানের আবহাওয়ায় ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া আর সহিতে পারিলেন না। কারণ, এখানে রামকৃষ্ণের উপর তাঁহার পুরাতন বন্ধুবান্ধবদেরই পরিপূর্ণ দাবী জন্মিল। অথচ রামকৃষ্ণের এই পুরাতন বন্ধু-বান্ধবরা ছিলেন ভৈরবীর নিকট আগন্তুক মাত্র। তাহা ছাড়া, রামকৃষ্ণের তরুণী পত্নী অত্যন্ত অমায়িক এবং বিনয়ী হইলেও তাঁহার উপস্থিতিটা ভৈরবীর পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। এবং তাহা তিনি গোপন করিতেও পারিলেন না। ফলে, কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাইলেন, যাহার ফলে রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক মধুরতর হইল না। অবশেষে ভৈরবী তাঁহার দুর্বলতা স্বীকার করিলেন এবং রামকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া চিরদিনের জন্য বিদায় লইলেন। কাশীতে রামকৃষ্ণের সহিত পুনরায় ভৈরবীর সাক্ষাৎ ঘটে। ইহাই তাঁহাদের শেষ সাক্ষাৎ। সেস্থান হইতে তিনি বাকী দিনগুলি সত্যের কঠোর সন্ধানে অতিবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে অবসর গ্রহণ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সারদামণির স্বার্থকে এইভাবে বলি দেওয়ার জন্য রামকৃষ্ণকে অনেক সময় নিন্দিত—অমার্জিত ভাবে নিন্দিত হইতে হইয়াছে।[১] কিন্তু এইরূপ কোনো ক্ষতির সামান্য মাত্র পরিচয়ও সারদামণি নিজে কখনো দেন নাই। যাঁহারাই তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার জীবনের সৌম্য প্রশান্ত কিরণ-ধারায় স্নাত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা ছাড়া, আর একটি তথ্যও ছিল, যাহা বিবেকানন্দ ভিন্ন আর কেহই প্রকাশ করেন নাই। রামকৃষ্ণ তাঁহার এই দায়িত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন এবং এ-জন্য তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, যদি তিনি (তাঁহার স্ত্রী) ইচ্ছা করেন, তবে তিনি নিজে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আদর্শকেও ত্যাগ করিতে পারেন। রামকৃষ্ণ সারদামণিকে বলেন: "আমি সমস্ত নারীকে মার মতোই দেখিতে শিখিয়াছি। তাই, কেবলমাত্র তাহা ছাড়া অন্যরূপে তোমাকে আমি ভাবিতে পারি না। কিন্তু যদি তুমি আমাকে এই (মায়ার) জগতে টানিয়া আনিতে চাও, তবে আমি তোমার বিবাহিত স্বামী হিসাবে তোমার সেবায় আসিতে পারি।"[২]

ইহা এমন কিছু যাহা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। হিন্দু-ঐতিহ্য বলে, বস্তুত ধর্ম-জীবন মানুষকে সকল কর্তব্যের বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়। কিন্তু রামকৃষ্ণের মধ্যে মানবিকতাটা অধিক পরিমাণেই ছিল; তাই তাঁহার উপর তাঁহার স্ত্রীর যে অনস্বীকার্য দাবী থাকিতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের সকল দাবী বা অধিকার ত্যাগ করিবার মতো উদারতা ও মহত্ত্ব সারদামণির ছিল। তাই সারদামণি স্বামীকে তাঁহার স্বকীয় আদর্শের অনুসরণ করিতেই উৎসাহ দিলেন। এবং বিবেকানন্দ ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্ত্রীর অনুমতি লইয়াই রামকৃষ্ণ তাঁহার স্বকীয় কাম্য জীবনের পথে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সারদামণির সারল্যে ও ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া রামকৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহারা যে-কয়েক মাস একত্র ছিলেন, তখন রামকৃষ্ণ সারদামণিকে ধর্মপরায়ণা স্ত্রী এবং নিপুণা পরিচালিকা করিয়া তুলিবার জন্য ধৈর্য সহকারে শিক্ষা দিতে থাকেন। রামকৃষ্ণের ব্যবহারিক সাধারণ বুদ্ধি প্রচুর পরিমাণে ছিল, যাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক স্বভাবের এতো বিরুদ্ধ

---

১ বিশেষ করিয়া এ-বিষয়ে কয়েকজন ব্রাহ্ম সমাজী উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা কেশবচন্দ্র সেনের অপেক্ষা রামকৃষ্ণের প্রাধান্য দেখিয়া বিরক্ত হন এবং রামকৃষ্ণের ব্যাপক জনপ্রিয়তাকে সহ্য করিতে পারেন নাই।

২ বিবেকানন্দ রচিত "*My Master*" গ্রন্থ। বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯২৩ খৃস্টাব্দ, ১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে ভারী অদ্ভুত লাগে। গ্রাম্য বালক রামকৃষ্ণ এমন পাঠশালায় মানুষ হইয়াছিলেন, যেখানে গার্হস্থ্য বা গ্রাম্য জীবনের খুঁটিনাটি সকল শিক্ষাই তিনি পাইয়াছিলেন। যাঁহারাই তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারাই বলিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণের গৃহসজ্জায় যে শৃংখলা এবং পরিচ্ছন্নতা ছিল, তাহা তাঁহার, এমন কি, ধনী শিক্ষিত শিষ্যদিগকেও শিক্ষা দিতে পারিত।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের শেষে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন এবং পর বৎসর মন্দিরের মালিক ও মনিব মথুরবাবুর সহিত কয়েকবার তীর্থযাত্রা করিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক মাসে তিনি শিবনগর কাশীধাম, গঙ্গা যমুনার সংগমস্থলে প্রয়াগতীর্থ এবং রূপকথা ও শ্রেষ্ঠ সংগীতের আবেগস্থল শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিকেতন বৃন্দাবন দর্শন করেন। তাঁহার ভাবাকুলতা এবং উন্মাদনা সহজেই কল্পনা করা যায়। যখন রামকৃষ্ণ কাশীধামের নিকট গঙ্গা পার হইলেন, তখন কাশীধামকে তাঁহার পাষাণ নির্মিত নগরী বলিয়া মনে হইল না, মনে হইল, ইহা যেন স্বর্গীয় এক জেরুজালেম, "আধ্যাত্মিকতার এক ঘনীভূত স্তূপ।" শ্মশানঘাটে তিনি ধবলদেহী পিংগলজটাজুটধারী শিবমূর্তি দর্শন করিলেন, দর্শন করিলেন চিতা-শ্রেণীর উপর আনতা কালিকা মূর্তি—যিনি জগৎকে মোক্ষদান করিতেছেন। ধূসর গোধূলি নামিলে রামকৃষ্ণ দেখিলেন, যমুনার তীরে তীরে রাখালরা গৃহপালিত পশুর পাল লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। রামকৃষ্ণ ভাবাবেগে আকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন: "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কোথায়?"

এই তীর্থযাত্রাকালে রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন যদি না পাইয়া থাকেন, তবে তিনি এমন কিছুর দর্শন পাইলেন, যাহা আমাদের পশ্চিমদেশবাসীদের কাছে গভীরতর এক অর্থ বহিয়া আনিবে। তিনি সন্ধান পাইলেন মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার। এই সময় পর্যন্ত রামকৃষ্ণ তাঁহার মন্দিরের স্বর্ণ আয়তনের মধ্যে সমাধি তন্দ্রায় বিভোর থাকিতেন এবং কালিকা নিজ আলুলায়িত কেশ-পাশের আবরণে তাঁহার দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া রাখিতেছিলেন বিশ্বের দুঃখ-বেদনাকে। রামকৃষ্ণ তাঁহার ধনী সংগীর সহিত দেওঘরে আসিয়া সেখানের সাঁওতাল অধিবাসীদের দেখিলেন, প্রায় উলংগ, শীর্ণ, ক্ষুধায় মুমূর্ষু। ঐ সময় দেশময় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। রামকৃষ্ণ এই হতভাগ্যদিগকে খাদ্য দিবার জন্য মথুরবাবুকে বলিলেন। মথুরবাবু প্রতিবাদ জানাইলেন, বলিলেন, পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্যকে দূর করিবার মত অর্থ তাঁহার নাই। মথুরবাবুর কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ সেই সর্বহারাদের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন, তিনি সেখান হইতে এক

পা-ও নড়িবেন না, সেইখানেই থাকিয়া তিনি-ও এই দুর্ভাগাদের দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবেন। সুতরাং, অবশেষে ক্রেসাস[১] হার মানিলেন এবং দরিদ্র পুরোহিতের অভিলাসই পূর্ণ হইল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে দেশভ্রমণের পথে মথুরবাবু রামকৃষ্ণ তাঁহার নিজের জমিদারীতে আনিলেন এবং আনিয়া ভুল করিলেন। তখন খাজনা আদায়ের সময়। পর পর দুই বৎসর অজন্মা গিয়াছে। প্রজারা অভাব অনটনের চূড়ান্ত অবস্থায় আসিয়াছে। রামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে বাকী খাজনা ছাড়িয়া দিতে এবং সাহায্য করিতে বলিলেন। মথুরবাবু প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণও ছাড়িবার পাত্র নহেন।

তিনি ধনী জমিদারকে বলিলেন, "তুমি তো মায়ের নায়েব মাত্র। উহারা মায়ের প্রজা। মায়ের অর্থ তোমাকে ব্যয় করিতেই হইবে। উহারা যখন কষ্ট পাইতেছে, তখন তুমি কেমন করিয়া উহাদিগকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিতে পার? তোমাকে সাহায্য করিতেই হইবে।"

মথুরবাবুকে হার মানিতেই হইল।

এই ব্যাপারগুলিকে বিন্দুমাত্র ভুলিলে চলিবে না। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান কর্তা এবং রামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান মতপ্রচারক ও ব্যক্তিগত শিষ্য স্বামী শিবানন্দ নিম্নলিখিত ঘটনাটি বর্ণনা করেন। ঘটনাটি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ ভাবাবেশকালে বলেন:

"জীবই শিব।[২] সুতরাং তাহাদিগকে দয়া দেখাইবার দুঃসাহস কে করিতে পারে! দয়া নয়, সেবা, সেবা—মানুষকে ভগবানের চোখে দেখিতে হইবে।"

বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই গভীর অর্থপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া শিবানন্দকে বলিলেন:

১ ক্রেসাস—খৃস্টপূর্ব ৫৬০ খৃস্টাব্দে লিডিয়ার রাজা ছিলেন। তিনি দার্শনিক সলনকে তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সলন জানান, ক্রেসাসের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। ইহাতে ক্রেসাস ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হন। অতঃপর তিনি পারস্যের রাজা সাইরাসের হস্তে বন্দী হন। ফলে ক্রেসাসের মৃত্যুদণ্ড হয়। বহ্নিমান চিতায় তাঁহাকে পুড়াইয়া মারার ব্যবস্থা হয়। চিতায় শুইয়া ক্রেসাসের সলনের উক্তি মনে পড়ে। তখন তিনি সলনের নাম উচ্চারণ করেন। বন্দীর মুখে সলনের নাম শুনিয়া সাইরাস ক্রেসাসকে মুক্তি দেন। সাইরাস সলনের ভক্ত ছিলেন।—অনুঃ

২ একবার তিনি বলিয়াছিলেন:

"সকল মানুষের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন, কিন্তু সকল মানুষ ভগবানের মধ্যে নাই। তাই তাহাদের এই কষ্ট।" (Sri Ramkrishna's Teachings, I, 297).

"আজ আমি এক মহাবাণী শ্রবণ করিলাম। এই জীবন্ত সত্য আমি সমস্ত পৃথিবীময় ঘোষণা করিব।"

স্বামী শিবানন্দ বলেন :

"তখন হইতে আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন যে অসংখ্য সেবার কাজ করিয়াছে, সেগুলির আরম্ভ কবে ও কোথায়, কেহ তাহা প্রশ্ন করিলে আমি বলিব, ঐদিন, ঐখানে।"[১]

ইহার কাছাকাছি সময়েই বন্ধু-বান্ধব কয়েকজনের মৃত্যু ঘটায় রামকৃষ্ণের উপর 'বেদনা' তাহার নিষ্ঠুর অথচ সস্নেহ স্পর্শ রাখিয়া গেল। ভগবৎ-চিন্তায় মগ্ন রামকৃষ্ণ মৃত্যুকে অপরিসীম আনন্দের মধ্যে প্রত্যাবর্তন বলিয়া ভাবিলেও, তাঁহার তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র ও সহচরের মৃত্যুতে তিনি নিজেকে প্রফুল্ল করার চেষ্টায় হাসিতে থাকেন এবং তাহার মুক্তির জন্য গান গাহিতে থাকেন।[২] কিন্তু মৃত্যুর পরদিন অকস্মাৎ তিনি ভয়ংকর বেদনা বোধ করিলেন। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। ভালোরূপে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইতেও পারিলেন না, ভাবিলেন, "হে ভগবান! হে ভগবান! আমিই যদি এইরূপ বেদনা অনুভব করি, তবে যাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়তমদের, পুত্রকন্যাদের হারাইয়াছেন, তাঁহারা কী কষ্টই না ভোগ করেন!"

শোক-তপ্তদিগকে বিশ্বাসের শান্তি-প্রলেপ প্রদানের জন্য মা রামকৃষ্ণের উপর শক্তি ও কর্তব্য আরোপ করিলেন।

স্বামী শিবানন্দ আমাকে লিখিয়াছেন, পার্থিব সকল বন্ধন ছিন্ন করিলেও এই মানুষটি নরনারীর দুঃখ-বেদনার পার্থিব কাহিনীগুলিকে কীরূপ মনোযোগের সহিত শুনিতেন এবং তাহাদের বোঝা লাঘব করিবার জন্য কি পরিমাণ চেষ্টা করিতেন, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে কল্পনা করা যায় না। আমরা ইহার সংখ্যাতীত

১ রামকৃষ্ণ নিজেই অতি বিনয়াবনত সেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও অস্পৃশ্যদের গৃহে গিয়া তাহা পরিষ্কার করিবার অনুমতি ভিক্ষা করেন। এইরূপ প্রস্তাব ধর্মভীরু হিন্দুদের নিকট অত্যন্ত গর্হিত। ইহা তাহাকে এবং তাহার অতিথিকে বিপন্ন করিতে পারে, এই আশংকায় অস্পৃশ্য ব্যক্তিটি এই প্রস্তাবে রাজী হইল না। তাই রামকৃষ্ণ এক গভীর রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রামগ্ন, তাহার গৃহে আসিলেন এবং নিজের দীর্ঘ কেশরাশি দিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণ মার্জনা করিলেন। প্রার্থনা করিলেন : "মা গো! আমাকে তুমি অস্পৃশ্যের সেবায় নিয়োগ করো।" (বিবেকানন্দ প্রণীত "*My Master*" গ্রন্থ হইতে)

২ ঐ সময় রামকৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন, একটি তরবারি কোষমুক্ত হইল।

দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। এখনো অনেক গৃহস্থ বাঁচিয়া আছেন, যাঁহারা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-বেদনা লাঘব করার জন্য রামকৃষ্ণকে আজো ভগবানের নামে আশীর্বাদ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একদিন মণি মল্লিক নামে একজন বিখ্যাত বৃদ্ধ ধনী পুত্র হারাইয়া ভগ্ন হৃদয়ে রামকৃষ্ণের নিকট আসিলেন। এই বৃদ্ধের বেদনাকে রামকৃষ্ণ এমন গভীরভাবে গ্রহণ করিলেন যে, মনে হইল তিনিই যেন পুত্রহারা পিতা। তাঁহার বেদনা মল্লিকবাবুর বেদনাকেও ছাড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণ কাটিল। অকস্মাৎ রামকৃষ্ণ গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু তিনি কোনো শোক-গীতি বা কোনো শব-সৎকারের সংগীত গাহিলেন না, গাহিলেন মৃত্যুর সহিত আত্মার সংগ্রামের শৌর্যপূর্ণ গান :

"জীব সাজ সমরে।
রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে॥" ইত্যাদি[১]

উপসংহারে শিবানন্দ বলেন, "এইভাবে উক্ত পিতার দুঃখও যে কীরূপ প্রশমিত হইয়াছিল, তাহাও আমি ভুলি নাই। এই গান শুনিয়া তাঁহার সাহস ফিরিয়া আসিল, বেদনা বিদূরিত হইল, তিনি শান্তি ফিরিয়া পাইলেন।"

এই দৃশ্যটি বর্ণনা করিবার সময় আমার কেবলই বীঠোফেনের কথা মনে পড়িতেছে। তিনিও এক সন্তানহারা জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নীরবে তাঁহার পিয়ানোতে আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং সংগীতের সুরে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

এই স্নেহ-মমতা-প্রেম ও দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে যে মানবতা বাঁচিয়া আছে, তাহার সহিত দিব্য যোগাযোগ ঘটাইতে হইলে একটি আবেগময় অথচ শুদ্ধ দেবভাবাপন্ন

---

১ আমি এই গানের অংশটি "রামকৃষ্ণ-কথামৃত" হইতে দিতেছি। এইরূপ ঘটনা যে মাত্র একবার ঘটিয়াছে তাহা নহে। রামকৃষ্ণ একাধিক শোকসন্তপ্ত মানুষকে একাধিক গান গাহিয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন। কিন্তু উহার সৌন্দর্যের দিকটা সব গানেই একরূপ ছিল।

Life of Sri Ramkrishna গ্রন্থে (৬৫২-৬৫৩ পৃঃ) কিন্তু ঈষৎ অন্যরূপ একটি বিবরণ রহিয়াছে। রামকৃষ্ণ ভগ্ন হৃদয় পিতার কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন; কিন্তু কিছুই কহিলেন না, কেবল অর্ধ-চেতন একটি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল, তিনি সজীব দেহভংগীর সহিত গানটি শুরু করিলেন। তারপর পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পুত্রহারা পিতাকে কথায় সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার স্বভাবসুলভ নৈপুণ্যের সহিত স্বামী শিবানন্দ যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ একটি দৃশ্যের বর্ণনা করেন। কিন্তু ধনগোপাল স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখেন নাই। কিন্তু শিবানন্দ এবং "রামকৃষ্ণ কথামৃত'-প্রণেতা তাঁহারা উভয়েই স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

প্রতীকের প্রয়োজন ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণের স্ত্রী যখন সর্বপ্রথম[১] দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, রামকৃষ্ণের সকরুণ স্নেহ সেই অবগুণ্ঠনের মধ্যে দেবমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করিল। রামকৃষ্ণের স্নেহের মধ্যে দৈহিক কামনার বিন্দুমাত্রও আবিলতা ছিল না। ইহার সহিত মিশ্রিত ছিল ধর্মভীরু অপরূপ এক শ্রদ্ধা। এই দেবী দর্শনের কথা রামকৃষ্ণ সকলের নিকট ঘোষণা করিলেন। মে মাসের এক সন্ধ্যায় পূজার আয়োজন সমাপন হইলে রামকৃষ্ণ কালীর আসনে সারদা দেবীকে বসাইলেন এবং পুরোহিত রূপে তিনি নারীত্বের অর্চনা ষোড়শী পূজার[২] অনুষ্ঠানে সম্পন্ন করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা উভয়েই এক অর্ধচেতন বা অতিচেতন সমাধি-দশায় ছিলেন। রামকৃষ্ণের যখন সংজ্ঞা হইল, তখন তিনি তাঁহার সহচরীকে 'মা' বলিয়া আহ্বান করিলেন। রামকৃষ্ণের চোখে সারদামণি নিষ্কলঙ্ক মানবতার জীবন্ত প্রতীক হইয়া আবার জন্মলাভ করিলেন।[৩]

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভগবান সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের ধারণাটি ক্রমান্বয়ে পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রথমে ভগবান সম্পর্কে তাঁহার ধারণাটি এই ছিল যে, ভগবান সর্বব্যাপী, সমস্ত কিছুই ভগবানের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ভগবান সেই সূর্যের মতো—যে সূর্য সমস্ত বিশ্বকে নিজের মধ্যে গ্রহণ ও মিশ্রণ করিতেছে। কিন্তু এই ধারণা হইতে পারে তাঁহার মধ্যে যে প্রাণোচ্ছ অনুভূতি জন্মিল, তাহা হইল সমস্ত

১ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত সারদামণি রামকৃষ্ণের নিকট একবার থাকেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৮৭৫-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি আবার একবার থাকেন। এবং অবশেষে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যখন আসেন, তখন হইতে রামকৃষ্ণের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণের নিকটেই ছিলেন। প্রথম বারে যখন তিনি স্বামীর নিকট আসেন, তখন তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ ছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি সকল শ্রান্তি ও বিপদকে তুচ্ছ করিয়া স্বামীর নিকট আসেন। রামকৃষ্ণের জীবনে ইহা অতীব হৃদয়স্পর্শী একটি ঘটনা। (সারদামণির এই মনোজ্ঞ অভিযান এবং পথিমধ্যে দস্যুদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পর্কে—এই খণ্ডের শেষে ১ নম্বর নোট দেখুন)। প্রথমবার আসিয়া সারদামণি যে কুড়ি মাস ছিলেন, তাহাও কম অসাধারণ নহে। তাঁহারা উভয়ে ছিলেন অতীন্দ্রিয় সাধক, উভয়েই সমানভাবে অনাবিল শুভ্র, উভয়েই সমানভাবে অনুভূতিশীল, আবেগময়।

২ একটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান।

৩ এই অদ্ভুত দৃশ্যের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বিষ্ণু-মন্দিরের পুরোহিত।

রামকৃষ্ণের এই নারী পূজার ধর্ম কেবল তাঁহার স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি অত্যন্ত অধঃপতিতা পতিতাদের মধ্যেও 'মাকে' দেখিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ বলেন, "আমি এই মানুষটিকে ঐ সকল স্ত্রীলোকের সম্মুখে ভক্তি ভরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, তিনি অশ্রুপ্লুত হইয়া ঐ সকল স্ত্রীলোকের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতেছেন, "মা, একরূপে তুমি পথে দাঁড়াইয়া আছ, অন্যরূপে তুমি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া আছ। মা, আমি তোমাকে প্রণাম করি"। (*"My Master"* গ্রন্থ হইতে)

কিছুই ভগবান; সমস্ত কিছুই এক একটি ক্ষুদ্র সূর্য; এই সব কিছুর মধ্যেই তিনি রহিয়াছেন এবং কাজ করিতেছেন। ইহা সত্য যে, এই দুইটির মধ্যে একই ভাব রহিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দিয়াছে। ফলে, কেবল সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন নহে, সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ পর্যন্ত দুইটি যোগসূত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাকে সংযুক্ত করিয়াছে। এইরূপে মানুষ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

১৮৮৪ খৃস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে রামকৃষ্ণ তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে বলেন: "আমার মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। অনেক দিন পূর্বে বৈষ্ণবচরণ আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি যখন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে পাইব, তখনই আমার জ্ঞানের পূর্ণতা হইবে। বর্তমান সময়ে আমি দেখিতেছি, ভগবান কখনো সাধু, কখনো ভণ্ড, কখনো বা অপরাধী, —বিভিন্ন আকারে সঞ্চরণ করিতেছেন। তাই আমি বলি: 'সাধুর মধ্যে নারায়ণ, অপরাধী উচ্ছৃংখলের মধ্যে নারায়ণ।"

*

পাঠকগণ যাহাতে কাহিনীর সূত্রই হারাইয়া না ফেলেন, তাই আমি আবার একবার রামকৃষ্ণের জীবনের ভবিষ্যৎ সংকেত দিলাম। তাহা ছাড়া, ইহার ফলে আপাতদৃষ্টিতে মাঝে মাঝে এই নদীরস্রোত অসংখ্য নালা নর্দমায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে বা কখনো পশ্চাৎ-মুখী হইতেছে এইরূপ মনে হইলেও, ইহার গতির প্রচুর বক্রতা সত্ত্বেও, প্রকৃত পক্ষে ইহা যে আমাদিগকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে, তাহাও তাঁহারা পূর্ব হইতে জানিতে পারিবেন।

আমি পুনরায় ১৮৭৪ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের কাহিনীর সূত্রটি গ্রহণ করিতেছি। ঐ সময় তিনি তাঁহার ধর্মসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মণ্ডলটি সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের কথায়, আহরণ করিয়াছেন জ্ঞান-বৃক্ষের তিনটি ফল—করুণা, ভক্তি, ত্যাগ।[১]

ঐ সময় বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটায় তাঁহাদের জ্ঞানের স্বল্পতা এবং ভারতীয় আত্মার কী বিরাট বুভুক্ষু শূন্যতা তাঁহার নিজের

১ জ্ঞানের তিনটি মহান ফল হইল—করুণা, ভক্তি ও ত্যাগ। (সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার, ৫ই আগস্ট, ১৮৮২ খৃস্টাব্দ)। *Life of Sri Ramkrishna, P. 526.*

সম্মুখে রহিয়াছে, তাহার সম্পর্কে তিনি সচেতন হইলেন। সাধু-সন্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধনী, দরিদ্র, তীর্থযাত্রী এবং বিজ্ঞান ও সমাজের স্তম্ভস্বরূপ যাঁহারা, তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে রামকৃষ্ণ যাহা পাইলেন, তাহাই তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিলেন এবং এই সঞ্চয়ের কাজ তিনি বারেকের জন্যও থামাইলেন না। ব্যক্তিগত দম্ভ তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাভাববিরুদ্ধ ছিল। অন্যপক্ষে, তিনি জানিতেন, "প্রত্যেক জ্ঞানসন্ধানীই" কোনো-না-কোনো বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন এবং সে জ্ঞানটুকু তিনি পান নাই। তাই তিনি তাঁহাদের উচ্ছিষ্টের উঞ্ছবৃত্তি করিতে সর্বদাই উদগ্রীব থাকিতেন। তাই ঐ সকল জ্ঞানের অধিকারীদিগকে, তাঁহারা তাঁহাকে কী ভাবে অভ্যর্থনা করিবেন, কখনো ভাবিতেন না।[১]

ঐ সময়ে গত ষাট বৎসর ধরিয়া ভারতের আত্মায় যে আলোড়ন চলিতেছিল, এখানে ইউরোপীয় পাঠকদের জন্য তাহার সংক্ষিপ্ত একটি কাহিনী দেওয়া প্রয়োজন। যদিও এই বৎসর (১৯২৮ খৃস্টাব্দে) ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইতেছে, তথাপি সেই মহাজাগরণ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই শোনা যায় নাই।

১ আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রামকৃষ্ণ প্রতিদিন তাঁহার মন্দিরেই সকল প্রকারের এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাইতেন। রামকৃষ্ণ ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন এবং তিনি ভগবানের অবতার, একথা যেদিন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঘোষণা করিলেন, তাহার পর হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য দূর ও নিকটবর্তী সকল স্থান হইতেই লোক আসিতে লাগিল। এইরূপে ১৮৬৮ হইতে ১৮৭১ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণের সহিত বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটে। যথা, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং পরবর্তী কালে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিম্বা পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী ও পদ্মলোচনের মতো শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিত। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে তাঁহার সহিত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এবং দয়ানন্দের সাক্ষাৎ হয়। দয়ানন্দ আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সম্পর্কে আমি পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত রামকৃষ্ণ কবে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ভুলভাবে স্থির করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। হিন্দু পণ্ডিতরাও এ বিষয়ে একমত নহেন। তবে ১৮৬৯-১৮৭০ খৃস্টাব্দে এইরূপ আনুমানিক একটি তারিখ দেন। রামকৃষ্ণের ভারপ্রাপ্ত জীবনীকার 'ম' (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) বলেন, ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে, রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, ঐ সাক্ষাৎকারের সময়ে তিনি কেশবচন্দ্র সেনকে সাময়িকভাবে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা-মঞ্চে দেখেন। কেশবচন্দ্র কেবল ১৮৬২ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত উক্ত সমাজের আচার্য ছিলেন। তাহা ছাড়া, ১৮৬৪-৬৫ খৃস্টাব্দে এই সাক্ষাতের জন্য কেন রামকৃষ্ণ যাইতে পারেন না, তাহারও পক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে। যাহাই হোক, ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় কেশবচন্দ্র নূতন ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তা ছিলেন। এবং ঐ বৎসর হইতেই কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণের সম্পর্ক নিবিড় হইয়া উঠে।

যিনি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি উদ্‌যাপন করিতে আজ ভারতের সহিত সমগ্র মানব জাতিরও যোগদান করা উচিত ছিল। কারণ, তিনিই বহু বাধা সত্ত্বেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে, বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে, সমভাবে সহযোগিতা শুরু করার ইচ্ছা এবং সাহস করিয়াছিলেন। বহু পদদলিত দেশে বিশ্বাস কথাটি যেরূপ বিকৃত হইয়াছে, বিশ্বাস বলিতে তিনি সেরূপ অন্ধ গ্রহণকে বোঝেন নাই; বুঝিয়াছিলেন প্রাণবান চক্ষুষ্মান স্বত-উৎসারিত এক অনুভব-শক্তিকে।

আমি রামমোহন রায়ের কথা বলিতেছি[১]।

১ সাধারণ একটি ধারণা লাভের জন্য আমি লণ্ডন ষ্টুডেণ্ট খৃশ্চান মুভমেণ্ট কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত কে, টি, পাল রচিত '*British Connection with India*' (১৯২৭) গ্রন্থখানি পড়িতে বলি। এই পুস্তকে ভারতে গত শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনের এবং হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত আন্দোলনের ক্রমবিকাশটি নির্ভুল হস্তে অংকিত হইয়াছে। কে, টি, পাল একজন ভারতীয় খৃস্টান, এবং গান্ধীজীর বন্ধু। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের চিন্তাতেই তাঁহার মন সমভাবে পুষ্ট হইয়াছে। তাহা যেমন প্রশস্ত, তেমনি পক্ষপাতদোষশূন্য। মিঃ পাল তাঁহার এই গ্রন্থে ইউরোপীয় তথ্য-বিজ্ঞান এবং তাহার ঐতিহাসিক ত্রুটিহীনতার সংগে আত্মার বিজ্ঞান, যাহা বিশেষভাবেই ভারতীয়, তাহার সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন।

(প্যারী হইতে প্রকাশিত 'ইউরোপ' পত্রিকার ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৮ সংখ্যায় আমি 'আন্দোলনে ভারত' শীর্ষক প্রবন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করিয়াছি, তাহা অতুলনীয়।)

ভারতীয় পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর ১৮২৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় স্বামী নিখিলানন্দ সুন্দর একটি আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে তিনি ১৯১৮ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্ম-সমাজ শত-বার্ষিকীতে ধর্ম-সম্মিলনে পাঠ করেন। প্রবন্ধটির নাম—*The Progress of Religion during the last Hundred Years* (in India).

৬

ঐক্য-সাধক

রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন ও দয়ানন্দ

রামমোহন রায় ছিলেন এক অসামান্য পুরুষ। তিনি এই প্রাচীন মহাদেশের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। বাস্তবিক পক্ষে, তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম বিশ্বপ্রেমিক মানুষ। ষাট বৎসরেরও অনধিক দীর্ঘ জীবনে (১৭৭৪—১৮৩৩) তিনি প্রাচীন এশিয়ার বিপুল পৌরাণিক শাস্ত্র হইতে আধুনিক ইউরোপের বৈজ্ঞানিক যুক্তি পর্যন্ত সকল প্রকার চিন্তাকেই আত্মসাৎ করেন।[১]

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম।[২] উত্তরাধিকার সূত্রে এই পরিবারের উপাধি ছিল রায়। রামমোহন মোগল সম্রাটের দরবারে লালিত-পালিত হন। সেখানে সরকারী ভাষা ছিল পারসিক। শিশুকালে তিনি পাটনার বিদ্যালয়গুলিতে আরবিক ভাষা শিখেন এবং ঐ ভাষাতে এরিস্টটল ও ইউক্লিডের

১ রামমোহনের জীবনী এবং রচনাবলীর জন্য ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের নটেসন কর্তৃক প্রকাশিত Raja Ram Mohun Roy, His Writings and Speeches দ্রষ্টব্য। অনির্দিষ্ট কালক্রম এই গ্রন্থের সমস্ত আকর্ষণ নষ্ট করিয়াছে। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে কলিকাতার 'দি মডার্ণ রিভিউ'র অফিস হইতে প্রকাশিত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রচিত সুন্দর পুস্তিকা, Ram Mohun and Modern India-ও দ্রষ্টব্য। এই রচনাগুলি অংশত মিস্ সোফিয়া ডবসন কলেট রচিত জীবনীর উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত। মিস্ কলেটের সহিত রামমোহনের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল।

কলিকাতার 'দি মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় ১৯২৮ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত এন্, সি, গাঙ্গুলি রচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশও এই প্রসংগে অতুলনীয়।

বোম্বাই-এর রাজকোটের ওরিয়েণ্টাল ক্রাইস্ট হাউস হইতে ১৯২৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত মণিলাল সি, পারেখ রচিত Rajarshi Ram Mohun Roy এবং 'দি মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার ১৯২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিত Ram Mohun Roy, the Devotee দ্রষ্টব্য।

রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত উপাসনা মন্দির ব্রাহ্ম-সমাজ সম্পর্কে ১৯১১ খৃস্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত History of the Brahma Samaj দুই খণ্ড দেখুন।

২ রামমোহন রায়ের পরিবারের আদিম বাসস্থান মুর্শিদাবাদ। তাঁহার জন্ম হয় নিম্ন বংগের বর্ধমান শহরে।

রচনা পাঠ করেন। এইরূপে বংশগতভাবে ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ হইয়াও[১] তিনি ঐস্লামিক সংস্কৃতিতে পুষ্ট হন। চৌদ্দ হইতে ষোলো বৎসর বয়সের মধ্যে কাশীতে সংস্কৃত পড়িতে শুরু করার আগে পর্যন্ত তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের সন্ধান পান নাই। হিন্দু জীবনীকাররা বলেন, ইহা ছিল রামমোহনের দ্বিতীয় জন্ম। কিন্তু একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য রামমোহনের যে বেদান্ত পাঠের প্রয়োজন ছিল না, এ-কথা স্পষ্টই বোঝা যায়। ইসলামের সহিত সংস্পর্শে আসায় শৈশবেই একেশ্বরবাদ তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। সুফীবাদের অক্ষয় প্রভাবকে হিন্দু অতীন্দ্রিয়-বাদের বিজ্ঞান ও অনুশীলন অধিক দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়াছিল মাত্র। সুফীবাদের জ্বলন্ত নিঃশ্বাস শৈশব হইতেই রামমোহনের দেহের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।[২]

তাঁহার সংগ্রামশীল প্রতিভার সতেজ উৎসাহ তরুণ যুদ্ধঘোটকের মতোই ছিল দুর্বার। ইহা তাঁহাকে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সমস্ত জীবন-ব্যাপী তিক্ত সংগ্রামে নিযুক্ত করিয়াছিল। রামমোহন পারসিক ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের মুখপত্রে আরবিক ভাষায় তিনি গোঁড়া হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন। চার বৎসর ধরিয়া রামমোহন ভারতের নানা স্থানে এবং তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হন না, ধর্মোন্মাদ লামাদের হাতে মৃত্যুর বিপদকে-ও তুচ্ছ করেন। তাঁহার বয়স যখন বিশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা

১ রামমোহনের পিতৃকুল বৈষ্ণব ছিলেন।

২ রামমোহনের স্বভাবের অনুভব-শক্তি এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের দিকটি বিশেষভাবে পাশ্চাত্য দেশে স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে নাই। স্বজাতির আত্মঘাতী কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে সমাজ-সংস্কারক যোদ্ধা এবং অক্লান্ত যুক্তিবাদী বলিয়া তিনি যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, এই দুইটি দিক তাহার নিকট ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার অতীন্দ্রিয় প্রতিভার দিকটি ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী পুনরায় পুরোভাগে আনিয়াছেন। ভক্তির গভীরতা এবং বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করিয়া না হইলে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির এই স্বাতন্ত্র্যও কখনো এমন মূল্যবান হইতে পারিত না। মনে হয়, শৈশবকাল হইতেই তিনি যৌগিক ধ্যান, এবং এমন কি, তান্ত্রিক-সাধনারও অনুশীলন করিতেন। অবশ্য তান্ত্রিক সাধনার কথা তিনি পরে অস্বীকার করিয়াছেন। ধ্যানের সময় রামমোহন মনে মনে একাদিক্রমে কয়েকদিন যতোক্ষণ না পরমাত্মা তাহার অস্তিত্ব প্রকট করিতেন, ততোক্ষণ ভগবানের নাম বা গুণকীর্তন করিতেন। ঐ সময় তিনি ব্রহ্মচর্য এবং মৌন-ব্রত অবলম্বন করিয়া সুফীবাদের অতীন্দ্রিয় সাধনা চালাইতেন। বাংলার ভক্তি সাধনার অপেক্ষা সুফীবাদ তাঁহার নিকট অধিক তৃপ্তিদায়ক ছিল। বাংলার ভক্তি-সাধনা তাঁহার দাম্ভিক প্রকৃতির কাছে স্তাকামি বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু তাঁহার সুদৃঢ় শক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি কখনো নিষ্ক্রিয় ছিল না। সকল সময়েই তাঁহার অনুভূতিকে তাহা নিয়ন্ত্রিত করিত।

তাঁহার দুরন্ত পুত্রকে ডাকিয়া পাঠান। ফলে রামমোহন গৃহে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাকে গৃহে রাখিবার বৃথা চেষ্টায় তাঁহার বিবাহ দেওয়া দেওয়া হইল; কিন্তু রামমোহনের ন্যায় বিহংগকে বন্দী করিয়া রাখার মতো কোন খাঁচাই যথেষ্ট ছিল না।

রামমোহনের বয়স যখন চল্লিশ, তখন তিনি ইংরেজি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেই সংগে হিব্রু, গ্রীক এবং লাতিন। ইউরোপীয়দের সহিত তাঁহার পরিচয়ও ঘটিল। এইরূপে তিনি তাঁহাদের আইন-কানুন এবং শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কেও শিক্ষা লাভ করিলেন। ফলে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ তিনি তাঁহাদের সমর্থক হইয়া উঠিলেন, এবং স্বজাতির উচ্চতর স্বার্থের জন্য তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন হইয়া তাঁহাদের মিত্রতা অর্জন করিলেন। ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করার সংগ্রামে সফল হইতে হইলে ইউরোপের উপর নির্ভর করিয়াই যে কেবল তাহা সম্ভব, রামমোহন তাহা বুঝিয়াছিলেন। পুনরায় রামমোহন সতীদাহের বর্বর প্রথার উপর যুক্তিতর্কের তীব্র আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন।[১] ইহার ফলে প্রতিবাদের যে ঝটিকাবর্তের সৃষ্টি হইল, তাহার পরিণতি স্বরূপ ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইতে হইল। এমন কি, কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মা এবং স্ত্রীরা-ও তাঁহার সহিত বাস করিতে রাজী হইলেন না। এই সময় দুই একজন স্কটিশ বন্ধু ছাড়া সকল আত্মীয়-স্বজনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং এইরূপে দুঃসাহস ও বহু দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া রামমোহনের দশ-বারো বৎসর অতিবাহিত হইল। সরকারী চাকরীতে তিনি ট্যাক্স্-আদায়কারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে ধীরে ধীরে উন্নিত হইয়া তিনি একটি সমগ্র জেলার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইলেন।

পিতার মৃত্যুর পর রামমোহনের সহিত তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের পুনরায় মিলন ঘটিল। রামমোহন প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিলেন। রামমোহন কলিকাতায় একটি প্রাসাদ এবং কয়েকটি সুরম্য উদ্যানেরও অধিকারী হইলেন। ঐ প্রাসাদে তিনি রাজাধিরাজের

---

১ কথিত আছে, রামমোহন ১৮১১ খৃস্টাব্দে তাঁহার এক তরুণী শ্যালিকার সতী-দাহে উপস্থিত ছিলেন। মেয়েটির অতি আকুতি-কাকুতি এই দাহের বর্বরতাকে আরো বাড়াইয়া দেয়। এই ঘটনা রামমোহনকে এমন কাতর ও অভিভূত করিয়া ফেলে যে, উক্ত মহাপাপের হাত হইতে সমগ্র দেশকে রক্ষা না করা পর্যন্ত তিনি কোনোমতোই শান্তি পান না।

ন্যায় থাকিয়া পূর্বদেশীয় রীতিতে নৃত্য-গীতশিল্পীদের সহযোগে অতিথি-অভ্যাগত-দিগকে বিপুল সমাদরে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটি প্রতিচিত্র বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই প্রতিচিত্রে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার আলোহিত আয়ত দুটি চক্ষু; মুখখানি অপূর্ব একটি সুপুরুষ সৌন্দর্যে এবং মাধুর্যে মণ্ডিত। মাথায় মুকুটের মতন জড়ানো পাগড়ী; গায়ে পোশাকের উপর জরিদার শাল।[১] রামমোহন যদিও আরব্যোপন্যাসের রাজপুত্রের ন্যায় ঐশ্বর্য বিলাসের মধ্যে বাস করিতেন, তথাপি ইহাতে তাঁহার হিন্দু-শাস্ত্র অধ্যয়ন কিম্বা বেদের বিশুদ্ধ মূলভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অভিযানে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেদগুলিকে বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং সেগুলির টীকা লেখেন। কেবল তাহাই নহে। উপনিষদ এবং সূত্রগুলির সংগে সংগে পাশাপাশি-ভাবে তিনি খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রেরও আলোচনা করেন। কথিত আছে, রামমোহনই প্রথম উচ্চবর্ণ হিন্দু যিনি খৃস্টের উপদেশাবলী অধ্যয়ন করেন। খৃস্টের জীবন-লীলাগুলির অনুসরণে ১৮২০ খৃস্টাব্দে তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করেন: "The Precepts of Jesus, a Guide to Peace and Happiness" রামমোহনের অন্যতম ইউরোপীয় বন্ধু প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজক অ্যাডাম একটি একেশ্বরবাদী 'সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে কিছুদিনের জন্য রামমোহন ঐ সমাজের সভ্য হন। অ্যাডাম মনে মনে গর্ব অনুভব করিতেন যে, তিনি রামমোহনকে খৃস্ট-ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন এবং রামমোহন ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ খৃস্টান ধর্ম প্রচারক হইবেন। কিন্তু রামমোহনকে গোঁড়া হিন্দুধর্মে বাঁধিয়া রাখা যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি বাঁধিয়া রাখা সম্ভব ছিল না গোঁড়া খৃস্টানধর্মে। অবশ্য, রামমোহন বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি খৃস্টান ধর্মের আসল অর্থটি ধরিতে পারিয়াছেন। তাই রাম-মোহন একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বরভক্ত হইয়াই রহিলেন, মূলতঃ একজন যুক্তিবাদী এবং নীতিবাদী। তিনি খৃস্টান ধর্ম হইতে তাঁহার নৈতিক চিন্তার রীতিটিকে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু খৃস্টের দেবত্বকে গ্রহণ করিলেন না, যেমন করিলেন না হিন্দু অবতারগুলিকে-ও। উৎসাহী একেশ্বরবাদী হিসাবে তিনি ঐ ট্রিনিটিকে অনেকেশ্বর-

১ তিনি মুসলমানের পোশাক পরিধান করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি এই পোশাককে ব্রাহ্ম-সমাজের উপর চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। পোশাকের দিক হইতে তাঁহার যে সৌন্দর্য-রুচি এবং স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছন্নতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল—তাহা হিন্দুধর্মের অপেক্ষা মুসলমান ধর্মেরই অন্তর্গত বলা চলে।

বাদের ন্যায়ই আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ফলে, ব্রাহ্মণরা এবং খৃস্টান মিশনারিরা, উভয় দলই রামমোহনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইলেন।

কিন্তু তাহাতেই ব্যস্ত হইবার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না। সকল উপাসনা-মন্দিরই যখন তাঁহার নিকট রুদ্ধ,[১] তখন তিনি নিজের এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন বিশ্বাসীদের জন্য একটি উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার পূর্বে তিনি অদ্বিতীয় এবং অদৃশ্য ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ১৮১৫ খৃস্টাব্দে 'আত্মীয় সভার' প্রতিষ্ঠা করেন। যে গায়ত্রীকে ভারতে সর্বপ্রাচীন ভগবৎ-সূত্র বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তিনি ১৮২৭ খৃস্টাব্দে তাহার সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। ১৮২৮ খৃস্টাব্দে রামমোহনের গৃহে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একত্রিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর-ও ছিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া একটি একেশ্বরবাদী সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘ ভারতবর্ষে পরে ব্রাহ্ম সমাজ[২] নামে এক বিস্ময়কর জীবন লাভ করে। এই সমাজটিকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা সনাতন অজেয় অব্যয় ব্রহ্মের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হয়। স্থির হয়, "কোনো মানুষ বা সম্প্রদায় যে বিশেষ নামে অভীষ্ট দেবতা বা দেবতাদিগকে ডাকেন, সেই নামে, সেই বিশেষণে বা সেই উপাধিতে তাঁহাকে এখানে পূজা করা চলিবে না।" এই উপাসনা-মন্দিরের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে। রামমোহন রায় চাহিয়াছিলেন, তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজ বর্ণ, জাতি, দেশ ও ধর্ম-নির্বিশেষে সার্বজনীন পূজা-বেদীতে পরিণত হউক। তাঁহার দানপত্রে তিনি লিখিয়া যান যে, কোনো ধর্মের "নিন্দা, 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবহেলাপূর্ণ উল্লেখ আলোচনা চলিবে না।" এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য হইল "বিশ্বের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা সম্পর্কে ধ্যান ও চিন্তায় মানুষকে উৎসাহিত করা।" "সকল ধর্মের, সকল বিশ্বাসের মানুষকে ঔদার্য, দয়া, করুণা ও নৈতিক বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া মানুষের মিলনের বন্ধনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা।"

১ একমাত্র অ্যাডাম সাহেবের 'একেশ্বরবাদী গীর্জা' (*Unitarian Church*) ছাড়া। ইউনিটারিয়ান চার্চের অবস্থা তখন ভালো ছিল না।

২ একটি জমি কেনার দলিলে ভুলক্রমে ব্রাহ্ম-সমাজ নামটি সর্ব প্রথমে উল্লিখিত হয়। ঐ জমির উপরই একেশ্বরবাদী উপাসনা-মন্দিরটি গঠিত হয় ১৮২৯ খৃস্টাব্দে।

১৮২৮ খৃস্টাব্দের ২৫শে আগস্ট তারিখে এই উপাসনা-সভার প্রথম অধিবেশন হয়। প্রতি শনিবারেই এখানে সাতটা হইতে নয়টা পর্যন্ত বেদ হইতে আবৃত্তি, উপনিষদ পাঠ, বেদের উপর নানা বক্তৃতা এবং স্তব-গান হইতে থাকে। স্তবগুলির অধিকাংশই ছিল রামমোহনের স্বরচিত। এই স্তব-গানের সময় যিনি যন্ত্র সংগত করিতেন, তিনি ছিলেন একজন মুসলমান।

অতঃপর রামমোহন একটি সার্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। রামমোহনের শিষ্য এবং ভক্তরা স্বেচ্ছায় এই ধর্মকে নাম দিলেন "বিশ্বধর্ম।" কিন্তু পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে এই নামটিকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, রামমোহন তাঁহার এই ধর্মে কি উচ্চতম কি নিম্নতম সকল প্রকার অনেকেশ্বরবাদকে বাদ দিলেন। বর্তমান কালের ধর্ম সংক্রান্ত বাস্তবতাকে যিনিই সংস্কারমুক্ত হইয়া লক্ষ্য করিতে চান, তিনিই স্বীকার করিবেন, এই অনেকেশ্বরবাদিতা খৃস্টান ধর্মের ট্রিনিটি, 'একের মধ্যে তিন', এই সূত্রে যে উচ্চতম প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা হইতে শুরু করিয়া তাহার বিকৃততম রূপ পর্যন্ত মানব-সমাজের অন্ততঃপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের উপর রাজত্ব করিতেছে। রামমোহন নিজেকে "হিন্দু একেশ্বরবাদী" বলিয়া নির্ভুলভাবে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি অন্য দুইটি বিরাট একেশ্বরবাদী ধর্ম, ইসলাম ও খৃস্টান ধর্ম হইতে নানা বিষয় গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই[১]। অথচ কেহ তাঁহাকে "সংগ্রহবাদী" বলিয়া নিন্দা করিলে, তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে তাহার যথাসাধ্য প্রতিবাদও করিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার শিষ্যরাও সকলেই একমত। রামমোহনের মতে, ধর্ম-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার গভীরে অনুসন্ধান করিয়া যে মৌলিক পূর্ণাংগ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তাহার উপরেই সকল মতবাদের ভিত্তি হওয়া উচিত। সুতরাং রামমোহনের মতবাদকে বেদান্ত বা খৃস্টান একেশ্বর-বাদের সহিত গুলাইয়া ফেলিয়া লাভ নাই। বেদান্তের "অব্যয়" এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্ব-কৌশিক চিন্তার···অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্ম এবং যুক্তির উপর তাঁহার ভগবান সংক্রান্ত মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করা হয়।

রামমোহন যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা সহজ নহে। তাহা অপেক্ষাও সহজ নহে তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাকে বাস্তবে পরিণত করা। কারণ, যুক্তির দ্বারা যুক্তিসংগতভাবে শাসিত-নিয়ন্ত্রিত হইয়া অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, সেই সমালোচনা-বুদ্ধি এবং বিশ্বাসের একটি সমন্বয়ই তিনি, স্পষ্টতঃ না বলিলেও, চাহিয়াছিলেন মনে হয়। তাঁহার দেহের ও মনের গঠন-ভংগীটি রাজোচিত হওয়ায়, মুহূর্তের জন্যও দৈনন্দিন জীবনের ভারসাম্য ব্যাহত না করিয়াই তিনি ধ্যান-লোকের সমুচ্চ শিখর-দেশে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়া-

---

১ রামমোহন রায়ের 'হিন্দু একেশ্বরবাদ' বাইবেলের যতোখানি কাছাকাছি গিয়া পৌঁছে, তাঁহার ঠিক পরে যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজে কর্তৃত্ব করিতেন, তাঁহাদের মতবাদ ততোখানি পৌঁছে না—বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

ছিলেন। বাংলার ভক্তরা প্রায়ই যে ভাবাতিশয্যের কবলে পড়িতেন, রামমোহন তাহাকে ঘৃণার সহিত এড়াইয়া চলিতেন। এবং এইরূপেই তিনি ভাবাতিশয্যের হাত হইতে করিতেন আত্মরক্ষা।[১] এক শতাব্দী কাল পরে অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে ভিন্ন এইরূপ শ্রেষ্ঠতম মনস্বিতার সহিত বিভিন্ন শক্তির ও সম্ভ্রান্ত স্বাতন্ত্র্যের মিলন আর দেখি নাই। তাই রামমোহনের মধ্যে যে মিলন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে অন্য কাহারো মধ্যে সঞ্চারিত করা সহজ ছিল না, এবং বস্তুতঃ অক্ষুণ্ণভাবে সঞ্চারিত করা ছিল অসম্ভব। রামমোহনের পরবর্তীরা মহৎ এবং শুদ্ধসত্তা হইলেও তাঁহারা তাঁহার মতবাদকে এমন বদলাইয়া ফেলেন যে, তাহাকে আর চেনাও সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। যাহাই হউক, ব্রাহ্মসমাজের গঠনতন্ত্রের মধ্যে কোনো কোনো অংশকে রামমোহনের পরবর্তীরা বুঝিতে এবং গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। ফলে, ভারতে এবং এশিয়ায় এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। এবং রামমোহনের এই চিন্তা ও ধারণা যে কতো মহান, তাহা কেবল প্রমাণ করিতেই এক শতাব্দী লাগে।

রামমোহন তাঁহার সমাজ-সংস্কারের দুর্দম অভিযানগুলিতে তাঁহার মতবাদের ব্যবহারিক দিকটির উপরও জোর দেন।[২] এ-ব্যাপারে তিনি বৃটিশ শাসকদিগেরও

১ ১৯২৮ খৃস্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যার 'দি মডার্ণ রিভ্যিউ'তে প্রকাশিত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রবন্ধ '*Ram Mohan Roy, The Devotee*' দ্রষ্টব্য।

"তাঁহার বহুবিধ চিন্তা ও কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও রাজাকে প্রায়ই ব্রহ্ম-সমাধিতে নিমগ্ন দেখা যাইত। রাজার নিকট সমাধি বলিতে কোনো প্রকার অস্বাভাবিক আংগিক বুঝাইত না। ইহা গভীর নিদ্রাকালীন চেতনারহিত অবস্থা নহে; ইহা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার উচ্চতর আধ্যাত্মিক একটি অনুশীলন; ইহার মধ্যে উচ্চতর আত্মার নিকট আত্মাকে সমর্পণ করিতে হয়। বিশ্বের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিলেই আত্মসাক্ষাৎকার' হয় না।...ইহা ছিল প্রতিটি অনুভূতিকণার মধ্যে ভগবানকে অনুভব করা। রামমোহন প্রধানত ছিলেন একজন সাধক। তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈদান্তিক হইলেও অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, উপনিষদগুলি আত্মার ভক্তি-লালসাকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সেই সংগে বাংলার ভক্তি-সাধনাকেও তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই।...তিনি আশা করিতেন, তাঁহার ভক্তি-লালসা সুফীবাদের মধ্যে মিটিতে পারে।"

২ যে সকল অসংখ্য সংস্কার তিনি সাধন করিয়াছিলেন, কিম্বা সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখানে আমরা তাহার পরিপূর্ণ তালিকা দিবার চেষ্টা করিতে পারি না। তাঁহার প্রধান সংস্কারগুলির কয়েকটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি প্রমাণ করেন যে, সতীদাহ প্রথা সকল শাস্ত্র-বাক্যের বিরোধী। এবং ১৮২৯ খৃস্টাব্দে ইহার প্রতিরোধের জন্য তিনি বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করেন। তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। বিধবা-বিবাহ, ভারতীয় ঐক্য হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মৈত্রী এবং হিন্দু শিক্ষা, এই সমস্ত বিষয়গুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য তিনি প্রচেষ্টা করেন। হিন্দুর শিক্ষা ব্যবস্থাকে

সাহায্য পাইয়াছিলেন।[১] তখনকার বৃটিশ শাসকরা আজিকার অপেক্ষা অধিক উদার এবং অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন। রামমোহনের দেশপ্রীতির মধ্যে বিন্দুমাত্র স্থানীয় সংকীর্ণতা ছিল না। তিনি স্বাধীনতা এবং নাগরিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত প্রগতি ভিন্ন অন্য কিছুরই দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। ইংরেজকে ভারত হইতে বিতাড়িত করা দূরে থাকুক, তিনি চাহিতেন, ইংরেজরা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হউক, রক্ত-চোষা রাক্ষসের মতো নহে, যাহা তাহাকে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিবে, এমনভাবে—যাহাতে তাহার শোণিত, তাহার স্বপ্ন, তাহার চিন্তা ভারতীয়দের সহিত পরস্পর মিশ্রিত হইতে পারে। তিনি এতোদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তিনি চাহিলেন, তাহার দেশের জনসাধারণ ইংরেজিকে তাহাদের সার্বজনীন ভাষারূপে গ্রহণ করুক, যাহার ফলে সামাজিক দিক হইতে ভারত পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপেই স্বাধীনতা অর্জন করিয়া সে এশিয়ার অবশিষ্টাংশকেও আলোকিত করিবে। আয়ার্ল্যাণ্ড, প্রতিক্রিয়াশীলদের পদতলে নিষ্পেষিত নাপলস এবং ১৮৩০ খৃস্টাব্দের 'জুলাই দিনগুলির' বিপ্লবী ফ্রান্স—পৃথিবীর সকল দেশের সমর্থনেই স্বাধীনতার আদর্শে তাঁহার সংবাদপত্রগুলি আবেগ-উত্তেজনায় পূর্ণ থাকিত। ইংলণ্ডের সহিত সহযোগিতার এই বিশ্বস্ত কর্মী ও প্রচারক ইংলণ্ডের সহিত অকপটে আলোচনা করিতেন এবং তিনি স্পষ্টভাবে জানাইতেন, তাঁহার দেশের জনসাধারণের প্রগতির কার্যে ইংলণ্ড নেতৃত্ব করিবে, তাঁহার এই আশা যদি বাস্তবে পরিণত না হয়, তবে ইংলণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করিবেন।

১৮৩০ খৃস্টাব্দের শেষাশেষি দিল্লীর সম্রাট রামমোহনকে ইংল্যাণ্ডে তাঁহার

তিনি ইউরোপীয় শিক্ষার বৈজ্ঞানিক আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চান, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বহু পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রাচীন ভারতের আদর্শে নারীদের শিক্ষার প্রচলন করিতেও তিনি চেষ্টা করেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি চিন্তা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইন সংস্কার এবং রাজনীতিতে সমান অধিকার প্রবর্তন করিতেও ইচ্ছুক হন।

১৮২১ খৃস্টাব্দে তিনি একটি বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ভারতীয় সংবাদপত্রের জনক। সেই সংগে তিনি পারসিক ভাষায় একটি পত্রিকা এবং বৈদিক বিজ্ঞানের পাঠালোচনার জন্য "বেদ-মন্দির" নামে একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা ছাড়া, ভারতবর্ষ তাহার প্রথম আধুনিক হিন্দু কলেজ, অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলি এবং রামমোহনের মৃত্যুর দশ বৎসর বাদে (১৮৪৩) কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম নারী বিদ্যালয়ের জন্য রামমোহনের নিকটেই ঋণী রহিল।

১ গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক-এর বন্ধুত্ব ও সাহায্য ছাড়া রামমোহন রায় কখনো সংস্কারোন্মাদ ব্রাহ্মণদের উত্তেজিত বিরোধিতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে বা তাঁহার অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইতেন না।

দূতরূপে যাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। কারণ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন সনদ দেওয়া সম্পর্কে কমন্স সভার বিতর্কে তিনি উপস্থিত থাকিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩১ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংল্যাণ্ড পৌছেন এবং লিভারপুলে, ম্যাঞ্চেস্টারে, লণ্ডনে এবং রাজ-দরবারে সাদর-আপ্যায়ন লাভ করেন। ইংল্যাণ্ডে রামমোহনের সহিত বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বন্ধুত্ব হয়। উক্ত বন্ধুদের মধ্যে বেন্থাম অন্যতম। রামমোহন কিছুদিনের জন্য ফ্রান্সে-ও যান। অতঃপর ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিস্টলে মস্তিষ্কের প্রদাহের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। ব্রিস্টলেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সমাধির স্মৃতি-ফলকে লিখিত আছে ঃ

"A conscientious and steadfast believer in the unity of god-head : he consecrated his life with entire devotion to the worship of the Divine Spirit alone."

কিন্তু ইউরোপীয় ভাষায়,—"মানব মিলনের" জন্যও বলা যাইতে পারে। তাহাতে অর্থের কোনো পার্থক্য ঘটিবে না।

এই বিপুল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষটি ভারতের মৃত্তিকায় হলকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং ষাট বৎসরের পরিশ্রমের ফলে তাহার রূপান্তর ঘটাইয়াছিলেন। অথচ লজ্জার বিষয়, তাঁহার নাম ইউরোপ তথা এশিয়ার পূজা-মন্দিরে (pantheon) খোদিত হয় নাই। রামমোহন সংস্কৃত, বাংলা, আরবিক, পারসিক এবং ইংরেজী ভাষার সুদক্ষ লেখক ছিলেন, ছিলেন আধুনিক বাংলা গদ্যের জন্মদাতা এবং বহু বিখ্যাত স্তোত্র, কবিতা, ধর্মোপদেশ এবং দার্শনিক, রাজনৈতিক ও বিতর্কমূলক সকল প্রকার প্রবন্ধের লেখক। তাঁহার চিন্তা এবং আবেগময় আদর্শের বীজ তিনি ব্যাপকভাবে বপন করিয়াছিলেন। ফলে, বাংলার মৃত্তিকা হইতে ফসল উঠিয়াছে— বহু কর্মের ও মনুষ্যের ফসল!

তাঁহার আদর্শ প্রেরণা হইতেই ঠাকুরবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

*

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান সমর্থক হইয়া উঠেন[১]। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) রামচন্দ্র বিদ্যা-

১ দ্বারকানাথও রামমোহনের মতোই ইংলণ্ডে ভ্রমণকালে ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে মারা যান। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম কর্ণধাররা যে ইউরোপের পথে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিলেন, পশ্চিমদেশে তাঁহাদের মৃত্যু হইতেই তাহার সংকেত পাওয়া যায়।

বাগীশের সাময়িক কর্তৃত্বের পর রামমোহনের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। বাস্তবিক পক্ষে, তিনিই ব্রাহ্ম সমাজের সংগঠন করেন। এই মহাপুরুষটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার কিছু চেষ্টা করা প্রয়োজন। ইতিহাসে দেশীয় জনসাধারণ তাঁহাকে মহর্ষি নামে ভূষিত করিয়াছেন।[১]

দেবেন্দ্রনাথ দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য, উচ্চতর মনীষা, নৈতিক শুদ্ধি এবং একটি ত্রুটিহীন আভিজাত্যের অধিকারী ছিলেন। এই গুণগুলি তিনি তাঁহার সন্তানসন্ততিদের দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া, অনুরূপ গভীর আবেগময় কাব্যানুভূতিরও অধিকারী ছিলেন তিনি।

এক ধনী পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এক গোঁড়া ঐতিহ্যের মধ্যেই লালিত-পালিত হইতে থাকেন এবং বাড়ন্ত বয়সে পার্থিব প্রলোভন ও বিলাস-ব্যসনের কবলে পতিত হন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার গৃহে একটি মৃত্যু ঘটায়, ঐ সকল বিভ্রান্তির হাত হইতে তিনি আপনাকে মুক্ত করেন। কিন্তু ধর্মাত্মক শান্তির দ্বারদেশে পৌঁছিবার পূর্বে তাঁহাকে একটি দীর্ঘ নৈতিক সংকটকাল অতিক্রম করিতে হয়। ইহা লক্ষণীয় যে, তাঁহার মধ্যে যতোগুলি সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি ঘটিয়াছে, সেগুলি কোনো না কোনো আকস্মিক ঘটনার ফলে অনুভূত কাব্য প্রেরণা হইতেই ঘটিয়াছে, যেমন বাতাস তাঁহার কাছে গঙ্গার তীরে জ্যোৎস্না রাত্রিতে কোনো মুমূর্ষুর কানে উচ্চারিত হরিনাম বহিয়া আনিয়াছে। ঝড়ের মধ্যে মাঝ-নদীতে মাঝিমাল্লার 'ভয় নাই! আগে চলো!' ইত্যাদি কথাগুলি, কিম্বা বাতাসে উড়িয়া আসা সংস্কৃতে লিখিত উপনিষদের ছিন্ন এক পৃষ্ঠা—যাহার উপর লেখা ছিল: "সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অনুসরণ করো, তাঁহার অবর্ণনীয় ঐশ্বর্য উপভোগ করো"—তাঁহার নিকট দৈববাণীর মতো মনে হইয়াছে।

১৮৩৯ খৃস্টাব্দে তিনি তাঁহার সমস্ত ভাই-ভগ্নী এবং কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া তাঁহারা যে সত্যে বিশ্বাস করেন, তাহার প্রচারের জন্য একটি সংঘের প্রতিষ্ঠা

১ দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় একটি আত্ম-জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। (এই গ্রন্থখানি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ইন্দিরা দেবী কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। ১৯০৯, কলিকাতা।) তাঁহার অন্তর্জীবন কিভাবে মায়া এবং কু-সংস্কারের অতল গভীর হইতে পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রা করিয়াছিল, ইহাতে তাহারই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, এই গ্রন্থখানি তাঁহার ধর্মাত্মক কড়চা মাত্র।

'ক্রিউইয়ে দ্য ল্'ইন্দ্' পত্রিকার, ১৯২৮ খৃস্টাব্দ, ১ম খণ্ডে প্রকাশিত মঁসিয়ে দুগার লিখিত প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। এই পত্রিকাটি বুলনি-সিউর-সেন হইতে সি, এ, হগম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

করেন, তিন বৎসর বাদে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং তাহার নেতৃস্থান অধিকার করেন। তিনিই ইহার বিশ্বাস, আদর্শ এবং অনুষ্ঠানকে গড়িয়া তুলেন, নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করেন এবং যাজক পুরোহিতদের শিক্ষার জন্য ধর্মশাস্ত্রের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেও ইহাতে বক্তৃতা দেন এবং ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে 'বিশ্বাসীদের উন্নতির জন্য ধর্ম ও নীতি বিষয়ে ভগবৎ-সংক্রান্ত খসড়া'—'ব্রাহ্ম-ধর্ম' সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন [১]। তিনি নিজে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার এই রচনা ভগবৎপ্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া লিখিত হইয়াছে ![২]

তাঁহার প্রেরণার উৎস প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ছিল উপনিষদ। তবে সে-গুলির তিনি স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করেন। রামমোহন রায়ের প্রেরণার উৎসটি কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক প্রকারের ছিল [৩]। পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের চারিটি মূল নীতি নির্ধারিত করিয়া দেন :

(১) আদিতে কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র ছিলেন একজন পরম পুরুষ। তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি করেন।

(২) তিনিই একমাত্র সত্যের, অসীম জ্ঞানের এবং শক্তির ভগবান ; তিনি সনাতন, সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়।

১ ইহার একটি ইংরেজি সম্প্রতি এচ. সি. সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 'ব্রাহ্ম ধর্ম' গ্রন্থটির পাঠকের সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রচুর ; সেখানে ইহা বিভিন্ন কথ্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

২ "যাহা আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে, উহা ভগবানের সত্য। যিনি জীবন, যিনি আলো, যিনি সত্য, তাঁহার নিকট হইতেই এই জীবন্ত সত্যগুলি আমার হৃদয়ে নামিয়া আসিয়াছে।" (দেবেন্দ্রনাথ)। তিনি এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড তিন ঘণ্টায় বলিয়া শেষ করেন। এই সমগ্র প্রবন্ধটি একটি নদীর মতো উপনিষদের ভাষায় অনর্গল লিখিত হয় ; "তাঁহারই করুণায় আধ্যাত্মিক সত্যগুলি আমার অন্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।" এইভাবে ভগবৎ-প্রেরিত বিধি রচনার পদ্ধতিতে,—যাহা দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় মনোভাবাপন্ন মানুষের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি মাত্র,—বিপদ হইল এই যে, একদিকে যেমন তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজ "সত্যকে কেবলমাত্র সনাতন ও অবিনশ্বর শাস্ত্র-বাক্য" বলিয়া বিশ্বাস করে এবং অন্য কোনো পবিত্র গ্রন্থ বা শাস্ত্রকে স্বীকার করে না, তেমনি অন্য পক্ষে সেই সত্য এমন একটি প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যাহা নির্বাচিত এবং পূর্ব পরিকল্পনার দ্বারা কতিপয় হিন্দু শাস্ত্র হইতেই উপনীত শেষ সিদ্ধান্ত হিসাবে তাঁহার হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়াছে।

৩ শাস্ত্র সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের মনোভাবটা সর্বদা একরূপ ছিল না। ১৮৪৪ এবং ১৮৪৬ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে কাশীতে তিনি বেদকে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন মনে হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৮৪৭ খৃস্টাব্দের পরে তাঁহার এই ধারণা তিনি ত্যাগ করেন এবং ব্যক্তিগত প্রেরণাই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করে।

(৩) তাঁহার প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁহার পূজার উপরই আমাদের ইহকাল ও পরকালের মুক্তি নির্ভর করিতেছে।

(৪) তাঁহাকে ভালোবাসো এবং তাঁহার অভিলাষ সাধন করাই হইল ধর্ম।

সুতরাং ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম একেশ্বরের ধর্ম। এই একেশ্বর শূন্য হইতে বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মূল গুণ হইল, তিনি করুণাময়। পরকালে মানুষের মুক্তির জন্য তাঁহার পরিপূর্ণ পূজার প্রয়োজন।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার এই ধর্মকে যেরূপ বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম বলিয়া ভাবিতেন, তাহা সত্যই তেমনটি ছিল কিনা বিচার করিবার মতো আমাদের কোনো উপায় নাই। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে ঠাকুর পরিবার যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাহার নাম ছিল পিরিলি বা প্রধান মন্ত্রী। মুসলমান রাজত্বকালে ঐ বংশের কেহ কেহ প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ফলে, মুসলমানদের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ থাকায়, সমাজে তাঁহাদিগকে এক রকম পতিত বলিয়াই ধরা হইত।[১] এই ঘটনার প্রভাবে তাঁহাদের পরিবারে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে ক্রমাগতই কঠোরতা দেখা যায়, তাহা বলিলে সম্ভবত অত্যুক্তি হইবে না। দ্বারকানাথ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই পৌত্তলিকতার পরম শত্রু ছিলেন।

কে. টি. পালের মতে, দেবেন্দ্রনাথকে একদিকে যেমন গোঁড়া হিন্দুদের কার্যের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তেমনি খৃস্টান প্রচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করিতে হয়। খৃস্টান প্রচারকগণ ব্রাহ্মসমাজে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলে, তাঁহার ধর্মের নগরদুর্গ রক্ষার জন্য চারিদিকে পাহারার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথকে সুদৃঢ় নীতির রক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হয়। ভারতীয় ধর্মের দুই প্রান্ত সীমারই সহিত ইহার যোগাযোগ ছিন্ন করা হইল। এই প্রান্তসীমাদ্বয়ের একটি[২]—অনেকেশ্বর-বাদ; দেবেন্দ্রনাথ তাহা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিলেন[৩]। অপরটি শংকরের

১ মঞ্জুলাল দাসে প্রণীত "*The Poetry of Rabindranath Tagore*", ১৯২৭

২ ঠাকুরদের বাসস্থান শান্তিনিকেতনের দরজার উপর লেখা আছে, "এখানে পুতুল পূজা হয় না।" এবং সেই সংগে আরো লেখা আছে: "কিন্তু কাহারো ধর্মকে ঘৃণাও করা হয় না।"

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একেশ্বরবাদের প্রবেশ সম্বন্ধে আলোচনার সময় শিশুকালে রামমোহন রায়ের উপর ইস্‌লামের প্রভাবগুলিকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

৩ এমনভাবে করিলেন যে, ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠ-পুত্র হিসাবে সৎকার-কালীন কৃত্য অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিয়া পারিবারিক ঐতিহ্যের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন। কারণ, সেগুলির মধ্যে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ছিল। ফলে, এমন লোকনিন্দা ঘটিল যে, সকলে

পরিপূর্ণ অদ্বৈত-বাদ। ব্রাহ্ম 'বুর্গ' ছিল দ্বৈতবাদের বিরাট একটি নগর এই দ্বৈতবাদে অদ্বিতীয় দেহধারী এক ভগবানের সহিত মানবিক যুক্তিও স্থান পাইয়াছে—যে মানবিক যুক্তিকে ভগবান শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার জন্য শক্তি এবং অধিকার দিয়াছেন। আমি ইতিপূর্বেই ইহা নির্দেশ করিয়াছি। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এবং আরো অধিকতরভাবে তাঁহার পরবর্তীদের ক্ষেত্রে, ধর্ম-প্রেরণার সহিত যুক্তিকে গুলাইয়া ফেলিবার একটি মনোভাব লক্ষিত হয়। সিমলা পাহাড়ের নিকটস্থ হিমালয়ে দেড় বৎসর অতিবাহিত করিবার পর ১৮৬০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নির্জন-চিন্তার একটি মাল্য রচনা করেন।[১] তাঁহার এই চিন্তাগুলি তাঁহার বক্তৃতাকালে আরো বিস্তার লাভ করে। তাহা ছাড়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং শক্তিমান বিশুদ্ধ এক আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ছিলেন।

হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরে ১৮৬২ খৃস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনকে তাঁহার সহযোগিরূপে গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র তেইশ বৎসর। কেশবচন্দ্র পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথকেও ছাড়াইয়া যান। ব্রাহ্মসমাজে একটি দলের,—একটি কেন পরপর কয়েকটি দলের সৃষ্টি করেন।

তাঁহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। ফলে, কয়েক বৎসর যে মহান্ সংগ্রাম চলিল, সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আমি আর কালক্ষয় করিব না। পিতা বহু ঋণ রাখিয়া মারা যান; তাই দেবেন্দ্রনাথ সেগুলি পরিশোধের কঠিন কর্তব্য সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। দাতব্য বিষয়ে পিতা যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেগুলিও পালন করেন।

১ তাঁহার তরুণ-পুত্র রবীন্দ্রনাথও তাঁহার সংগে ছিলেন।

হিমালয়ের কোলে এই আবেগময় দিনগুলির অপূর্ব স্মৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরবর্তীকালের রচিত "জননায়কের" উদ্দেশ্যে আবেদনটিকে জড়িত করিতে আমার বেশ লাগে:

জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বংগ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা-উচ্ছলজলধি-তরংগ,
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়-গাথা।
জনগণ-মংগল-দায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।

—"জন্মভূমির প্রতি।"

বস্তুতঃ, আদি ব্রাহ্ম-সমাজ সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন যে ব্যাপক আলোচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা হইতে উপকৃত হন।

কেশবচন্দ্র[১] মাত্র ১৮৩৮ খৃস্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার মধ্যে যেমন ছিল দৃঢ় সংকল্পের অভাব এবং অস্থিরতা, তেমনি ছিল ঐশী প্রেরণা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁহার ব্যক্তিত্বই ব্রাহ্ম সমাজকে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রভাবিত করে। তিনি এমনভাবে ইহার সমৃদ্ধি এবং সংস্কৃতি সাধন করেন যে, ইহার অস্তিত্বও বিপন্ন হইয়া উঠে।

তিনি ছিলেন একটি ভিন্ন শ্রেণীর ও কালের প্রতিনিধি, যে শ্রেণী ও কালের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব গভীরতর ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তিনি রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের মতো কোনো শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন একটি উদারনৈতিক প্রসিদ্ধ মধ্যবিত্ত পরিবারে, যাহার সহিত ইউরোপের অবিরাম মানসিক যোগাযোগ ছিল। তিনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। তাঁহার পিতামহ একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির দেশীয় সেক্রেটারি; হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের সকল

১ কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত "কেশবচন্দ্রের জীবনী" নয় খণ্ডে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (কেশবচন্দ্রের প্রধান শিষ্য এবং ব্রাহ্ম-সমাজের পরবর্তী নেতা) প্রণীত: *"The Faith and Progress of the Brahma Samaj"*. ১৮৮২, কলিকাতা এবং *"Aims and Principles of Keshab Chundra Sen"*, ১৮৮৯, কলিকাতা।

প্রমথ লাল সেন: *"Keshab Chunder Sen, a Study"* ১৯০২; নূতন সংস্করণ ১৯১৫, কলিকাতা।

টি. এল. ভাস্বানি প্রণীত *"Sri Keshab Chunder Sen, a Social Mystic"*, ১৯১৬, কলিকাতা।

বি. মজুমদার (কেশব মিশন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট) প্রণীত: *Professor Max Muller on Ramakrishna; the World on Keshab Chunder Sen'*, ১৯০০, কলিকাতা।

মণিলাল সি. পারেখ, *"Brahmarshi Keshab Chunder Sen"*, ১৯২৬, রাজকোট, ওরিয়েণ্টাল ক্রাইস্ট হাউস।

(কেশবচন্দ্রের অন্যতম ভারতীয় খৃস্টান শিষ্য কর্তৃক লিখিত এই গ্রন্থখানি কেশবচন্দ্রের খৃস্টান-ধর্মিতাকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছে। প্রথমের দিকে পুস্তকখানি কেবল প্রয়াসমূলক ছিল, কিন্তু পরে ইহা ক্রমে কেশবচন্দ্রকে অধিকতর সম্পূর্ণ এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছে।)

কেশবচন্দ্র সেন রচিত: *"A Voice from the Himalayas."* ইহা ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে সিমলায় প্রদত্ত কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাবলীর সমষ্টি এবং তৎসহ একটি মুখপত্র। ইহা ১৯২৭ খৃস্টাব্দে সিমলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্করণ প্রকাশের ভার তাঁহার উপরেই নিয়োজিত ছিল। কেশবচন্দ্র অতি অল্প বয়সেই মাতা-পিতৃহারা হইয়া একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে লালিত পালিত হন। ইহার ফলেই তাঁর পূর্ববর্তীদের সহিত তাঁহার এমন পার্থক্য ঘটে; কারণ, তিনি সংস্কৃত জানিতেন না এবং অবিলম্বেই তিনি হিন্দুধর্মের সাধারণ জনপ্রিয় আংগিক-গুলিকে পরিত্যাগ করেন।[১] তিনি খৃস্টের স্পর্শ লাভ করায়, খৃস্টকে ব্রাহ্ম সমাজে এবং একদল ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষার অন্তরে আনয়ন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং আদর্শ হইয়া উঠে। তাঁহার মৃত্যুতে 'দি ইণ্ডিয়ান খৃশ্চান হেরাল্ড' পত্রিকা তাঁহার সম্বন্ধে বলেন: খৃস্টান ধর্ম তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে। খৃস্টানরা কেশবচন্দ্রকে ভগবানের দূতরূপেই দেখিয়াছেন; খৃস্টের সম্বন্ধে ভারতকে সচেতন করিবার জন্য ভগবান তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় খৃস্টের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়াছে।"

এই শেষোক্ত কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য নহে। খৃস্টের সমর্থনে কেশব নিজে কি পরিমাণ দুঃখকষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা আমরা এখন দেখিব। কেশবচন্দ্রের সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, এমন কি ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকরাও, তাঁহাদের অধিকাংশই তাঁহার জীবনের সত্যকারের অর্থকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা তাঁহাদের নেতার রীতি-গহিত ঘোষণাগুলিতে ব্যথিত বিরক্ত হইয়া সেগুলিকে গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র নিজেই তাঁহার সত্যকারের অর্থকে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর বিশ বৎসর পূর্বে তিনি যাহা লিখেন, তাহা হইতেই, তাঁহার স্বমুখেই আমরা শুনি যে, যৌবনকাল হইতে তাঁহার জীবন তিনজন খৃস্টানের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। মরুস্থানের প্রচারক জন, যীশু এবং সেণ্ট পল[২]। তাহা ছাড়া তিনি তাঁহার অন্তরংগ

১ ইহাই স্বাভাবিক যে, এই ব্যাপার সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র কখনো তাঁহার ধর্মাত্মক মনোভাব হারান নাই। এই ধর্মাত্মক মনোভাব ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার রামকৃষ্ণকে কেশবচন্দ্রের অতীন্দ্রিয় সাধনার গোড়ার দিকের কথা বলেন—(রামকৃষ্ণ-কথামৃত)। প্রথমে তিনি বিশ্বের সকল বস্তুর প্রতি উদাসীন হইয়া অন্তরের বিষয়ে এবং ধ্যানে তন্ময় থাকিতেন। "অতিরিক্ত ভক্তির" ফলে, এমন কি অনেক সময় তাঁহার সংজ্ঞাও লোপ পাইত। পরবর্তীকালে তিনি হিন্দু ধর্মের এই ভক্তি-সাধনার রূপকে অহিন্দু ধর্ম বস্তুর উপরও আরোপ করিলেন। ফলে কেশবচন্দ্র খৃস্টান ধর্মের যে বৈষ্ণবীকৃত রূপকে গ্রহণ করেন, তিনি তাহার সহিত যোগের আলোচনাও সর্বদাই চালাইতেন।

২ ১৮৭৯ খৃস্টাব্দের ইস্টার বক্তৃতা: *India Asks, Who is Christ?*

"—My Christ, my sweet Christ, the brightest jewel of my heart, the necklace of my soul—for twenty years have I cherished Him—in this my miserable heart."

শিষ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত গোপন একটি পত্রে[১] দেখান যে, খৃস্ট ধর্মে তাঁহার বিশ্বাসের কথা জন-সমক্ষে প্রকাশের উপযুক্ত সময়ের জন্য তিনি কী ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। কেশবচন্দ্র এই দীর্ঘকাল ধরিয়া দুইটি জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহার আংশিক কারণ তাঁহার চরিত্রের দুইটি দিক ছিল। তাঁহার চরিত্র প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের এই দুইটি বিভিন্ন ও বিপরীত উপাদানে গঠিত ছিল। এই দুইটি উপাদানের মধ্যে অনবরত বিরোধ চলিত। ফলে, ঐতিহাসিকের পক্ষে নিরপেক্ষ আলোচনা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু জীবনীকারগণ,

১ ১৮৭৯ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি: *Am I an Inspired Prophet?*

"What was it that made me no singular in the earlier years of my life? Providence brought me into the presence of three very singular persons in those days. They were among my soul's earliest acquaintances. I met three stately figures, heavenly, majestic, and full of divine radiance—(the first) John the Baptist was seen going about in the wilderness of India, saying, 'Repent Ye, for the Kingdom of Heaven is at hand'......I fell down at the feet of John the Baptist. He passed away, and then came another prophet far greater than he, the prophet of Nazareth—"Take no thought for the morrow." These words of Jesus found a lasting lodgment in my heart. Hardly had Jesus finished his words, when came another prophet, and that was the travelled ambassador of Christ, the strong, heroic and valiant Apostle Paul—and his words (relating to chastity) came upon me like a burning fire at a most critical period of my life."

এই প্রসংগে এ-কথার উল্লেখ প্রয়োজন যে, ইংরেজি কলেজে পড়িবার সময় তিনি 'নিউ টেস্টামেণ্ট' সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। কারণ, পাদরী সাহেব গ্রীক ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া তাঁহার তরুণ ছাত্রদিগকে 'নিউ টেস্টামেণ্ট' শোনাইতেন।

১ এই পত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ না থাকিলেও, নির্বিঘ্নে ধরিয়া লওয়া যায় যে, কেশবচন্দ্র প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে এই পত্রখানি ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে তাঁহার 'যীশু খৃস্ট এবং ইউরোপ ও এসিয়া' সংক্রান্ত বক্তৃতাগুলির ঠিক পরেই লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে কেশবচন্দ্র নিজেকে নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যা করেন।

"...খৃস্ট সম্পর্কে আমার নিজস্ব কতিপয় ধারণা রহিয়াছে। দেশের অবস্থার পরিবর্তনের ফলে সেগুলি যতোদিন পর্যন্ত পরিণতি লাভ করিয়া আমার অন্তরের বাহিরে আসে, ততোদিন পর্যন্ত সেগুলিকে কোনো প্রকার উপযুক্ত রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে আমি বাধ্য নই। যীশু এবং আত্মত্যাগ একই বস্তু। এবং যীশু যেমন যথাসময়ে বাঁচিয়া ছিলেন এবং প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার সম্পর্কে প্রচারও যথাসময়ে করিতে হইবে। তাই, যেদিন আমি বয়োবৃদ্ধ হইব এবং ভারতবর্ষ খৃস্টের ত্যাগের ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে, ধৈর্যসহকারে আমি সেইদিনেরই প্রতীক্ষায় রহিয়াছি।" (মণিলাল সি. পারেখ রচিত গ্রন্থের ২৯-৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ায়, তাঁহারা ঐতিহাসিকের দায়িত্বকে সুগম করার মতো কিছুই করেন নাই।[১]

কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের এক পুত্রের সহিত একই কলেজে পড়িতেন। দেবেন্দ্রনাথের এই পুত্রই তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজে লইয়া আসেন। আগমনের প্রথম দিনগুলিতে তরুণ কেশবচন্দ্রকে সকলেই স্নেহ করিতেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন হইয়া উঠিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে সামাজিক পরিপার্শ্ব এবং আদর্শবাদের ফলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, নিজেকে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরের নির্জনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখায় ব্রাহ্ম-সমাজের তরুণ সদস্যরা মহান দেবেন্দ্রনাথের অপেক্ষা কেশবচন্দ্রের প্রতি নিবিড়তর ভাবে আকৃষ্ট হইলেন, এবং তাঁহারাও কেশবচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন।[২] একটি সমাজিক বুদ্ধি ও চেতনা ছিল কেশবচন্দ্রের। তাই সেই সামজিক বুদ্ধি-চেতনাকে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে সকলের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে চাহিলেন। স্বভাবের দিক হইতে তিনি ছিলেন অতিরিক্ত ব্যষ্টিবাদী। এবং নিঃসন্দেহে এই কারণেই প্রথম জীবন হইতেই তিনি দেশে যে সকল অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলিকে চিনিতে পারেন।[৩] এবং একথাও তিনি বুঝিতে পারেন যে, বর্তমানে ভারতের একটি নৈতিক বিবেক লাভের প্রয়োজন। "প্রত্যেকেই

১ আমি ঐ সকল ঐতিহাসিকের প্রতি আমার বিরূপ ভাব গোপন করিতে চাহি না। কারণ, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই যেন ভাবিয়াছেন যে, ইতিহাস কতকগুলি ঘটনার পুঞ্জীভূত তালিকা মাত্র, এবং নিজের ব্যক্তিগত কোনো মত বা আদর্শ অনুসারে তাহা হইতে স্বেচ্ছামতো ঘটনা নির্বাচিত করিয়া লইয়া নিয়মিতভাবে অবশিষ্ট ঘটনা গুলিকে অস্বীকার করিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্টতার প্রতি তাঁহাদের অতুলনীয় ঔদাসীন্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। কারণ, তাহা হিন্দু ঐতিহাসিকগণের চারিত্রিক ত্রুটি। যদি ইতিহাসের মধ্যে কদাচিৎ ইতস্ততঃ দুই চারিটি তারিখ দেখা যায়, তবে সেগুলিকে দৈব-ঘটনাই বলিতে হইবে। তখনো আবার তারিখগুলি এমন অসতর্কভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে যে, সেগুলির উপর নির্ভর করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং তাহার পরিণতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাটির মূল বিষয়বস্তুগুলি আবিষ্কারের পর তিনবার ধরিয়া লিখিতে হইয়াছে। নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত ভারতীয় জীবনীকারগণ হয় সেগুলিকে ত্যাগ করিয়াছেন, নয় এমনভাবে বিকৃত করিয়াছেন যে, চেনাও দুষ্কর হইয়াছে।

২ "ভগবানের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে, তিনি সাধারণভাবে ভিন্ন সামাজিক দায়িত্বের আহ্বানকে কখনো অনুভব করেন নাই।" (ঠাকুর পরিবারের জনৈক বন্ধু কর্তৃক লিখিত পত্র হইতে)

৩ তাঁহার প্রধান শিষ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, তিনি তাঁহার অতীন্দ্রিয়তাপ্রবণ প্রকৃতির উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করিয়াছেন। এবং "সর্বদাই এই উচ্ছ্বাসগুলিকে তিনি ধারণ করিতেও সমর্থ হইয়াছেন" (অবশ্য এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নহে); কারণ, ধর্মকে পরিবারের প্রধানদের গোচর করা

সমাজগত হউন, প্রত্যেকেই অনুভব করুন জন সাধারণের সহিত, দৃশ্যমান সমাজের সহিত, তাঁহাদের একত্ব।" এই ভাবেই, রামমোহনের আভিজাতিক একবাদিতাকে জনসাধারণের সহিত ঐক্যবদ্ধ[১] করিয়া তরুণ কেশব উদীয়মান তরুণদের মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা উৎসাহী তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালের বিবেকানন্দের মতোই তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, জাতির পুনর্জন্মের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন। (বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকট যে পরিমাণে ঋণী, সম্ভবত তাহা তিনি নিজে উপলব্ধি করেন নাই; কারণ, বিশেষ কালে স্বাভাবিক ভাবেই বিশেষ ভাবের উদ্ভব হয় এবং সেগুলি একই সময়ে বিভিন্ন মানুষের মনে জন্মলাভ করে।) ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে বোম্বাই-এ কেশবচন্দ্র একটি অভিভাষণে বলেন যে, ধর্মকে তিনি "সমাজ সংস্কারের ভিত্তি" রূপে গড়িতে চান। এই কারণেই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে যে ধর্মসংক্রান্ত সংস্কার ঘটে তাহা কার্যত ফলপ্রসূ হইয়া উঠে। তাই কেশবের কর্মঠ হস্তকে,—যদিও কতক পরিমাণে তাহা চঞ্চল এবং অস্থির,—ভারতের মৃত্তিকায় আমরা এক মুষ্টি বীজ বপন করিতে দেখি, যে বীজ পরে ফসল হইয়া উঠিয়াছে। পরে বিবেকানন্দ[২] তাঁহার কালেও এই

"অর্থাৎ সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, ইহাই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবনের মহান লক্ষ্য। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে যে বিপরীত ভাবগুলি দেখা যায়, ইহাই সেগুলির অন্যতম কারণ। এই বিপরীত ভাবগুলি তাঁহার কর্মের মধ্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে। যাহাদের মধ্যে মিলন ঘটানো সম্ভব নহে, তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাইবার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। অ্যারি-ব্রেমঁ-র দক্ষ বিশ্লেষণ অনুসারে পশ্চিমী অতীন্দ্রিয়-বাদের ভাষায়, ঈশ-কেন্দ্রিকতা এবং নর-কেন্দ্রিকতা—তাঁহার মধ্যে তাঁহার স্বভাবগতভাবে যে অতীন্দ্রিয় উচ্ছ্বাস ঘটে তাহা, এবং ঐ দিব্য প্রবাহকে সম্প্রদায়ের নৈতিক এবং সামাজিক সেবার পথে চালিত করার যে কার্য তাহা—এই দুই পরস্পর-বিরোধী বস্তুর মধ্যে তিনি মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, এই দুইটি বস্তু-ই কেশবচন্দ্রের মধ্যে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ছিল। কিন্তু তাঁহার সমৃদ্ধ স্বভাবের রূপ দক্ষতা এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য, হজম না হইলেও, সকল প্রকার আধ্যাত্মিক আহার গ্রহণের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতা এতোই অধিক ছিল যে, তাহা তাঁহাকে একটি জীবন্ত বিরোধিতায় পরিণত করিয়াছিল। কথিত আছে, কলেজে পড়িবার সময় তিনি শেকস্‌পীয়ারের নাটকে হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওই ডেনমার্কের তরুণ কুমার হ্যামলেট-ই রহিয়া গিয়াছিলেন।

১ অন্তঃত পক্ষে, থিওরির দিক হইতে। কার্যত কেশবচন্দ্র কখনো জনসাধারণের নিকট পৌঁছিতে প্যারেন নাই। কারণ, তাঁহার চিন্তার মধ্যে এমন সকল বস্তু ছিল, ভারতীয় চিন্তার সহিত যেগুলির পরিচয় ছিল না।

২ জনসাধারণের সেবার জন্য কেশবচন্দ্র বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন: নৈশ বিদ্যালয়সমূহ, ক্যালকাটা কলেজ, নর্ম্যাল স্কুল ফর ইণ্ডিয়ান উইমেন, স্ত্রীলোকদের সাহায্যের জন্য একটি সংঘ, দি ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশন অব রিফর্ম্, দি ফ্র্যাটার্নিটি অব গুডউইল, অসংখ্য ব্রাহ্মসমাজ, ইত্যাদি।

বীজকেই তাঁহার দৃঢ় শক্তিশালী হস্তে দেশ-মাতৃকার বক্ষে ব্যাপকভাবে বপন করেন —যে দেশমাতৃকা তাঁহার কণ্ঠের বজ্র-নির্ঘোষে ইতিপূর্বেই জাগিয়া উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু কেশব আসিয়াছিলেন তাঁহার সময়ের পূর্বে। তাঁহার কয়েকটি সংস্কার এমন কি ব্রাহ্ম সমাজের ঐতিহ্যেরও বিরোধী হইয়া উঠিল। সাধারণত ভাবা হয় যে, কেশবচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কারণ অসবর্ণ বিবাহ। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বহু গুরুত্বপূর্ণ কারণও যে ছিল, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক তাঁহাদের বিচ্ছেদের কারণগুলির উপর যবনিকাপাত করিয়াছে। কিন্তু ঠিক পরবর্তীকালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে সেগুলিকে আন্দাজ করা যায়। ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্য দিয়া ঐক্য সংগতি গড়িয়া তুলিবার মহা আদর্শ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের মন যতই উদার হউক না কেন, তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য এবং ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন[১] তাঁহার প্রিয় শিষ্যের মনের মধ্যে খৃস্টান ধর্ম যেভাবে কাজ করিতেছিল, সে বিষয়ে দৃষ্টিহীন থাকা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁহার সহযোগী যখন নিউ টেস্টামেণ্টের উপর ভিত্তি করিয়া ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন,—তখন নিজের ব্যক্তিগত ত্রুটি যাহাই হউক না কেন,—তাঁহার সহিত আর কোনো সম্পর্ক রাখা সম্ভব রহিল না।

১৮৬৬ খৃস্টাব্দে এই বিচ্ছেদ ঘটিল এবং ব্রাহ্মসমাজে দলের সৃষ্টি হইল। দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের (প্রথম ব্রাহ্ম সমাজ)[২] দিকে রহিলেন এবং কেশবচন্দ্র দূরে সরিয়া গিয়া ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। উভয়ের পক্ষেই ইহা ছিল একটি কঠিন পরীক্ষা, কিন্তু বিশেষ করিয়া কেশবচন্দ্রের পক্ষে,

১ বি. মজুমদার বলেন: "দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজ থিওরির দিক হইতে ছিল সংগ্রামবাদী (Eclectic); কিন্তু কাযত ছিল বিশুদ্ধরূপে হিন্দু।" আমার বন্ধু কালিদাস নাগের সহিত ঠাকুর পরিবারের প্রচুর সৌহার্দ্য রহিয়াছে; তিনি আমাকে লিখিয়াছেন, "দেবেন্দ্রনাথ কোনো চূড়ান্ত পরিবর্তন সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি পশ্চিমের প্রতি পূর্ণ সুবিচার করিয়াছিলেন। তিনি ফেনেলন, ফিথ্টে এবং ভিক্টর কাজিনের অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তিনি আগ্রহাতিশয্যের আক্রমণশীল প্রচার বা প্রকাশকে সহ্য করিতে পারিতেন না। কেশব ছিলেন অতি বেশী উৎসাহী। তিনি তাঁহার শিষ্যদের লইয়া ভারতের সামাজিক অনর্থগুলির বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ চালাইতে চান।"

২ দেবেন্দ্রনাথের কর্মজীবন হইতে অবসর লইবার বহু পূর্বেই ইহা ঘটিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে অদূরে তাঁহার স্ব-নির্বাচিত একটি স্থানে বাস করিতে যান। তিনি ঐ বাসস্থানের নাম দেন 'শান্তি-নিকেতন' বা শান্তির আবাস-স্থল। এখানেই দেবেন্দ্রনাথ এক সম্রান্ত শুচিতার মধ্যে তাঁর অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করেন এবং ১৯০৫ খৃস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কারণ তাঁহার প্রচলিত মতের বিরোধিতা তাঁহাকে ঘৃণার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। এই কঠিন অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্বে বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না। তাই তিনি বিচ্ছেদের তিন মাস বাদে নিজের জনপ্রিয়তা হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিশ্বস্ত বন্ধুগণের সাহায্যে তাঁহার 'যীশু এবং এশিয়া ও ইউরোপ'[১] বিষয়ক বিখ্যাত বক্তৃতার একটি প্রকাশ্য ঘোষণা পাঠ করিলেন। উক্ত ঘোষণায় তিনি খৃস্টের কথা ঘোষণা করিলেন, কিন্তু এশিয়াবাসী একটি খৃস্টের—ইউরোপ যাঁহাকে বুঝে নাই। কেশবচন্দ্র খৃস্ট-ধর্ম প্রধানত ছিল নীতির সমস্যা। খৃস্টের নীতি এবং তাঁহার ত্যাগ ও তিতিক্ষার দুইটি মন্ত্র কেশবচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার মতে, এই দুই মন্ত্রের এবং খৃস্টের মধ্য দিয়া "ইউরোপ ও এশিয়া ঐক্য ও সংগতির সন্ধান করিবার শিক্ষা লাভ করিতে পারে।"

খৃস্ট-ধর্মে নব-দীক্ষিত হিসাবে তাঁহার উৎসাহ এমন উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহাকে যীশুদাস নামে ডাকিবার জন্য তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে বাধ্য করিতেন এবং কয়েকজন অন্তরংগ বন্ধুর সহিত উপবাস থাকিয়া তিনি যীশুর জন্মদিন পালন করিতেন।

কিন্তু কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতার ফলে লোকনিন্দা ঘটিল এবং "মহাজনদের" সম্পর্কে (১৮৬৬ খৃস্টাব্দে) তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা অবস্থার উন্নতি করিল না।[২] বলা যায়, ঐ বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র যীশুকে ভগবানের অন্যান্য বাণীবাহকদের পর্যায়ে ফেলিলেন। বলিলেন, এই দেবদূতগণ প্রত্যেকেই ভগবানের বিশেষ বিশেষ বাণী বহিয়া আনিয়াছেন; ইঁহাদের প্রত্যেককেই গ্রহণ করিতে হইবে, কাহারও প্রতি বিশেষ অনুরক্তি থাকা চলিবে না। কেশবচন্দ্র তাঁহার ধর্ম-মন্দিরকে সকল দেশের, সকল কালের, মানুষের নিকট অবারিত করিলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা-শাস্ত্রের মধ্যে সর্বপ্রথম বাইবেল, কোরাণ এবং জেন্দা-আভেস্তা হইতে কোনো কোনো অংশও উদ্ধৃত করিলেন।[৩] কিন্তু তাহাতেও জনসাধারণের বিরাগ হ্রাস পাইল না, বরং ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের পর অবিলম্বে কেশবচন্দ্র ধর্ম সম্বন্ধে যে এইরূপ একটি ঘোষণা দিবেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহা জানিতেন। ঐ সময়ে কেশবচন্দ্র খৃস্ট ধর্মের গভীর আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। বিশেষত, তিনি সীল রচিত *Ecce Homo* গ্রন্থটি পাঠ করিতেন। ঐ গ্রন্থটির তখন খুব চল ছিল।

২ সম্ভবত, এখানে ইহা লক্ষণীয় যে, কেশবচন্দ্র তরুণ বয়সে যে-সকল গ্রন্থ পাঠ করেন, সেগুলির মধ্যে কার্লাইল এবং এমার্সনের রচনাই তাঁহার মনে সর্বাপেক্ষা অধিক ছাপ রাখে।

৩ এই উপাসনা গ্রন্থটির নাম 'শ্লোক সংগ্রহ' (১৮৬৬)। ইহা দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত 'ব্রাহ্ম ধর্মের'

ইহার দ্বারা অবিচলিত থাকিবার মতো মানুষ ছিলেন না কেশবচন্দ্র। লোক-নিন্দার ফলে তাঁহার অনুভূতিশীল অসহায় হৃদয় অত্যন্ত বেদনা বোধ করিল। তাঁহার সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা, সংগীদের দলত্যাগ, গুরুতর আর্থিক অসুবিধা, এবং সর্বোপরি বিবেকের দংশন ও সম্ভবত নিজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয়, তাঁহার দৌর্বল্য, পাপ ও অনুতাপের অতি-সজীব বোধ-শক্তির সহিত যুক্ত হইল। এই ধরণের বোধ-শক্তি হিন্দুধর্মের অন্যান্য ধর্মাত্মাদের অধিকাংশের মধ্যেই ছিল না।[১] ইহাকে কেশবচন্দ্রের নিজস্ব বলা চলে। ফলে, তাঁহার আত্মার একটি ভয়ংকর সংকটকাল উপস্থিত হইল; এই সংকটকালটি সমস্ত ১৮৬৭ খৃস্টাব্দ ধরিয়া চলিল। দুঃখ-বেদনার মধ্যে কেশবচন্দ্র ভগবানের সহিত একাকী নিঃসংগ রহিলেন। বাহিরের কোনো সাহায্যই তাঁহার মিলিল না। কিন্তু ভগবান তাঁহার সহিত কথা কহিলেন। কেশবচন্দ্র স্বগৃহে প্রতিদিন দেবতার পূজায় পৌরোহিত্য করিতেছিলেন। ঐ সময় এক বৎসর কাল বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন, তাহার ফলে কেবল তাঁহার চিন্তার মধ্যেই সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল না, সেগুলির প্রকাশের মধ্যে-ও পরিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। ঐ পর্যন্ত ধর্মাত্মক মনীষীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রধান নীতিবাদী। ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না; তাহা তাঁহাকে কখনো আকর্ষণ করে নাই। কিন্তু এবার তিনি ভাবাবেগের স্রোত-ধারায়—প্রেম ও অশ্রুতে প্লাবিত হইলেন এবং সেই প্লাবনের মধ্যে মহানন্দে নিজেকে সমর্পণ কারলেন।

এমনি ভাবেই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে এক নূতন যুগের অরুণোদয় হইল। মহাভক্ত চৈতন্যের অতীন্দ্রিয়বাদ এবং সংকীর্তন এই ধর্মায়তনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল।

অপেক্ষা চেহারায় বড়ো হইলেও ভারতবর্ষে 'ব্রাহ্ম ধর্ম'-র অপেক্ষা ইহা কখনো বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। যাহাই হউক, কেশবচন্দ্র যখন বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্ম সমাজের আসল উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন", তখন তিনি রামমোহনের সত্যকারের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করিতেছিলেন।

১ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারই কেশবচন্দ্রের মধ্যে এই "পাপ-বোধ" লক্ষ্য করেন। দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ এবং সর্বোপরি, বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতার সহিত ইহার একটি পার্থক্য রহিয়াছে, যাহা কৌতূহলের উদ্রেক করে। পরে আমরা দেখিব, এই পাপ-বোধকে বিবেকানন্দ মানসিক দৌর্বল্যের,—একটি মানসিক ব্যাধির লক্ষণ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং এজন্য দায়ী করিয়াছেন খৃস্ট ধর্মকে। কেশবচন্দ্র নিয়মিতভাবে যে-মানসিক অবস্থার অনুশীলন করিতেন, তাহা চরম পরিণতি লাভ করে ১৮৮১ খৃস্টাব্দে প্রদত্ত তাঁহার একটি ধর্মোপদেশে—*We Apostles of the New Dispensation*" ("আমরা, নব-বিধানের ধর্ম প্রচারকগণ")। ইহাতে তিনি নিজেকে জুডাসের সহিত তুলনা করেন। এই তুলনা তাঁহার শ্রোতাদিগকে লজ্জিত বিমূঢ় করিয়া দেয়।

বৈষ্ণবীয় সংগীত যন্ত্রের সহিত সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উপাসনায় স্তোত্রপাঠ এবং মহোৎসব চলিতে লাগিল।[১] কেশবচন্দ্র সেগুলির সমস্ততেই পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন। কথিত ছিল, কেশবচন্দ্র কখনো কাঁদেন নাই। কিন্তু অশ্রুতে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। তারপর সেই ভাবের তরংগ ছড়াইয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের আন্তরিকতা, তাঁহার বিশ্ব-ঐক্যবোধ এবং তাঁহার জন-কল্যাণের প্রচেষ্টা ভারত ও ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সহানুভূতি লাভ করিল। বড়লাট-ও সহানুভূতিশীল হইলেন। ১৮৭০ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড-যাত্রা জয়যাত্রায় পরিণত হইল। কেশবচন্দ্র যে উৎসাহ-উত্তেজনা জাগাইলেন, তাহাকে কোসুথ[২] কর্তৃক সঞ্চারিত উৎসাহ-উত্তেজনার সহিত তুলনা করা চলে। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে ছয় মাসকাল ছিলেন।[৩] ঐ সময় তিনি সত্তরটি সভায় চল্লিশ হাজার মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তাঁহার শ্রোতারা তাঁহার সরল ইংরেজী ভাষা এবং সুকণ্ঠের দ্বারা মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। তাঁহাকে গ্ল্যাডষ্টোনের সহিত তুলনা করা হইল। তিনি প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক বন্ধু, প্রাচ্যে খৃস্টের প্রচারক-প্রতিনিধি বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন। কিন্তু উভয় পক্ষই সরল মনে একটি ভ্রমের বশবর্তী হইয়া কাজ করিতেছিলেন। ক্রমেই সেই ভ্রমের ক্ষয় হইল, যাহার ফলে ইংরেজরা স্পষ্ট ঠকিলেনও। কারণ, কেশবচন্দ্র তাঁহার অন্তরে গভীরভাবেই ছিলেন ভারতীয়। সুতরাং, তাঁহার পক্ষে ইউরোপীয় খৃস্ট ধর্মের তালিকাভুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যপক্ষে, তিনি ভাবিলেন, ইউরোপীয় খৃস্ট-ধর্মকে তিনি তাঁহার নিজের তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন। সরকারের সহৃদয় মনোভবের ফলে ভারত এবং ব্রহ্ম সমাজ

১ ইহা লক্ষণীয় যে, এবারে আর খৃস্টের নাম নাই। চৈতন্যের ভক্তিধর্ম কেশবচন্দ্রের ধর্মের আর এক দিক। পি, সি, মজুমদার লিখিয়াছেন যে, "এইরূপে কেশবচন্দ্র তাঁহার স্বতন্ত্র জীবনের দ্বারদেশে একদিকে খৃস্টের এবং অন্যদিকে চৈতন্যের ছায়া হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।" ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে এ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের শত্রুদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁহাদের কেহ কেহ বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া রামকৃষ্ণকে জানান যে, কেশবচন্দ্র নিজেকে "খৃস্ট এবং চৈতন্যের আংশিক অবতার" বলিয়া মনে করেন।

২ লুইস কোসুথ (Lajos Kossuth) অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে হাংগেরীয় জাতীয় আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা। তিনি ১৮০২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইতালিতে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।—অনুঃ

৩ তাঁহার সহিত গ্ল্যাডস্টোন, স্টিউআর্ট মিল, ম্যাক্স মিউলার, ফ্রান্সিস নিউম্যান এবং ডীন স্ট্যান্লীর সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় হয়।

উভয়েই উপকৃত হইল[১]। ব্রাহ্ম সমাজ এবার নব-গঠিতরূপে সিমলা, বোম্বাই, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, মুংগের প্রভৃতি স্থানে সকল দিকেই ছড়াইয়া পড়িল। এই নূতন ধর্মে ভাই ও ভগিনীদের ঐক্যবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্র একটি আদর্শ-প্রচারমূলক শফরে বাহির হইলেন। বিশ বৎসর বাদে ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীর সত্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ যে মহাভ্রমণে বাহির হন, ইহা ছিল তাহারই অগ্রদৌত্য। এই পর্যটনের ফলে নব নব দিক্-সীমা অবারিত ও প্রসারিত হইল। কেশবচন্দ্র ভাবিলেন, যে জনপ্রিয় অনেকেশ্বরবাদ ব্রাহ্ম সমাজের নিকট ঘৃণার্হ হইয়াছে, তিনি তাহার মূল অর্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহার সহিত বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের মিলন ঘটাইতে পারেন। ঐ একই সময়ে রামকৃষ্ণ এই মিলনকে আপনা হইতেই বাস্তবে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেই মিলনের সংগে সংগে একটি চিন্তামূলক মীমাংসাও ঘটাইলেন। তিনি নিজেকে বুঝাইতে বাধ্য হইলেন, অনেকেশ্বরবাদীদের দেবতারা একই ভগবানের বিভিন্ন গুণের নাম মাত্র। (অবশ্য, একথা তিনি অনেকেশ্বরবাদীদের বুঝাইতে পারেন নাই।)

তিনি "দি সান্-ডে মিরর"[২] পত্রিকায় লিখিলেন, "তাঁহাদের (হিন্দুদের) পৌত্তলিকতা ভগবানের গুণাবলীর বাস্তবীকৃত মূর্তির পূজা ছাড়া আর কিছুই নহে। যদি বস্তুগত মূর্তিকে বাদ দেওয়া যায়, সেগুলির প্রত্যেকটিই ভগবানের এক একটি গুণের প্রতীক মাত্র এবং এই প্রত্যেকটি গুণকে পৃথক পৃথক নামে ডাকা হয়। নব-বিধানে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত গুণের অধিকারীরূপে একমাত্র ভগবানকে পূজা করিতে হইবে—যে গুণগুলিকে হিন্দুরা অসংখ্য বা তেত্রিশ কোটি আখ্যা দিয়াছেন। ভগবানকে তাঁহার বিভিন্ন দিক্‌গুলির সহিত সম্পর্কিত না করিয়া তাঁহাকে অখণ্ড দেবতারূপে বিশ্বাস করা হইল এক ভাবময় ভগবানে বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাস আমাদিগকে ব্যবহারিক যুক্তিবাদিতা এবং অবিশ্বাসের দিকে চালিত করিবে। আমরা যদি ভগবানকে তাঁহার সকল প্রকাশের মধ্যেই পূজা করিতে চাই, তবে আমরা তাঁহার একটি গুণকে লক্ষ্মী, অপরটিক সরস্বতী, আরো অপর একটিকে মহাদেব ইত্যাদি বলিব।"...

১ বিশেষত কয়েকটি সংস্কারের ব্যাপারে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হইল একটি আইন সংস্কার, যাহা প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত জড়িত ছিল—ব্রাহ্ম বিবাহকে আইনসংগত বলিয়া স্বীকার করা।

২ ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ১লা আগস্ট: "দি ফিলসফি অব আইডল ওয়ারশিপ।"

ইহার অর্থ হইল এই যে, কেশবচন্দ্র বিভিন্ন ধর্মের ঐক্যবোধের বিষয়ে প্রচুর অগ্রসর হইয়াছেন—যে ঐক্যবোধ মানব-জাতির বৃহত্তর অংশকে জড়িত করিয়াছে। কিন্তু ইহা কখনো কোনোরূপ ফলপ্রসূ হইল না। কেন না, কেশবচন্দ্র চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার একেশ্বরবাদ সকল শক্তির অধিকারী হইবে, এব অনেকেশ্বরবাদ বাহিরে সম্মান ছাড়া আর কিছুই পাইবে না। অন্যপক্ষে, তিনি অদ্বৈতবাদকে এড়াইয়া চলিলেন। ব্রাহ্মদের নিকট অদ্বৈতবাদ চিরদিনই নিষিদ্ধ ছিল। ইহার ফল এই হইল যে, দুইটি বা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের দুইটি শিবিরকে পৃথক রাখিয়া ধর্মাত্মক যুক্তি মধ্যস্থিত ভেদের প্রাচীরে চড়িয়া বসিল। তখনকার অবস্থাটা ভারসাম্যের শান্ত অবস্থা ছিল না। সুতরাং কেশবচন্দ্র যে স্থানে নিজেকে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও চিরন্তন কিছু হইতে পারে না। কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, ঐ স্থান হইতেই ভগবান তাঁহাকে ভগবানের নব-প্রকটিত বিধি বা নব-বিধান ঘোষণা করার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ফলে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে[১] তিনি উক্ত নব-বিধান ঘোষণা করিলেন। ঐ বৎসরই রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যোগাযোগের সূত্রপাত হয়।

অন্যান্য বহু আত্মনিয়োজিত আইন-রচয়িতাদের মতোই, কেশবচন্দ্র দেখিলেন, নিজের মনের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সহজ নহে, বিশেষ করিয়া যখন তিনি চাহিলেন যে, তাঁহার বিধি সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে এবং সে-বিধির মধ্যে খৃস্ট, ব্রহ্ম, খৃস্টের জীবন-লীলা, যোগ, ধর্ম এবং যুক্তি, সমস্ত কিছুই থাকিবে। রামকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় দিয়া অতি সহজ ও সরলভাবে এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার এই আবিষ্কারকে কতকগুলি নীতি এবং মতবাদের মধ্যে সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি পথ দেখাইয়া, দৃষ্টান্ত দিয়া এবং উৎসাহিত করিয়াই তৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র যে সকল রীতি অবলম্বন করিলেন, সেগুলি একদিকে যেমন ছিল তুলনামূলক ধর্ম-বিদ্যালয় পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কোনো ইউরোপীয় মনীষীর রীতি, তেমনি অন্যদিকে ছিল ভারত এবং আমেরিকার ভগবৎ-প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের রীতি—অশ্রু-বিগলিত ভক্তি, প্রচার-ভ্রমণ এবং স্বীকারোক্তি।

কেশবচন্দ্র প্রিয় শিষ্যদের প্রত্যেককে এক একটি বিভিন্ন ধরণের ধর্ম সম্বন্ধে

[১] *Behold the Light of Heaven in India* নামক বক্তৃতায়।

পর্যালোচনা[১] এবং যোগাভ্যাস[২] করিবার ভার দিলেন। শিষ্যদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চরিত্র অনুসারে কোন ধর্মের আলোচনা সর্বাপেক্ষা উপযোগী হইবে, তাহা নির্বাচন করার মধ্যে কেশবচন্দ্রের শিক্ষকতার নৈপুণ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র স্বয়ং কিন্তু দুইজন পরামর্শদাতার মধ্যে দুলিতেছিলেন এবং এই দুইজন পরামর্শদাতাই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এক, রামকৃষ্ণের জীবন-দৃষ্টান্ত। রামকৃষ্ণের নিকট কেশবচন্দ্র সমাধি-বিষয়ে নির্দেশ গ্রহণ করিতেন। দুই, এ্যাংলিকান সন্ন্যাসী লিউক রিভিংটন। লিউক রিভিংটনের নিকট কেশবচন্দ্র খৃস্টান ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। লিউক রিভিংটন পরবর্তীকালে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন। তাহা ছাড়া, কেশবচন্দ্র ভগবৎ জীবন এবং পার্থিব, এই দুইটির মধ্যে কোনটি যে শ্রেয়তর, তাহা বাছিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি সরল মনে ভাবিয়াছেন যে, একটি অন্যটির ক্ষতি করিবেই এমন কোনো স্থিরতা নাই।[৩]

১ তাঁহার চারিজন নির্বাচিত শিষ্যের এক এক জন চারিটি শ্রেষ্ঠ ধর্মের এক একটির পর্যালোচনায় জীবন উৎসর্গ করেন। এবং কয়েক ক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে তন্ময় হইয়া যান। উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায়কে হিন্দু ধর্ম দেওয়া হইয়াছিল। তিনি একটি বিপুলকায় গ্রন্থ রচনা করেন: সংস্কৃত ভাষায় গীতার ভাষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবনী। সাধু অঘোর নাথ বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা করেন। তিনি বাংলা ভাষায় বুদ্ধদেবের জীবনী রচনা করেন। তিনি তাঁহার পবিত্র জীবনের যৌবনেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধদেবের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ইসলামের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কোরাণের অনুবাদ করেন এবং আরবিক ও পারসিক ভাষায় মহম্মদের জীবনী ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। অবশেষে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খৃস্ট ধর্মের আলোচনা করেন এবং 'দি অরিয়েন্টাল ক্রাইস্ট' নামে একটি পুস্তক লিখেন। আধ্যাত্মিকতায় তিনি এমন পরিপূর্ণ ছিলেন যে, তিনি যে-চিন্তাধারার জন্মদান করেন, তাহা হইতে মণিলাল সি, পারেখের ন্যায় সত্যকার ভারতীয় খৃস্টানের অভ্যুত্থান ঘটে।

২ ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে তিনি যখন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাধারণ বিধান নামে পরিচিত নূতন রীতির প্রবর্তন করেন, তখন হইতে তিনি শিষ্যদিগকে তাঁহাদের বিভিন্ন চরিত্র অনুসারে কাহাকেও ভক্তিযোগ, কাহাকেও জ্ঞানযোগ, কাহাকেও রাজযোগ উপদেশ দেন। ভগবানের বিভিন্ন নাম বা গুণ অনুসারেই পূজার বিভিন্ন রূপগুলিকে একত্রিত করা হয়। (পি, সি, মজুমদার দ্রষ্টব্য।) এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদ এবং বিভিন্ন প্রকারের যোগ সম্পর্কে আলোচনা কালে এ-বিষয়ে আমি আলোচনা করিব।

৩ রামকৃষ্ণের মতো তাঁহার শুভেচ্ছুকরাও ঈষৎ বিরাগের সহিত মন্তব্য করেন যে, এই ঋষিতুল্য মানুষটি মরিবার সময় একটি মূল্যবান গৃহ এবং সুশৃংখল কাজ-কারবার রাখিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র সামাজিক বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি আমোদপ্রমোদে যোগদান করিতেন। তাঁহার বাটিতে যে-সকল নাটক অভিনয় হইত সেগুলিতেও তিনি ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত,

কিন্তু তাঁহার মনের এই অস্পষ্টতা তাঁহার নিজের ক্ষতি করিল। এবং তাহার প্রতিক্রিয়া আসিল ব্রাহ্ম সমাজের উপর। তাঁহার "অতি স্বচ্ছ আন্তরিকতার"[১] ফলে এই প্রতিক্রিয়া আরো অধিকতর হইল। কারণ তিনি তাঁহার স্বভাবের পরিবর্তন-শীলতা এবং বহুমুখিতার কথা গোপন করিবার জন্য অতি প্রাথমিক সতর্কগুলিও অবলম্বন করিলেন না। ফলে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজে আর একটি নূতন দলের উদ্ভব হইল; কেশবচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার শিষ্য-সামন্তরাই তাঁহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, তিনি তাঁহার মূল নীতিগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন।[২] তাঁহার অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ফলে, রামকৃষ্ণ এবং ফাদার লিউক রিভিংটনের মতো কয়েক-জন মাত্র নূতন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ায় খৃস্টান ধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের স্বীকৃতির প্লাবন অবারিত হইয়া উঠিল। এই স্বীকারোক্তিগুলি ক্রমেই অধিকতর স্পষ্ট এবং গূঢ়তম খৃস্টান অধিবিদ্যা অনুসারেই হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি তাঁহার "আমি কি ভগবৎ অনুপ্রাণিত দ্রষ্টা?" (Am I an Inspired Prophet?) শীর্ষক বক্তৃতায় (জানুয়ারী, ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ) মন্ত্রস্নানের প্রচারক জন, যীশু এবং সেণ্ট পল্‌কে তিনি যেরূপ শিশুসুলভ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহারই বর্ণনা দিলেন। তাঁহার "ভারত জিজ্ঞাসা করে, খৃস্ট কে?" (India asks, Who is Christ?) শীর্ষক বক্তৃতায় (১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে ইস্টারে প্রদত্ত) তিনি ঘোষণা করেন, 'বর' আসিতেছেন। ...আমার খৃস্ট, আমার প্রিয় খৃস্ট, ভগবান ও মানুষের পুত্র[৩] খৃস্ট আসিতেছেন। "ভগবান কি একাকী আপনাকে প্রকট করেন?" শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, 'পুত্র' 'পিতার' দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন।

এপ্রিল, ১৮৮৪, দ্রষ্টব্য।) কিন্তু রামকৃষ্ণ কেবল দুঃখ প্রকাশ করিতেন যে, এইরূপ ধর্মপ্রাণ শক্তিমান পুরুষ ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্ধপথে পৌঁছিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন।

১ প্রমথলাল সেন: পূর্বোক্ত পুস্তক দ্রষ্টব্য।

২ ব্রাহ্ম সমাজের বিধিতে নির্ধারিত বয়সের পূর্বেই তাঁহার কন্যার সহিত এক মহারাজার বিবাহ দেওয়ায় এই ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এখানেও, দেবেন্দ্রনাথের বেলায় যেমনটি হইয়াছিল, তেমনি ভাবেই আসল কারণটি চাপা পড়িয়াছে। ফলে, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নামে তৃতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইল। এই ব্রাহ্ম সমাজটি আরো সংকীর্ণ এবং নিঃসংশয়ে খৃস্টান-ধর্ম বিরোধী।

৩ "আমার প্রভু যিশু!...ভারতের তরুণগণ!...বিশ্বাস করো, বিস্মৃত হইও না।...তিনি তোমাদের মধ্যে আত্মসমর্পণ রূপে, কৃচ্ছ্র সাধন রূপে, যৌগিক ক্রিয়ারূপে আবির্ভূত হইবেন।...বর আসিতেছেন।... প্রেয়সী ভারতবর্ষ তাঁহার সর্ব রত্নে-মণিমাণিক্যে ভূষিতা হউন।"

'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় লিখিত তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে তিনি আবার ঘোষণা করেন "দ্বাদশ

যাহাই হউক, এই সকল ঘোষণা সত্ত্বেও ব্রাহ্ম-সমাজের জয়ন্তী উৎসব সম্পর্কে ঐ একই সময়ে তিনি হিমালয় শিখর হইতে ভারতীয় ধর্মভ্রাতাদের নিকট তাঁহার বিখ্যাত পত্রটি (১৮৮০) লিখিতে বিরত হন নাই। পত্রে তিনি রোমান ক্যাথলিক পোপের মতো কর্তৃত্বের সহিত নব-বিধানের ভগবৎ-প্রেরিত বাণী ঘোষণা করেন,—Urbi et Orbi[২]—নগর ও পৃথিবী। লোকের ধারণা হইতে পারে যে, ঐ বাণীগুলি বাইবেল হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

"হে হিন্দুস্থান, শ্রবণ করো, তোমার ভগবান এক।"

এইভাবেই 'ভারতীয় ধর্মভ্রাতাদের নিকট পত্রখানি' আরম্ভ হইয়াছে।

"এক বিপুল আত্মা জেহোভা—যাঁহার মেঘদল বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারণ করে, 'আমি', যাঁহার কথা ঘোষণা করে আকাশ ও পৃথিবী।......

"প্রিয়তম বন্ধুগণ, সেণ্ট পলের অযোগ্য শিষ্য হইলেও আমি তাঁহারই মনোভাব এবং আংগিক লইয়া আপনাদিগকে এই পত্র লিখিতেছি।......"

তিনি আরো বলেন,—"কেবল মাত্র যীশু খৃস্টে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াই পল্ পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু একেশ্বরবাদী হিসাবে আমি আমার এই সামান্য পত্র কেবল একজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষির পদতলে বসিয়া লিখিতেছি না। স্বর্গের ও মর্ত্যের জীবিত ও মৃত, সকল ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষির পদতলে বসিয়াই আমি ইহা লিখিতেছি।"

কারণ, কেশবচন্দ্র দাবী করেন যে, অগ্রদূত খৃস্টের বাণীকে তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

"নব-বিধান হইল খৃস্টের ভবিষ্যৎ বাণীর পূর্ণতা সাধন।......সর্ব-শক্তিমান বিধাতা পূর্বে যেমন অন্যান্য দেশ ও জাতির নিকট বাণী পাঠাইয়াছিলেন, আজ তিনি তেমনি ভাবে আমাদের দেশের নিকট বাণী পাঠাইয়াছেন।"[৩]

বৎসরের অধিককাল পূর্বে ব্রাহ্ম সমাজ খৃস্টের নৈতিক দিকটিকে যেমন সুপ্রকট করিতে চাহিয়াছিল, আজো পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত তাহারা তাহাই করিতে চাহিতেছে।" (১৮৭৯ খৃস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল।) ঐ সম্পর্কে কোনো দ্বিধা বা ত্রুটি ছিল না। খৃস্টই ছিলেন ভগবান।

আবার: "কেবল মুসার বিধান? হিন্দু বিধানও সম্ভবত। ভারতে খৃস্ট হিন্দু বিধানকেই সাধন ও সফল করিবেন।"

১ এই বক্তৃতাটি অন্য একটি বক্তৃতার বাকী অংশরূপে প্রদত্ত হয়। বক্তৃতার নাম: "ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভগবৎ-দৃষ্টি।" এই বক্তৃতায় যে বিবেকানন্দ স্বর্গ ও মর্ত্যকে সংযুক্ত করিয়াছেন, সেই বিবেকানন্দের অগ্রদূতরূপে কেশবচন্দ্র বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

২ Urbi et Orbi—অর্থাৎ, নগর (রোম) এবং বিশ্ব (পোপ-শাসিত পৃথিবী)।

৩ "ভারতে স্বর্গের আলোক প্রত্যক্ষ করুন" শীর্ষক ধর্মোপদেশ দ্রষ্টব্য (১৮৭৫)।

এই মুহূর্তে কেশবচন্দ্র এমন কি একথাও বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, ভগবৎ-আত্মা যে ধাতুতে প্রস্তুত, তিনিও সেই ধাতুতেই প্রস্তুত ?

"ভগবানের আত্মা এবং আমার অন্তর সত্তা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে তোমরা যদি আমাকে দেখিয়া থাক, তবে তাঁহাকেও দেখিয়াছ।"

তবে, কেশবচন্দ্র যে সর্বশক্তিমানের কণ্ঠধ্বনি, তিনি কি ঘোষণা করিতেছেন ? কি "নূতন প্রেম, কি নূতন আশা, নূতন আনন্দ তিনি আনিয়াছেন ?" (কি মধুর এই বিধাতার অভিনব বাণী-বাহক !)

ভারতের ভগবান-রূপে জেহোভা এই নূতন মুসাকে যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিতরূপ : "এই অসীম আত্মা, যাহাকে চক্ষু দেখে নাই, কর্ণ শোনে নাই, তিনিই তোমার ভগবান, তিনি ছাড়া তোমার আর কোনো ভগবান নাই। এই সর্বোচ্চ বিধাতার বিরুদ্ধে ভারতীয়রা দুইটি কৃত্রিম দেবতাকে স্থাপন করিয়াছে— একটি দেবতা, যাঁহাকে অজ্ঞ মানুষরা সৃষ্টি করিয়াছে, অপর একটি দেবতা, যাঁহাকে মহর্ষিগণ তাঁহাদের ব্যর্থ স্বপ্নে কল্পনা করিয়াছেন। এই উভয় দেবতাই আমাদের ভগবানের শত্রু।[১] এই উভয় দেবতাকেই অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে।··· ···কোনো মৃত বস্তু, মৃত ব্যক্তি বা মৃত চিন্তাকে পূজা করিও না।······পূজা করো জীবন্ত আত্মাকে, যে-আত্মা বিনা চক্ষুতে সকল কিছুকে লক্ষ্য করেন।···ভগবানের সহিত এবং পরলোকগত সাধু-সন্তদের সহিত তোমার আত্মার যোগাযোগই তোমার সত্যকারের স্বর্গ হইবে এবং আর কোনো স্বর্গ তোমার থাকিবে না······ আত্মার আধ্যাত্মিক উল্লাসের মধ্যেই স্বর্গের আনন্দ ও শুদ্ধিকে অনুভব করো।··· তোমার স্বর্গ তোমা হইতে দূরে নহে, তোমারই মধ্যে। সকল দেশের, সকল কালের, সকল ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, সাধু-সন্ত, শহীদ, মুনি-ঋষি, ধর্ম-প্রচারক এবং মানব-হিতৈষী—মানব পরিবারের সকল প্রবীণদিগকেই জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সম্মান-শ্রদ্ধা করিতে এবং ভালোবাসিতে হইবে। তোমাদের স্নেহ-শ্রদ্ধার উপর কেবল ভারতীয় সাধুরাই একাধিপত্য করিবেন, তাহা নহে। সকল ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাকেই তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান দান করো। পয়গম্বরের পদতলে বসিয়া আপনাকে নত

১ নিন্দিত প্রথম দেবতাটি কি সহজেই তাহার নির্দেশ দেওয়া চলে, কাঠ, ধাতু এবং প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলি। দ্বিতীয় নিন্দিত দেবতাটির আরো নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, "আধুনিক সংশয়বাদ, অবাস্তব চিন্তা, অবচেতন উদ্‌বর্তন এবং অন্ধ জীব-কণিকা ইত্যাদির অদৃশ্য পুতুলগুলি।" ইহা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক যুক্তিমূলক অদ্বৈতবাদী বুদ্ধিধর্মিতা। কেশবচন্দ্র যে সত্যকারের বিজ্ঞানকে কখনো নিন্দা করেন নাই, তাহা তাঁহার "উনবিংশ শতাব্দীর ভগবৎ-দৃষ্টি" শীর্ষক বক্তৃতায় (১৮৭৯) প্রকাশ পাইয়াছে।

করো। তাঁহাদের রক্ত-মাংস তোমাদের রক্ত-মাংসে পরিণত হউক।...তাঁহাদের মধ্যে তোমরা জীবন লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে তাঁহারা চিরকালের জন্য জীবিত হউন!"

ইহার অপেক্ষা সুন্দর কিছু কল্পনা করা যায় না। ইহা সকল প্রকার একেশ্বরবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ। ইহা ইউরোপের স্বাধীন একেশ্বরবাদের অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছে। ইহার মধ্যে কোনো ভগবৎ-প্রেরণালব্ধ ধর্মের প্রতি বাধ্যতামূলক আনুগত্য নাই। ইহা সমগ্র পৃথিবীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সকল শুদ্ধাত্মার প্রতিই অবারিতভাবে বাহু বিস্তার করিয়াছে। কারণ, কেশবের বাণী ভগবৎ-প্রেরণার চূড়ান্ত প্রকাশ বলিয়া দাবী করে নাই। "ভারতীয় শাস্ত্র সমাপ্ত হয় নাই।[1] প্রতি বর্ষেই ইহাতে নূতন অধ্যায় যোজিত হইতেছে।...ভগবৎ-প্রেমে ও জীবনে আরো অগ্রসর হও!...স্বয়ং ভগবান ভিন্ন কে বলিতে পারে, ভগবান আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের নিকট কী রহস্য উদ্ঘাটিত করিবেন?"

কিন্তু পূর্ব বৎসর কেশবচন্দ্র খৃস্টের পদতলে যেরূপ হীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত এই স্থির প্রশান্ত কণ্ঠে ধ্বনিত উন্মুক্ত উদার একেশ্বরবাদের সামঞ্জস্যবিধান কীরূপে করা যাইতে পারে?[2]

"আমি তোমাদিগকে অবশ্যই বলিব যে...যীশুর লীলাকাহিনীর সহিত আমার যোগাযোগ রহিয়াছে এবং তাহাতে আমি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছি। যীশু যে-অপব্যয়ী সন্তানের কথা বলিয়াছেন, আমি সেই অপব্যয়ী সন্তান।

"আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছি। না, আমি আমার প্রতিপক্ষের অধিকতর সন্তোষ ও গৌরব বিধানের জন্য বলিব,... আমি জুডাস্, আমিই সেই নীচ অধম মানুষ, যীশুর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল।...আমি সেই জুডাস্, যে সত্যের নিকট অপরাধ করিয়াছিল। কিন্তু, যীশু, তিনি আমার অন্তরে রহিয়াছেন!..."

ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা, যাঁহারা এই পর্যন্ত[3] তাঁহাদের নেতাকে অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, প্রকাশ্য সভায় এই স্বীকারোক্তি তাঁহাদের মধ্যে কীরূপ ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া ঘটাইয়াছিল, তাহা কল্পনা করা যায়।

১ ইহার মধ্যে বিবেকানন্দের একটি প্রিয় মতের পরিচয় মিলিতে পারে।

২ "আমরা, নব বিধানের প্রচারকগণ" (১৮৮১) শীর্ষক ধর্মোপদেশ হইতে।

৩ এই জন্যেই (আমি যতদূর জানি) তাঁহারা তাঁহাদের রচনাগুলিতে কেশব সম্পর্কে আলোচনাকালে এইরূপ কোনো ঘোষণার উল্লেখ না করিতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।

কিন্তু কেশব তখনো নিজের সহিত বিতর্ক করিতেছিলেন। তিনি খৃস্টের বিশ্বাসে বিশ্বাসী, কিন্তু তথাপি নিজেকে খৃস্টান[১] বলিতে তাঁহার আপত্তি। তিনি খৃস্ট, সক্রেতিস এবং চৈতন্যকে তাঁহার নিজ দেহ বা মনের অংশরূপে কল্পনা করিয়া এক অদ্ভুত ভাবে খৃস্টের সহিত সক্রেতিস ও চৈতন্যের মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।[২] যাহাই হউক, কেশবচন্দ্র খৃস্টান ধর্মের শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানগুলিকে ভারতীয় আচার ও প্রথার উপযোগী করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে প্রবর্তন করিলেন। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে ৬ই মার্চ তারিখে তিনি রুটি ও মদের পরিবর্তে ভাত ও জলের[৩] দ্বারা পুণ্য অনুষ্ঠান এবং তিন মাস বাদে মন্ত্রস্নানের অনুষ্ঠান সম্পাদন করিলেন। এবং ইহার মধ্য দিয়া তিনি নিজেই 'Father', 'Son' এবং 'Holy-Ghost'-এর অর্চনা করিবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন।

অবশেষে ১৮৮২ খৃস্টাব্দে তিনি চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। খৃস্টান ধর্মের দুর্বোধ্য বিষয়গুলির মধ্যে খৃস্টান ট্রিনিট সর্বদা এশিয়ার পক্ষে ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অন্তরায়। ইহাকে এশিয়ার লোকে ঘৃণা এবং বিদ্রূপের চক্ষে দেখিত।[৪] কেশবচন্দ্র এই খৃস্টান ট্রিনিটিকে কেবল স্বীকার এবং গ্রহণ করিলেন না, তিনি

---

১ খৃস্টকে সম্মান করো, কিন্তু জনসাধারণ যাহাকে 'খৃস্টান' বলে, তাহা হইও না।...খৃস্ট খৃস্টান ধর্ম নহে।...সংকীর্ণ খৃস্টান ধর্মের জনপ্রিয় সাধারণ রূপগুলিকে ছাড়াইয়া খৃস্টের বিশালতার মধ্যেই লীন হইতে আকাঙ্ক্ষা করো!"

এই সময়েই লিখিত "Other Sheep have I" নামক প্রবন্ধে :

"আমরা কোনো খৃস্টান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহি। আমরা 'খৃস্টান' নাম অস্বীকার করি। খৃস্টের ঠিক পরবর্তী শিষ্যরা কি নিজেদিগকে খৃস্টান বলিয়া অভিহিত করিতেন?...যাঁহারাই ভগবানে বিশ্বাস করেন এবং খৃস্টকে 'ভগবানের পুত্র' হিসাবে গ্রহণ করেন, তাঁহারাই ভগবানের মধ্যে খৃস্টকে সহধর্মীরূপে লাভ করেন...। And other sheep I have—এই সুপরিচিত কথাগুলি যথেষ্ট স্পষ্ট। নব বিধানের সদস্য আমরা হইলাম ঐ মেষের অন্য দল। মেষপালক আমাদিকে জানেন।...খৃস্ট আমাদিগের সন্ধান পাইয়াছেন, আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন।...ইহাই যথেষ্ট। কোনো খৃস্টান কী খৃস্টের অপেক্ষা বড়ো?"

২ "প্রভু যীশু আমার ইচ্ছাশক্তি, সক্রেতিস আমার মস্তিষ্ক, চৈতন্য আমার হৃদয়, হিন্দু ঋষিরা আমার আত্মা, মানব-প্রেমিক হাউয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।"

৩ কেশবচন্দ্র সেন্ট লিউক হইতে একটি শ্লোক পাঠ করেন এবং প্রার্থনা করেন যে, 'হোলি স্পিরিট' যেন তাঁহাদের অমার্জিত বস্তুগত সত্তাকে শুদ্ধকারী আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপায়িত করেন, যাহার ফলে ঐ আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত ঋষি ও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাদের রক্তমাংস যেমন খৃস্টের মধ্যে মিলিত ও মিশ্রিত হইয়াছিল, তেমনি ভাবেই আমাদের দেহের সহিত মিলিত একাত্মিত হয়।"

৪ বেদান্তবাদী ভারতের পক্ষে ইহার কারণ কি তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারণ, ভারতবর্ষের-ও নিজস্ব একটি 'ট্রিনিটি' রহিয়াছে—সৎ, চিদ্ ও আনন্দ—এবং এই তিনটিই একত্রে 'সচ্চিদানন্দ'।

সানন্দে ইহাকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিলেন[১] এবং ইহার দ্বারা জ্ঞানলাভ-ও করিলেন। খৃস্টান ধর্মের এই দুর্বোধ্য অংশটিকে কেশবচন্দ্র সমগ্র খৃস্টান অধিবিদ্যার, বিশ্ব সম্পর্কে পরমতম ধারণার…" ভিত্তিপ্রস্তর মনে করিতেন—এবং নিতান্ত অকারণে-ও নহে—খৃস্টান অধিবিদ্যার সেই রত্নভাণ্ডারের, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্রে-সাহিত্যে—(সমগ্র মানবতার) দর্শনে, ধর্মতত্ত্বে, কাব্যে…সমস্ত পৃথিবীর ধর্মচেতনার উচ্চতম প্রকাশের মধ্যে…যতো শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল সমস্তই সুরক্ষিত রহিয়াছে।" আমার বিশ্বাস, একটি রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ হইতেই, কেশবচন্দ্র এই তিনটি 'পুরুষের' সুনির্দিষ্ট একটি সূত্র-ও দেন।[২] এখন খৃস্টানধর্ম হইতে আর কোনো কিছু কি কেশবচন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত ?

পারিত। একটি মাত্র বস্তু—সম্পূর্ণ সমগ্র একটি বস্তু,—তাঁহার নিজের মতবাদ

১ '*That Marvellous Mystery*, '*the Tinity*', শীর্ষক ১৮৭২ খৃস্টাব্দের একটি বক্তৃতায়।

২ "এখানে আপনারা একটি ত্রিভুজাকার গঠন দেখিতেছেন।…শীর্ষদেশে রহিয়াছেন স্বয়ং ভগবান জেহোভা।…তাঁহা হইতে পুত্র অবতরণ করিয়াছেন…এবং অপর প্রান্তে মানবতার ভূমিতল স্পর্শ করিয়াছেন…এবং অতঃপর 'হোলি গোস্টে'র শক্তির দ্বারা অধঃপতিত মানবতাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকটে তুলিয়া আনিয়াছেন। ঐশীভাব যখন মানবতার দিকে অবতরণ করিয়াছে, তখন তাহা হইয়াছে 'পুত্র' (Son) এবং ঐশীভাব যখন মানবতাকে স্বর্গে উত্তীর্ণ করিয়াছে, তখন তাহা হইয়াছে পবিত্রাত্মা (Holy Ghost) ইহাই হইল মোক্ষের সমগ্র দর্শন।…'স্রষ্টা, শিক্ষাদাতা, শুদ্ধিদাতা'—আমি আছি, আমি ভালোবাসি, রক্ষা করি, স্থির ভগবান, অস্থির ভগবান, প্রত্যাবর্তনশীল ভগবান।"—কেশবচন্দ্র।

ক্যাথলিক অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে প্রাচীন প্রবন্ধাবলী তুলনীয় :

"যে ক্রিয়ার দ্বারা 'পিতা' (Father) 'পুত্র'কে (Son) উৎপাদন করেন, তাহা নির্গমন কথাটির দ্বারা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। *Exivi Patre.* 'হোলি গোস্ট' প্রত্যাবর্তনের পথে জন্মলাভ করেন।—উহা ঐশী পথ এবং এ-পথ ভগবানের মধ্যেই রহিয়াছে; এই পথেই ভগবান নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসেন।—অনুরূপভাবে, আমরাও সৃষ্টির দ্বারা ভগবানের মধ্য হইতে বাহিরে আসি। পুত্রের দ্বারাই পিতা সৃজনগুণের অধিকারী হন। পুনরায় আমরা 'হোলি গোস্টের' (পবিত্র আত্মার) মধ্য দিয়া তাঁহার করুণায় তাঁহার নিকটেই ফিরিয়া যাই।

(P. Claude Seguenot : *Conduite d' Orison*, 1684. Quoted by Henri Bremond. *La Metaphysique des Saints*, 1, pp. 116-117).

আশ্চর্য মনে হইলেও সম্ভবত কেশবচন্দ্র উপাসনা সংক্রান্ত বেরুলিয়ান বা সালেসিয়ান দর্শন জানিতেন।* ১৮৮১ খৃস্টাব্দে ৩০শে জুনের 'মরুস্নানের প্রচারক জনের বৈরাগ্য' (Renunciation of John the Baptist) শীর্ষক আলোচনায় তিনি মাদাম দ্য শ াতাল-কে লিখিত ফ্র াসোআ দ্য সালের পত্র উদ্ধৃত করেন।

* বেরুলিয়ান বা সালেসিয়ান অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর ফরাসী ক্যাথলিক অতীন্দ্রিয়বাদী বেরুল (Berulle) বা ফ্র াসোআ দ্য সালে (Francois do Sales) সম্পর্কিত।

ও বাণী—ভারতীয় 'নব-বিধান'। তিনি তাহাকে কখনো পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি খৃস্টকে গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, তবে তৎপরিবর্তে খৃস্টকে আবার ভারতীয় এবং কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরবাদিতাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

"পৌত্তলিকতা, বিদূরিত হও! পৌত্তলিকতার যাঁহারা প্রচারক, তাঁহারা বিদায় লউন।" (এই কথাগুলি পাশ্চাত্যের উদ্দেশে বলা হইয়াছিল)। খৃস্ট হইলেন শাশ্বত শব্দ। "ঘুমন্ত বাণী রূপে খৃস্ট জগৎপিতার বক্ষে নিষ্ক্রিয় শক্তিরূপে দীর্ঘকাল শায়িত ছিলেন—দীর্ঘকাল,আমাদের এই পৃথিবীতে আগমন করার পূর্বেও বহুকাল।" তিনি দেহ ধারণ করিবার পূর্বে গ্রীসে, রোমে, মিশরে, ভারতে,—ঋগ্‌বেদের কবিদের মধ্যে কনফুসিয়াসের[১] মধ্যে এবং শাক্যমুনির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "নববিধানের" ভারতীয় প্রচারকের ভূমিকাটি ছিল খৃস্টের সেই সত্য এবং সর্বব্যাপী অর্থটিকে ঘোষণা করা। কারণ 'পুত্রের' (Son) আগমনের পরে আসিয়াছেন 'আধ্যাত্মিক শক্তি' (Spirit) এবং "নববিধানের এই উপাসনা মন্দির সেই 'পবিত্র আত্মার' (Holy Ghost) অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র" এবং এইরূপে ইহা পুরাতন বিধান (Old Testament) এবং নূতন বিধানকে (New Testament) সম্পূর্ণ করিয়াছে।

এবং এইরূপেই উপর ও নিচ হইতে বহু কঠিন আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও এই গগনস্পর্শী বিরাট ঈশ্বরবাদের এমন কোনো অংশ বিনষ্ট বা স্থানভ্রষ্ট হয় নাই, যাহাতে এই নগরদুর্গকে বিন্দুমাত্র দুর্বল করিতে পারে। একটি প্রচণ্ড চিন্তা-প্রচেষ্টার দ্বারা কেশবচন্দ্রকে খৃষ্টকে তাঁহার নববিধানের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার 'নববিধানকে' খৃস্টের নামে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, পশ্চিম দেশীয় খৃস্টানদের নিকট খৃস্টের বাস্তবিক অর্থকে উদ্ঘাটিত করিবার ভার তাঁহার উপর রহিয়াছে।

কেশবচন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে যে বাণী দিয়াছিলেন—'ইউরোপের নিকট এশিয়ার বাণী' (Asia's Message to Europe, 1883)—তাহাতে তাঁহার এই উদ্দেশ্য তিনি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। "দলগত, বিভক্ত, রক্তাক্ত ইউরোপ, তোমার সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসের অসি কোষবদ্ধ কর! উহাকে পরিত্যাগ কর! এবং বিধাতাপুত্র খৃস্টের নামে সত্যকারের 'ক্যাথলিক' বিশ্বব্যাপী ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হও!"

"খৃস্টান ইউরোপ খৃস্টের বাণীর অর্ধেকখানিই বোঝে নাই। ইউরোপ বুঝিয়াছে,

---

১ কনফুসিয়াস (খৃস্ট পূর্ব ৫৫০—৪৭৮ অব্দ) চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং ধর্মপ্রচারক। তাঁহার প্রকৃত নাম কুং ফুৎসে। লাতিন ভাষায় তাঁহাকে বলা হয় কনফুসিয়াস।—অনুঃ

খৃস্ট এবং ভগবান এক ; কিন্তু বোঝে নাই যে, খৃস্ট এবং মানব জাতি অভিন্ন। এই দুর্বোধ্য বিরাট প্রহেলিকাকেই 'নববিধান' বিশ্বের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছে : কেবল ভগবানের সহিত মানুষের পুনর্মিলন নহে, মানুষের সহিত মানুষের-ও !... এশিয়া ইউরোপকে বলিতেছে, "ভগিনী, তুমি খৃস্টের সহিত এক হও। যাহাই শিব, সত্য, সুন্দর—হিন্দু এশিয়ার বিনয়, ইসলামের সততা, বৌদ্ধধর্মীর ত্যাগ, তিতিক্ষা—সমস্তই যাহা কিছু পবিত্র, তাহাই খৃস্টের মধ্যে রহিয়াছে।..."

তারপর এশিয়ার নবরোমের নূতন পোপ প্রায়শ্চিত্তের সুন্দর সংগীত ধ্বনিত করিয়াছেন।[১]

কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যকারের পোপ। সুতরাং পুনর্মিলিত মানব জাতির ঐক্য তাঁহার মতবাদ অনুসারেই হইতে হইবে ; ঐ ঐক্যকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি বজ্র হস্তে সর্বদা প্রস্তুত রহিলেন ; ভগবানের 'ঐক্য'—একেশ্বরবাদী মতবাদ সম্পর্কে সকল প্রকার আপোষের মীমাংসাকেই তিনি অস্বীকার করিলেন।

"বিজ্ঞান এক, ধর্ম এক।"

তাঁহার শিষ্য, বি. মজুমদার, তাঁহাকে খৃস্টের তিরস্কার বাক্যগুলি ব্যবহার করাইলেন এবং তাহা আরো কঠোরভাবে :

"একটি মাত্র পথ রহিয়াছে। স্বর্গ-প্রবেশের জন্য কোনো খিড়কির দরজা নাই। সামনের দরজা দিয়া যে প্রবেশ করে না, সে তস্কর, সে দস্যু।" স্মিত হাস্যের সহিত রামকৃষ্ণ যে করুণা-মাখা কথাগুলি বলিতেন, সে ছিল ইহার ঠিক বিপরীত।[২]

১ "এবং প্রায়শ্চিত্তের এই নূতন সংগীত এখন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে পরমোৎসাহে গীত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ আত্মা, ন্যায় ধর্মাচরণের বহুবর্ণে স্ব স্ব বিচিত্র জাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া জগৎপিতার সিংহাসনের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিবে ; শান্তি ও আনন্দে অনন্তকালের জন্য বিশ্ব পূর্ণ হইয়া থাকিবে।"

২ কোনও কোনও ধর্ম-সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান তরুণ বিবেকানন্দের মনে ক্রুদ্ধ ঘৃণার উদ্রেক করে। ফলে তিনি তাঁহার অভ্যস্ত অধৈর্যের সংগে সেগুলির নিন্দা করেন। রামকৃষ্ণ তখন সস্নেহে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলেন, "ভাখো বাপু, প্রত্যেক বাড়ীরই একটা খিড়কির দরজা থাকে। কারও যদি খিড়কির পথে ঘরে ঢুকিবার ইচ্ছা হয়, তবে তাহার সে অধিকার থাকিবে না কেন ? তবে, অবশ্য, এ বিষয়ে আমি তোমার সংগে একমত যে, সামনের দরজাটাই সব চেয়ে প্রশস্ত।"

রামকৃষ্ণের জীবনীকার আরও বলেন যে, বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম হিসাবে যে ক্ষুদ্র জীবন-যাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন, রামকৃষ্ণের এই সহজ সরল কথাগুলি, তাহাতে পরিবর্তন আনে। দুর্বলতা ও শক্তির (পাপ ও পুণ্যের নয়) উদার সত্য আলোকে মানুষকে কেমন করিয়া চিনিতে হয়, রামকৃষ্ণ নরেনকে তাহাও শিক্ষা দিয়াছিলেন। (স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, প্রথম খণ্ড, ৪৭ পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য)

বিশ্ববাদী ধর্মের সহিত ঐক্যবাদী নিয়ম শৃংখলার অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের সংগতি নাই, তাই অনেক সময় ঐ প্রয়োজন ভুলবশত আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইয়া পড়ে। তাই অনেক সময় ঐ প্রয়োজনই কেশবচন্দ্রকে তাঁহার শেষ জীবনে নবসংহিতার[১] আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করিতে প্ররোচিত করে। (২রা সেপ্টম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে)। এই নব-সংহিতার মধ্যে ছিল—যাহাকে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "ভারতীয় নবধর্মের অন্তর্গত আর্যগণের জাতীয় অইন।····· সুসংস্কৃত হিন্দুদের প্রয়োজন ও চরিত্রের উপযোগী এবং জাতীয় স্বভাব ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়া গৃহীত ঈশ্বরের নীতি-নির্দেশ।" বস্তুত ইহার মধ্যে ছিল একটি ঐক্যবাদ···এক ভগবান, এক শাস্ত্র, এক দীক্ষা, এক বিবাহ—পরিবারের জন্য, গৃহস্থের জন্য,ব্যবসায়ের জন্য, শিক্ষার জন্য, আমোদ-প্রমোদের জন্য, দাতব্যের জন্য, আত্মীয়তার জন্য সকল কিছুর জন্য একটি লিপিবদ্ধ নির্দেশনামা। কিন্তু কেশবচন্দ্রের এই নীতি নির্দেশনামা ছিল বিশুদ্ধ রূপে কাল্পনিক এবং এমন একটি ভারতের জন্য এখনও যাহার জন্ম হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও যাহার জন্ম সম্পর্কে সন্দেহ রহিয়াছে।

অনুরূপ ভারত কখনো জন্ম লাভ করিবে, কেশবচন্দ্রের নিজেরও কি সেরূপ কোনো স্থির বিশ্বাস ছিল? এই স্বেচ্ছাকৃত যুক্তির সমগ্র প্রাসাদটি একটি অনিশ্চিত ভিত্তির উপর ছিল প্রতিষ্ঠিত, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে ছিল একটা ব্যবধান। তাই কেশবচন্দ্রের অসুস্থতার[২] সংগে সংগেই যোগসূত্র শিথিল হইয়া গেল। কে তাঁহার আত্মার অধিকারী হইবেন, কালী না খৃস্ট? তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় রামকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রনাথ এবং কলিকাতার বিশপ সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। (দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন কেশবচন্দ্রের পুরাতন গুরু এবং বর্তমানে তাঁহার সহিত কেশবচন্দ্রের বিবাদ-বিরোধ ছিল না।) ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে কেশবচন্দ্র মা কালীর একটি নূতন মন্দির উদ্বোধনের জন্য শেষবারের মতো যান, কিন্তু আবার ৮ই জানুয়ারী তারিখে তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় তাঁহারই অনুরোধক্রমে তাঁহার একজন শিষ্য কর্তৃক গেথসেমানে[৩] খৃস্টের বেদনা সম্পর্কে একটি স্তোত্র গীত হইয়া থাকে।

১ সংহিতার অর্থ নানা বিষয়ক সংকলন।

২ বহুমূত্র রোগে। ইহা বাংলাদেশের অন্যতম অভিশাপ। এই রোগে বিবেকানন্দও মারা যান।

৩ গেথসেমানে—জেরুজালেমের পূর্বাংশে অবস্থিত একটি উদ্যান। এখানে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বে সশিষ্য খৃস্ট অবস্থান করিতেছিলেন।—অনুঃ

এইরূপ অবিরাম মানসিক দোলায়মানতার মধ্যে কোনো সহজ সরল জাতির পক্ষে পথের সন্ধান পাওয়া ছিল অসম্ভব। কিন্তু ইহাই কেশবচন্দ্রকে আমাদের নিকটতর করিয়াছে। উহাই আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছে। আমরা তাঁহার অত্যন্ত অন্তরংগ চিন্তাগুলিকেও বুঝিতে পারিয়াছি, বুঝিতে পারিয়াছি উহার সংগে তাঁহার কী মানসিক অন্তর্দাহ-ই না রহিয়াছে। সেই সংগে ইহাও সত্য যে, রামকৃষ্ণের সহৃদয় অন্তর্দৃষ্টি অন্যান্য সবার অপেক্ষা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ভগবানের সন্ধানে ক্ষীণ অবসন্ন এই মানুষটির—যাঁহার দেহ অদৃশ্য বিধাতার[১] করাল খর্পরে পড়িয়াছে,—তাঁহার গোপন ট্র্যাজিডিটি কি। কিন্তু নেতৃত্ব করিবার পথ দেখাইবার জন্য যিনি জন্মিয়াছেন, নিজের সমস্ত যন্ত্রণা-বেদনা তিনি নিজের মধ্যে সংহত প্রচ্ছন্ন রাখিলেও জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁহার এইরূপ দুর্বল ও দোলায়মান অনিশ্চয়তাকেই ব্রাহ্ম-সমাজ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল। উহার ফলে ব্রাহ্ম-সমাজের আধ্যাত্মিক সম্পদ বর্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে, চিরদিনের জন্য যদি না হয়, তবে দীর্ঘদিনের জন্য, ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃত্ব দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। আমরাও ম্যাক্স্ মুলারের[২] সহিত প্রশ্ন করিতে

১ রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের শেষ মর্মস্পর্শী সাক্ষাৎকার এবং ঐ মুমূর্ষু মানুষটির গোপন ক্ষতে শান্তিদায়ক প্রলেপের মতো রামকৃষ্ণের জ্ঞান-গম্ভীর বাণী, সে সব সম্পর্কে আমরা পরে আরো আলোচনা করিব।

২ কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কেশবচন্দ্রের স্থান অধিকার করিয়া ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার গুরু কেশবচন্দ্রের মতোই প্রতাপচন্দ্রও খৃস্টকেন্দ্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহাকে ম্যাক্স্ মুলার প্রশ্ন করেন যে, ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশ্যভাবে 'খৃস্টান' নাম গ্রহণ করিয়া জাতীয় ভিত্তিতে একটি খৃস্ট ধর্ম-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছেন না কেন? প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং তাঁহার একদল তরুণ শিষ্যের মধ্যে এই প্রবন্ধটি সাড়া আনে। এই শিষ্যদের অন্যতম হইলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনি অত্যন্ত স্মরণীয় ব্যক্তি, তাঁহার সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা উচিত। তিনি 'নব বিধান' ধর্ম প্রতিষ্ঠান হইতে প্রথমে 'অ্যাংলিকান' এবং পরে 'রোমান ক্যাথলিক কমিউনিয়নে' যোগদান করেন। কেশবচন্দ্রের জীবনীকার মণিলাল পারেখ-ও অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনিও পরে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের দুইজনের দৃঢ় ধারনা যে, কেশবচন্দ্র আরো কয়েক বৎসর জীবিত থাকিলে তিনি রোমান চার্চে যোগদান করিতেন। মণিলাল পারেখ বলেন যে, "কেশবচন্দ্র নীতির দিক হইতে ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট এবং কার্যের দিক হইতে রোমান ক্যাথলিক···আধ্যাত্মিকতায় তিনি ছিলেন খৃস্টান; এমন কি তিনি মনেটিজমে (হোলি স্পিরিটের সর্বশ্রেষ্ঠতায়) বিশ্বাসী ছিলেন।" তবে আমার মতে, কেশবচন্দ্র তাঁহাদেরই একজন ছিলেন, যাঁহারা অর্ধোন্মুক্ত দ্বারপথে প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, প্রবেশ করেন না। কিন্তু তাঁহার পরবর্তীরা যে সেই দরজাকে উদ্দাম উন্মুক্ত করিয়া দেন, উহাই ছিল মারাত্মক।

পারি, কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরবাদের যুক্তিগত ফল কি খৃষ্টানধর্মের মধ্যেই মিলিত না? ঠিক এই প্রশ্নই কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার বন্ধু এবং শত্রুরা সকলেই অনুভব করিয়াছিল।

ইংল্যাণ্ড এবং পাশ্চাত্য ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত ভারতবর্ষ, এই উভয় স্থানের শ্রেষ্ঠ চিন্তার প্রতিনিধিগণ কেশবচন্দ্রের শোকে এবং শেষ-কৃত্যে ঐক্যবদ্ধ হইলেন। "কেশবচন্দ্র ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐক্যের বন্ধন।" এই বন্ধন একবার বিচ্ছিন্ন হইলে পুনরায় সংযুক্ত করা অসম্ভব। কেশবচন্দ্রের পরে ভারতীয় ধর্ম-নেতাদের আর কেহই সমগ্র মন ও মস্তিষ্ক দিয়া পশ্চিমের চিন্তা ও ভগবানকে এমন অকপটভাবে গ্রহণ করেন নাই।[১] সুতরাং ম্যাক্স মুলার যথার্থই লিখিয়াছেন: "ভারতবর্ষ তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে তাঁহার প্রতিভা স্বীকার করিলেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, কেশবচন্দ্রের শিষ্যসংখ্যা তাঁহার যোগ্যতার অনুরূপ ছিল না।[২]

বাস্তবিক পক্ষে, কেশবচন্দ্র তাঁহার স্বদেশের জনসাধারণের অন্তরাত্মা হইতে ছিলেন বহুদূরে। ইউরোপের খৃস্ট এবং আদর্শবাদে পরিপুষ্ট তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তির বিশুদ্ধ উর্ধ্বলোকে তিনি জনসাধারণকে অবিলম্বে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। সামাজিকতার ক্ষেত্রেও, রামমোহন রায় ছাড়া ভারতের অগ্রগতির জন্য তাঁহার কোনও পূর্ববর্তীই এতোখানি করেন নাই; কিন্তু তখন যে জাতীয় চেতনা উত্তেজিত আগ্রহে দেশময় জাগ্রত হইতেছিল, কেশবচন্দ্র তাহার স্ফীত স্রোতধারার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কেশবচন্দ্রের মুখামুখী দাঁড়াইল ভারতের ত্রিশ কোটি দেবতা এবং ত্রিশ কোটি প্রাণী,—যাঁহাদের মধ্যে সেই দেবতারা মূর্তিগ্রহ করিয়াছেন—মানসিক আদর্শ ও স্বপ্নের এক সমগ্র বিপুল অরণ্য। এই অরণ্যের মধ্যে কেশবচন্দ্রের পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগী তাঁহাকে দিকভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট করিল।

১ 'দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' পত্রিকা কেশবচন্দ্রের মধ্যে "ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা এবং খৃস্টান সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসলকে" সম্মান জানাইলেন। এবং 'দি হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা সম্মান জানাইলেন "পশ্চিমের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু পরিণতিকে।"

ভারতীয় দৃষ্টির দিক হইতে এই ধরণের প্রশংসা নিন্দারই নামান্তর মাত্র ছিল।

২ দি হিন্দু পেট্রিয়ট। ১৯২১ খৃস্টাব্দে তিনটি ব্রাহ্ম-সমাজের সদস্য সংখ্যা একত্রে ৬৪০০-র অধিক ছিল না (ইহার মধ্যে ৪০০০ ছিল বাংলা, আসাম এবং বিহার-উড়িষ্যায়)। উক্ত সদস্য সংখ্যা আর্যসমাজের বা 'রাধাস্বামী সৎসংর্গের মতো বিশুদ্ধ অতীন্দ্রিয়বাদী সম্প্রদায়গুলির সদস্যসংখ্যার তুলনায় নগণ্য মাত্র। আর্যসমাজ সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব।

তিনি ত্রিশ কোটি মানুষের ত্রিশ কোটি দেবতাকে তাঁহার ভারতীয় খৃস্টের মধ্যে আত্মহারা হইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। কিন্তু সে আমন্ত্রণ ব্যর্থ হইল, কেহ যে শুনিল, এমন মনে হইল না।

* * *

এমন কি কেশবচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই ভারতীয় ধর্মের চিন্তাধারা কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় সমাজ গড়িয়া তুলিল এবং পশ্চিমীকরণের সকল চেষ্টার প্রতিরোধ করিতে লাগিল। এই নূতন প্রতিষ্ঠানের পুরোভাগে রহিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ দয়ানন্দ সরস্বতী[১] (১৮২৪-১৮৮৩)।

সিংহস্বভাব এই মানুষটি ছিলেন তাঁহাদেরই একজন, যাঁহাদিগকে ভারতের বিচার করিতে গিয়া ইউরোপ প্রায়ই ভুলিয়া যায়। তবে ইউরোপ একদিন তাঁহার স্বমূল্যে তাঁহাকে স্মরণ করিতে বাধ্য হইবে, কারণ, দয়ানন্দ ছিলেন সেই ক্বচিৎদৃষ্ট মহাপুরুষ, যাঁহাদের মধ্যে নেতৃত্ব করিবার প্রতিভা এবং কর্মের চিন্তাশক্তি, উভয়ই মিলিত হয়—যেমনটি তাঁহার পরবর্তীকালে হইয়াছিল বিবেকানন্দের[২] মধ্যে।

ইতিপূর্বে আমরা যে সমস্ত ধর্ম-নায়কের কথা বলিয়াছি, বা পরে বলিব, তাঁহাদের সকলেরই জন্ম বাংলাদেশে। কিন্তু দয়ানন্দ ছিলেন অন্য প্রদেশের মানুষ; আরব সমুদ্রের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই প্রদেশ একদা অর্ধ-শতাব্দী বাদে গান্ধীকে জন্ম দিয়াছিল। গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াবাড় রাজ্যের

১ তাঁহার প্রকৃত নাম মূলশংকর। ঐ নাম তিনি নিজেই পরিত্যাগ করেন। তাঁহার গুরুর পদবী ছিল সরস্বতী। গুরুকে তিনি নিজের পিতার মতো দেখিতেন। দয়ানন্দের জীবনীর জন্য লজপৎ রায় (ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা, কিছুদিন মাত্র পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে) রচিত প্রামাণিক গ্রন্থ—'আর্য সমাজ' দ্রষ্টব্য। সিডনি ওয়েব* এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি 'লংগম্যানস, গ্রীন অ্যাণ্ড কোং' লণ্ডন হইতে ১৯১৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২ এই দুইজনের মধ্যে উদ্যম ও শক্তি, তাঁহাদের উভয়ের বঞ্চিত জনসাধারণের প্রতি দুর্নিবার প্রীতি সমান পরিমাণে থাকিলেও বিবেকানন্দের বেলায় আর একটি অতিরিক্ত বস্তু ছিল,—জ্ঞানগভীর আত্মার আকর্ষণ, বিশুদ্ধ চিন্তার প্রবৃত্তি, এবং অন্তরতর সত্তার অবিরাম ঊর্ধ্বতর লোকে প্রয়াণের প্রচেষ্টা—যাহার বিরুদ্ধে কর্মের আবশ্যকতাকে সর্বদাই সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

* সিডনি ওয়েব—ইনি ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ফেবিয়ান সোস্যালিজমের অন্যতম বিখ্যাত প্রবর্তক এবং প্রচারক। পরে ইনি লর্ড প্যাসফীল্ড উপাধি পান। ইঁহার রচিত Soviet Communism, A New Civilization গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।—অনুঃ

মরভি নামক স্থানে উচ্চ শ্রেণীর ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে[১] দয়ানন্দের জন্ম হয়। এই পারিবারে বৈদিক শাস্ত্রের অধিকার ছিল যেমন, তেমনি ছিল রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক, উভয় পার্থিব বিষয়েই পারদর্শিতা। দয়ানন্দের পিতা উক্ত ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে ধর্ম-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতেন। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে ছিল একটি কঠোর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। চরিত্রের এই বলিষ্ঠ কঠোর ব্যক্তিত্বের দিকটি তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। এজন্য, অবশ্য, তাঁহার পিতাকে কম কষ্ট পাইতে হয় নাই।

সুতরাং শৈশবে দয়ানন্দ ব্রাহ্মণ সমাজের কঠোরতম রীতি-নীতির মধ্যেই মানুষ হইয়াছিলেন। আট বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন হয় এবং উপনয়নের ফলে কৃত সকল নৈতিক অনুষ্ঠানগুলিকে[২] পরিবারের লোকেরা তাঁহার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেন।

মনে হইত, দয়ানন্দও বুঝি আবার তাঁহার কালে গোঁড়ামির অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হইবেন। কিন্তু তাহার পরিবর্তে তিনি পরিণত হইলেন স্যামসনে[৩] যিনি মন্দিরের সমস্ত স্তম্ভগুলিকে টানিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। নূতন উদীয়মান কালের চিন্তাধারার উপর পুরাতন শিক্ষাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া তাহাকে ইচ্ছামতো গঠন করিতে এবং এই ভাবে ভবিষ্যতের আবির্ভাবকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে মানুষ যখনই কল্পনা বা চেষ্টা করিয়াছে, তখনই তাহার সমস্ত চেষ্টা পর্যবসিত হইয়াছে ব্যর্থতায়, এবং নিশ্চিত পরিণতি ঘটিয়াছে বিদ্রোহে। ইহার আরো উল্লেখযোগ্য বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। দয়ানন্দ সেগুলির অন্যতম।

---

১ সামবেদী, বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠ স্তর।

২ সমস্ত ছাত্রজীবন ধরিয়া ব্রহ্মচর্য, কৌমার্য, শুদ্ধি ও ত্যাগের শপথ পালন এবং প্রতিদিন বেদপাঠের ব্রত গ্রহণ, এবং নিয়মিত ও অতিকঠোর অনুষ্ঠানের সমগ্র একটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়া জীবনযাপন।

৩ স্যামসন—ইনি ইস্রাএল জাতির মধ্যে অন্যতম শক্তিমান ব্যক্তি বলিয়া কথিত। দেবাংশে নাকি ইঁহার জন্ম। ইনি জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দিয়া দীর্ঘকাল ইস্রাএল জাতির বিচারক নিযুক্ত হন। স্যামসন তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী দালিলাকে তাঁহার শক্তির মূল উৎস কোথায় জানান। এই উৎস ছিল স্যামসনের চুলের মধ্যে। তাই দালিলা একদিন স্যামসনের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয়, ফলে স্যামসন শক্তিহীন হইয়া পড়েন। ফিলিস্টাইনরা স্যামসনকে বন্দী করে। কিন্তু পুনরায় স্যামসনের মস্তকে কেশোদ্গম হইলে স্যামসনের হৃতশক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসে। স্যামসন প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করেন। ঐ সময় ফিলিস্টাইনরা একটি মন্দিরে বসিয়া সভা করিতেছিল। স্যামসন ঐ মন্দির ভূপাতিত করেন। ভগ্ন মন্দির চাপা পড়িয়া ফিলিস্টাইনদের মৃত্যু হয়।—অনুঃ

তাই দয়ানন্দের এই বিদ্রোহের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার মূল্য আছে। তাঁহার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে শিব-রাত্রির ব্রত করিবার জন্য মন্দিরে লইয়া যান। ব্রত অনুসারে সমস্ত রাত্রি সতর্কভাবে জাগিয়া থাকিয়া এবং উপাসনা করিয়া কাটাইতে হয়। অন্য সব ভক্তরা ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু বালক দয়ানন্দ বহু চেষ্টায় নিদ্রাকে ঠেকাইয়া রাখিলেন। অকস্মাৎ তিনি দেখিলেন, একটা ইঁদুর ঠাকুরের নৈবেদ্য ঠোকরাইয়া খাইতেছে এবং শিবমূর্তির উপর দিয়া দৌড়া দৌড়ি করিতেছে। ইহাই যথেষ্ট ছিল। দয়ানন্দের শিশুমনের মধ্যে নিঃসংশয়ে একটি নৈতিক বিদ্রোহ ঘটিল। দেব-মূর্তির প্রতি তাঁহার সকল বিশ্বাস মুহূর্তে বিচূর্ণ হইয়া গেল। তিনি মন্দির ত্যাগ করিয়া একাকী রাত্রিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং তখন হইতে তিনি পূজা-পার্বণে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন।[১]

এইরূপে পিতা ও পুত্রের মধ্যে একটি ভয়ংকর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। উভয়েই ছিলেন অনমনীয় দুর্ধর্ষ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। ফলে, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহাকে জোর করিয়া বিবাহ দিবার চেষ্টা হইলে একদা উনিশ-বৎসর বয়সে দয়ানন্দ গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তিনি ধরা পড়িলেন এবং কারারুদ্ধ হইলেন। দয়ানন্দ পুনরায় পলায়ন করিলেন, এইবার চিরদিনের মতো (১৮৪৫)। ইহার পর পিতার সহিত দয়ানন্দের আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

দীর্ঘ পনেরো বৎসর ধরিয়া ধনী ব্রাহ্মণের এই সর্বহারা সন্তান ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন পরিয়া ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিলেন। ইহা যেন বিবেকানন্দের জীবনেরই প্রথম সংস্করণ—তরুণ বিবেকানন্দও একদা হিন্দুস্থানের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের মতোই দয়ানন্দ জ্ঞানী এবং সন্ন্যাসীদের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন, কোথাও দর্শন পড়িলেন, কোথাও বা বেদ পড়িলেন, কোথাও যোগের তথ্য শিখিলেন, যোগাভ্যাস করিলেন। বিবেকানন্দের মতোই তিনি ভারতের সকল তীর্থস্থান পর্যটন করিলেন, ধর্ম-সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্কে যোগ দিলেন। বিবেকানন্দের মতোই তিনি সকল দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করিলেন, নির্ভীকচিত্তে অবসাদ, অপমান, লাঞ্ছনা এবং বিপদের সম্মুখীন হইলেন।

১ বর্তমানে এই রাত্রিকে আর্যসমাজীরা উৎসব-রজনীরূপে পালন করেন।

সময়ের দিক হইতে মাতৃভূমির অংগের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় বিবেকানন্দের অপেক্ষা দয়ানন্দের চতুর্গুণ বেশী হইল।

কিন্তু দয়ানন্দ সাধারণ মানুষের নিকট হইতে বহু দূরে রহিলেন। ইহার একমাত্র কারণ, ঐ সময় তিনি সংস্কৃত ভাষায় ভিন্ন কথা কহিতেন না। এখানে দয়ানন্দের সহিত বিবেকানন্দের একটি পার্থক্য দেখা যায়। বাস্তবিক পক্ষে, রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে বিবেকানন্দ যাহা হইতেন, দয়ানন্দ ঠিক তাহাই ছিলেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আভিজাত্য এবং শুদ্ধাচারের দম্ভকে সস্নেহে প্রশ্রয় ও উপলব্ধির অনন্যসাধারণ মনোভাব দিয়া দমন করেন। দয়ানন্দ তাঁহার চারিদিকে কেবল কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, নৈতিক শৈথিল্য এবং লক্ষ লক্ষ বিগ্রহ—যেগুলিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন—ভিন্ন আর কিছুই দেখিলেন না। অবশেষে ১৮৬০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মথুরায় জনৈক বৃদ্ধ গুরুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। দৌর্বল্য এবং কুসংস্কারের প্রতি তীব্র ঘৃণায় গুরুজী দয়ানন্দের অপেক্ষাও কঠোরতর ছিলেন। তিনি ছিলেন আশৈশব অন্ধ সন্ন্যাসী, এগারো বৎসর বয়ঃক্রম হইতে সংসারে সম্পূর্ণ একাকী, বিদ্বান মানুষ, ভয়ংকর মানুষ, স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতী। দয়ানন্দ নিজেকে বিরজানন্দের কঠোর সংযমের অধীন করিলেন।[১] এই সংযম সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাচীন আক্ষরিক অর্থে দয়ানন্দের রক্তমাংস এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিক্ষত বিদগ্ধ করিয়া দিল। দয়ানন্দ এই দুর্দম দুর্ধর্ষ মানুষটির শিষ্য হিসাবে আড়াই বৎসর কাটাইলেন। সুতরাং তিনি নিজের ইচ্ছা-অভিলাষের কথা বিস্মৃত হইয়া এই অন্ধ মানুষটির—যাঁহার পদবী তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইচ্ছা পূরণের জন্য তাঁহার পরবর্তী সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, একথা স্মরণ রাখা অত্যন্ত ন্যায়সংগত হইবে। বিদায়কালে বিরজানন্দ দয়ানন্দকে দিয়া শপথ করাইয়া লন যে, পৌরাণিক প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে যে সকল কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে, সেগুলিকে সমূলে বিনাশ করিতে হইবে এবং বুদ্ধপূর্ব যুগের প্রাচীন ধর্মরীতিগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং সত্যের প্রচার করিতে তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিবেন।

অবিলম্বে দয়ানন্দ উত্তর ভারতে তাঁহার প্রচারকার্য শুরু করিলেন। তিনি সেই স্নেহশীল ভগবৎ-ভক্তদের মতো ছিলেন না, যাঁহারা তাঁহাদের শ্রোতাদের সম্মুখে স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরেন। তিনি ছিলেন ইলিয়াড[২] বা গীতায় বর্ণিত

১ প্রাচীনকালের ধর্মশাস্ত্রের ভাষায় 'সংযম' বলিতে আত্মনিগ্রহের মন্ত্রকেও বুঝাইত।
২ ইলিয়াড—হোমার রচিত গ্রীসদেশের মহাকাব্য।—অনুঃ

নায়কের মতো,—হারকিউলিসের[১] মতো দৈহিক সামর্থ্যে সমৃদ্ধ; তাই তিনি তাঁহার নিজের চিন্তা, একমাত্র সত্য চিন্তা ভিন্ন অন্য সমস্ত চিন্তারীতির বিরুদ্ধেই বজ্র-নির্ঘোষ করিলেন। ইহাতে তিনি এমন সফল হইলেন যে, মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে চার-পাঁচবার তাঁহার জীবন নাশের চেষ্টা-ও হইল—কয়েকবার, বিষ-প্রয়োগে। একবার একজন উত্তেজিত ব্যক্তি শিবের নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার উপর বিষাক্ত সর্প নিক্ষেপ করিল। কিন্তু দয়ানন্দ সাপটিকে ধরিয়া ফেলিয়া পিষিয়া মারিলেন। তাঁহাকে পরাজিত করিবার কোনো উপায় ছিল না। কারণ, সংস্কৃত ভাষা এবং বেদশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁহার অগ্নিবর্ষী শব্দোদ্গার তাঁহার শত্রুদিগকে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিত। শত্রুরা তাঁহাকে বন্যার ন্যায় ভাবিত। শংকরাচার্যের পর এমন বৈদিক ঋষির আর আবির্ভাব ঘটে নাই। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া তাঁহাদের রোম,—কাশী—হইতে তাঁহার নিকট আবেদন জানাইলেন। দয়ানন্দ নির্ভীকচিত্তে কাশীতে আসিলেন এবং ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে একটি হোমারীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। লক্ষ লক্ষ আক্রমণকারী, সকলেই তাঁহাকে নতজানু দেখিতে উদ্গ্রীব রহিয়াছে। তাঁহাদেরই সম্মুখে তিনি শতসংখ্যক পণ্ডিতের বিরুদ্ধে—অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দুধর্মের সমগ্র বাহিনীর বিরুদ্ধে[২] একাকী ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করিয়া চলিলেন। তিনি দাবী করিলেন যে, তিনি দুই হাজার বৎসর পূর্বেকার সত্যকার বাণী এবং বিশুদ্ধ রীতিতে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত শুনিবার মতো ধৈর্য পণ্ডিতদের ছিল না। অজস্র ধিক্কারের মধ্যে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইল। দয়ানন্দের চারিদিকে একটি শূন্য গড়িয়া তোলা হইলেও মহাভারতের রীতিতে এই বিরাট সংগ্রামের প্রতিধ্বনি দেশময় ধ্বনিত হইল। এইরূপে দয়ানন্দ সমগ্র ভারতে বিখ্যাত হইলেন।

১ দয়ানন্দের কার্যাবলী কাহিনী-কিম্বদন্তীতে পরিণত হইয়াছে। ধাবমান দুরন্ত দুই ঘোড়ার গাড়ীকে তিনি একহাতে থামাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শত্রুর হাত হইতে কোষমুক্ত তরবারি ছিনাইয়া লইয়া তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন ইত্যাদি। তাঁহার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর সকল প্রকার কোলাহলের ঊর্ধ্বেও শ্রুতিগোচর হইত।

২ একজন খৃস্টান মিশনারি এই তর্ক-যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইহার একটি সুন্দর নিরপেক্ষ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। এই বর্ণনা লজপৎ রায় তাঁহার পুস্তকে ব্যবহার করিয়াছেন। (*Christian Intelligence*, Calcutta, March, 1879.

১৮৭২ খৃস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনি কলিকাতায় ছিলেন। ঐ সময়ে রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে সহৃদয় অভ্যর্থনা জানান হয়। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্যরা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, সেদিকে লক্ষ্য দিলেন না; তাঁহারা দয়ানন্দের মধ্যে গোঁড়ামি, কুসংস্কার এবং কোটি কোটি দেবতার বিরুদ্ধে তাঁহাদের সংগ্রামে একজন শক্তিমান বন্ধুর সন্ধান পাইলেন। কিন্তু যে সকল ধর্মতাত্ত্বিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় নিজেদের পুষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত কোনো আপোষ করিবার মতো মানুষ ছিলেন না দয়ানন্দ। তাঁহার জাতীয় ভারতীয় ঈশ্বরবাদের আয়স-কঠিন বিশ্বাস কেবলমাত্র বেদের বিশুদ্ধ ধাতু হইতে প্রস্তুত ছিল; পাশ্চাত্যের চিন্তার সহিত তাহার কোনো মিল ছিল না; কারণ, পাশ্চাত্য চিন্তায় আধুনিক সংশয়ের ছাপ আছে; এবং বেদের অভ্রান্ততা এবং আত্মার দেহান্তরের মতবাদকে[১] এই সংশয় অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু এই পাশ্চাত্যপন্থীদের সহিত সংঘর্ষে তিনি সমৃদ্ধতর হইলেন।[২] কারণ ইহাঁদের[৩] নিকট হইতেই দয়ানন্দ প্রথম বুঝেন যে, জনসাধারণের ভাষায় বক্তৃতা না দিলে তাঁহার প্রচার বিশেষ কার্যকরী হইবে না। দয়ানন্দ বোম্বাই যাত্রা করিলেন এবং অল্পকাল পরেই, ব্রাহ্ম-সমাজের অনুকরণে, তবে ব্রাহ্ম-সমাজের অপেক্ষা অধিকতর সংগঠন শক্তি লইয়া, তাঁহার ধর্মসম্প্রদায় ভারতের সামাজিক

১ আর্য-সমাজের সদস্য লজপৎ রায়ের মতে, এই দুইটি বিষয় হইল "দুইটি প্রধান নীতি, যাহা আর্য-সমাজকে ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে পৃথক করিয়াছে।"

ইহা একান্তভাবে স্মরণীয় যে, বিশ বৎসর পূর্বে (১৮৪৪-৪৬) দেবেন্দ্রনাথ নিজেও বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী হইতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের সহিত সরাসরি দৈহিক মিলনের বিশ্বাসকে গ্রহণ করিয়া তিনি এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে দেবেন্দ্রনাই দয়ানন্দের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ছিলেন, এইরূপ বলা হয়। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মতের মিল ছিল অসম্ভব। দেবেন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল শান্তি এবং সংগতি। দয়ানন্দের ন্যায় অবিরাম যোদ্ধার প্রতি—যিনি আধুনিকতম সামাজিক সংঘর্ষেও কঠোর শাস্ত্রবাক্য এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের অস্ত্র প্রয়োগ করিতে চাহেন—দেবেন্দ্রনাথের কোনও সত্যকারের সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

২ ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে বিভিন্ন ধর্মনায়ক এবং তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে একটি আপাষ-মীমাংসার ভিত্তি আবিষ্কারের শেষ চেষ্টা হয়। কেশবচন্দ্র ও দয়ানন্দের পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটে, কিন্তু মীমাংসা ছিল অসম্ভব, কারণ, দয়ানন্দ কিছুই ত্যাগ করিতে রাজী নহেন।

৩ বাবু কেশবচন্দ্র সেনের নিকট।

জীবনে মূল-সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে তিনি বোম্বাই-এ তাঁহার প্রথম আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন—আর্যসমাজ, সেই বিশুদ্ধ ভারতীয়দের সমাজ—যে প্রাচীন বিজয়ী জাতি একদা সিন্ধু-গঙ্গাবিধৌত অঞ্চলে আসিয়াছিল, তাহাদের বংশধরদের সমাজ। এবং ঠিক এই অঞ্চলগুলিতেই আর্যসমাজ শক্তভাবে মূল গাড়িয়া বসিল। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে লাহোরে আর্যসমাজের মূল নীতিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়। ঐ বৎসর হইতে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দয়ানন্দ উত্তর ভারতে রাজপুতানায়, গুজরাটে, আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশে এবং সর্বোপরি পাঞ্জাবে ঘনসংঘবদ্ধভাবে সংগঠন গড়িয়া তোলেন। বাস্তবিক পক্ষে, সমস্ত ভারতবর্ষই প্রভাবিত হয়। কেবল একটি মাত্র প্রদেশে দয়ানন্দের প্রভাব কার্যকরী হয় নাই; তাহা হইলে মাদ্রাজ।[১]

দয়ানন্দ পরিপূর্ণ যৌবনেই আততায়ীর হস্তে নিহত হন। এক মহারাজার রক্ষিতাকে তিনি কঠোরভাবে নিন্দা করেন। ফলে ঐ রক্ষিতা তাঁহাকে বিষপ্রয়োগ করে। দয়ানন্দ ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর তারিখে আজমীড়ে প্রাণত্যাগ করেন।

কিন্তু দয়ানন্দের কাজ সাফল্যের সহিত অবিরামভাবে চলিতে থাকে। ১৮৯১ খৃস্টাব্দে আর্যসমাজীদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার, ১৯০১ খৃস্টাব্দে তাহা এক লক্ষ এবং ১৯১১ খৃস্টাব্দে দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার এবং ১৯২১ খৃস্টাব্দে চার লক্ষ চৌষট্টি হাজারে পৌছে।[২] কয়েকজন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হিন্দু, বিখ্যাত রাজনীতিক, এবং রাজা মহারাজা আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম-সমাজের সামান্য সাড়ার তুলনায় আর্যসমাজ যে স্বতস্ফূর্ত আবেগময় সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহা হইতে দয়ানন্দের কঠোর শিক্ষার সহিত তাঁহার দেশীয় চিন্তার নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার কিরূপ যোগাযোগ ছিল, তাহা বোঝা যায়। দেশের নবজাগ্রত স্বাদেশিকতায় দয়ানন্দের দান সুপ্রচুর।

এই জাতীয়তার জাগৃতি এবং বর্তমানে তাহার পরিপূর্ণ প্লাবনের তলদেশে কি

১ ব্যাপারটি আরো বেশী লক্ষণীয়, কারণ, এই মাদ্রাজেই বিবেকানন্দ তাঁহার সর্বাপেক্ষা উৎসাহী এবং সঙ্ঘবদ্ধ শিষ্যদের সন্ধান পান।

২ ইঁহাদের মধ্যে পাঞ্জাবে ও দিল্লীতে ছিলেন ২২৩০০০, যুক্তপ্রদেশে ২০৫০০০, কাশ্মীরে ২৩০০০ এবং বিহারে ৪৫০০। সংক্ষেপে বলা চলে, ইহা উত্তর ভারত এবং তাহার অন্যতম সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশেরই প্রকাশ মাত্র ছিল।

কারণগুলি রহিয়াছে, সেগুলি ইউরোপকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া সম্ভবত নিতান্ত অনাবশ্যক হইবে না।

পশ্চিমীকরণ একটি চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল এবং তাহার উৎকৃষ্ট দিকটা সব সময় প্রকাশিত হইতেছিল না। বুদ্ধিবৃত্তির দিক হইতে ইহা অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বহীন একটি মনোবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এবং এইভাবে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তা বিদূরিত হইতেছিল। কেবল তাহাই নহে, দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবী-দিগকে স্বজাতির ঐতিহ্য ও শক্তিকে ঘৃণা করিতে শিখাইয়া তাহাদিগকে অন্য দেশের মৃত্তিকায় রোপণ করা হইতেছিল। কিন্তু আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি শীঘ্রই বিদ্রোহ করিল। দয়ানন্দের মতোই দয়ানন্দের কালের লোকেরাও উদ্বেগ, বিরক্তি এবং বেদনার সহিত লক্ষ্য করিতেছিল যে, ভারতের শিরায় উপশিরায় একদিকে যেমন অগভীর ইউরোপীয় যুক্তিবাদ প্রবেশলাভ করিতেছিল, যাহার উন্নাসিক ঔদ্ধত্য ভারতীয় অধ্যাত্মিকতার গভীরতাকে বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিতেছিল না, তেমনি অন্য দিকে প্রবেশ করিতেছিল খৃস্টান ধর্ম, যাহা পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খৃস্টের ভবিষ্যৎবাণীকে পূর্ণ করিতেছিল, "তিনি পিতা এবং পুত্রের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে আসিয়াছেন…"

ইহা নিশ্চিত যে, আমরা খৃস্টান প্রভাবকে লঘু করিয়া দেখিতেছি না। আমি জাত ক্যাথলিক, আমি সকল চার্চের এবং ধর্মের বাহিরে থাকিলে-ও জন্মগতভাবে আমি ক্যাথলিক, এবং সেই ক্যাথলিক, যাঁহারা খৃস্টের শোণিতের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ খৃস্টানদের রচিত গ্রন্থে ও জীবনে উদ্‌ঘাটিত জ্ঞানগভীর জীবন-ভাণ্ডারের সকল সম্পদকে ভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং এ-হেন ধর্মকে অন্য কোনও ধর্মের নিকট খাটো করিবার কথা স্বপ্নেও আমি ভাবি না। আত্মা কোনো ঊর্ধ্বলোকে উপনীত হয়—*acumen mentis,*[১] তখন তাহা আর অগ্রসর হইতে পারে না। এক দেশের ধর্ম যখন অন্য দেশের জাতিগুলির সংস্পর্শে আসে, তখন তাহা সকল সময়ে তাহার শ্রেষ্ঠ উপাদনগুলির সহযোগে কাজ করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মানসিক দম্ভের সহিত পার্থিব জয়ের বাসনা মিশ্রিত হইতে থাকে, এবং যদি জয় সম্ভব হয়, তবে প্রায়ই বলা হয় যে, উদ্দেশ্যই উপায়কে ন্যায়সংগত করিয়াছে। আমি এ-কথাও বলিব যে, কোনো দেশের ধর্ম, তাহা যতোই

১ ফ্রাঁসোয়া দ্য সালের প্রতি পাশ্চাত্য অতীন্দ্রিয়বাদীদের এবং রিচার্ড সেণ্ট ভিক্টরের প্রযুক্ত কথাটি ব্যবহার করিলে। (অ্যাঁরি ব্রেমঁ প্রণীত The Metaphysics of the Saints গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

নিখুঁতরূপে আসুক না কেন, অন্য একটি জাতির আত্মাকে, চূড়ান্ত ঊর্ধ্বগতির গভীরতম সত্তায় কখনই ধরিতে পারে না। তাহা উহার দুই একটি দিককে বরং ধরিতে পারে; অবশ্য এই ধরার-ও যে গুরুত্ব আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। তবে সে গুরুত্ব গৌণ মাত্র। আমরা, যাঁহারই খৃস্টান অধিবিদ্যার বিস্ময়কর শাস্ত্রকে সযত্নে পাঠ করিয়াছি এবং তাহার গভীরতার পরিমাপ করিয়াছি, জানি যে, ঊর্ধ্বলোক-গামী আত্মার পক্ষবিস্তারের জন্য কি অসীম স্থান-ই না সেখানে রহিয়াছে; এবং ইহাও জানি যে, যে সত্তা এবং প্রেমবিজড়িত বিধাতার স্বর্গীয় বিশ্বের রূপ তাঁহারা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বৈদান্তিক অসীমের পরিকল্পনার অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও অল্পপরিসর বা অনুন্নত নহে। কিন্তু যদি একজন কেশবচন্দ্র ক্ষণেকের জন্য এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে সে কেশবচন্দ্র তাঁহার জাতির মধ্যে ব্যতিক্রম মাত্র। খৃস্টান ধর্মের এই দিকটি হিন্দুদের নিকট প্রতিভাত হয় নাই, আমার মনে হয়। তাহা কতকগুলি নৈতিক নিয়মকানুন, অনুষ্ঠান এবং কর্মপ্রীতির—যদি এ কথা ব্যবহার করা চলে—মধ্য দিয়াই উপস্থিত হইয়াছিল। অবশ্য, এই দিকটিরও গুরুত্ব আছে, তবে উহাই খৃস্টান ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ দিক নহে।[১] ইহাও অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় যে, যাঁহারা গভীর আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার অধিকারী, যাঁহাদের আত্মা ঊর্ধ্বলোক-প্রয়াণে পক্ষ সঞ্চারে সমর্থ, তাঁহাদের অপেক্ষা সক্রিয় শক্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধর্মান্তরগ্রহণগুলি ঘটিয়াছে।[২]

দয়ানন্দের মন যখন গঠিত হইতেছিল, তখন ভারতীয় ধর্মের আধ্যাত্মিক চেতনা এতোই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইউরোপীয় ধর্মের আধ্যাত্মিক চেতনা তাহার

১ মসিয়ে ল'আবে ভেঁসাঁর ধার্মিক নীতিবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদবিরোধিতার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিতর্কে মসিয়ে অ্যাঁরি ব্রেম যে সালেসীয় ঈশকেন্দ্রিকবাদ (Salesian Theocentrism) প্রচার করিয়াছেন, আমি নিজে স্বতন্ত্রভাবে এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি অনুসারে তাহার সমর্থন করি। (*The Metaphysics of The Saints*, প্রথম খণ্ড, ২৬-৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

২ সাধু সুন্দর সিংহ প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ইউরোপে সুপরিচিত। এ বিষয়ে তিনি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। তিনি একজন পাঞ্জাবী শিখ। তাঁহার পিতা জনৈক সর্দার এবং ভ্রাতা সৈন্য বিভাগের একজন সেনাপতি। নির্ভীক মানুষ। তিনি তিব্বতে শহীদ সন্ধানের দুঃসাহস করেন এবং ইহাতে আনন্দও পান। তিব্বতে তিনি শিখ এবং আফগান এই দুই সামরিক জাতির অন্যান্য খৃস্টান শহীদদের চিহ্ন আবিষ্কার করেন। (ম্যাক শাএরের-প্রণীত 'সাধু সুন্দর সিং' জুরিখ, ১৯২২, দ্রষ্টব্য।) এই পুস্তিকা অনুসারে বিচার করিলে মনে হয় যে, তিনি অন্যান্য ভারতীয় ধর্মের বেলায় কখনোই সেগুলির চিন্তার অন্তঃস্তলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

স্থলে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত না করিয়াই সেই ক্ষীণ শিক্ষাকে নির্বাপিত করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল। এ সম্পর্কে ব্রাহ্ম-সমাজ উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের উপরেও পশ্চিমী খৃষ্টান ধর্মের ছাপ ছিল। রামমোহন রায় যেখানে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইউনিটারিয়ানিজ্‌ম্‌। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইউনিটারিয়ানিজমকে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিলেও ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে উহার প্রবেশ তিনি রোধ করিতে পারেন নাই। যখন তিনি কেশব-চন্দ্রকে পথ ছাড়িয়া দিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইউনিটারিয়ানিজমের প্রবেশের তিন ভাগ কার্য সম্পন্ন হইল। ১৮৮০ খৃস্টাব্দেই কেশবচন্দ্রের একজন সমালোচক[১] বলিতে পারিয়াছিলেন যে, যাঁহারা কেশবচন্দ্রের ধর্মমতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা 'একেশ্বরবাদী' এই নাম হারাইয়াছেন, কারণ তাঁহারা ক্রমেই খৃস্টান ধর্মের দিকে অধিকতরভাবে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। যাহাই হউক, তৃতীয় ব্রাহ্ম-সমাজের (কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ) শক্তি কিন্তু ভারতীয় খৃস্টান ধর্মের বিরুদ্ধেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই পর পর দুইবার দলগত ভাবে বিভক্ত হওয়ায় এবং পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীতে সম্পূর্ণরূপে খৃস্টান ধর্মের কবলিত হইবার সম্ভাবনা থাকায় (ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি), ভারতীয় জনমত এই ধর্মে আস্থা স্থাপন করিতে অসমর্থ ছিল।

প্রাচীন ভারতের সমস্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সহিত সুপরিচিত হইয়া এবং একটি মহান জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, একজন বেদবাদী—বেদের প্রচণ্ড প্রচারক—কেমন করিয়া জনসাধারণের পূর্ণোদ্যম ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বোঝা যায়। বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তিনি একাকীই সমগ্র ভারতের প্রতিরোধ শক্তিকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দয়ানন্দ খৃস্ট-ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার আঘাতের লক্ষ্য বা সেই লক্ষ্যের অভ্রান্ততার কথা বাদ দিয়াই বলা চলে যে, তাঁহার গুরুভার বিপুল তরবারির আঘাতে খৃস্ট-ধর্ম দ্বিধা-বিভক্ত হইল। তিনি বাইবেলের শ্লোকগুলিকে প্রতিশোধ-স্পৃহায় অন্যায় এবং ক্ষতিকর সমালোচনার সম্মুখীন করিলেন। সেগুলিকে পৃথক-ভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিলেন এবং তাহার বাস্তবিক, ধর্মনীতিক ও সাহিত্যিক (তিনি হিন্দী অনুবাদে বাইবেল পাঠ করেন এবং তাহাও দ্রুতভাবে)

১ ফ্র্যাংক লিলিংটন-রচিত "The Brahmo and The Arya in their Relation to Christianity', 1901, দ্রষ্টব্য।

গুণাবলীর প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য দিলেন না। দয়ানন্দের মন্তব্য বা টিকাগুলি[১] ভলতের[২] এবং তাঁহার 'দিক্‌সিঁঅনের ফিলসফিক'-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দুঃখের বিষয়, পরে সেগুলি আধুনিক কয়েকজন হিন্দুর বিদ্বেষপূর্ণ খৃস্টধর্ম-বিরোধিতার অস্ত্রাগারে পরিণত হইয়াছে।[৩] তাহা সত্ত্বেও গ্ল্যাসন্যাপ যথার্থই বলিয়াছেন যে, এই মন্তব্যগুলি ইউরোপীয় খৃস্টান ধর্মের নিকট গভীর কৌতূহলের উদ্রেক করিবে। কারণ, ইউরোপীয় খৃস্টান ধর্মের নিজের জানা উচিত, এশিয়াবাসী প্রতিপক্ষদের নিকট তাহার রূপটা কিভাবে ধরা পড়িয়াছে।

কোরাণ এবং পুরাণের প্রতিও যে দয়ানন্দের খৃস্টধর্মের অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নহে। তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেও পদদলিত করেন। এককালে যে ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বের সম্রাজ্ঞী ছিল,[৪] তাহার সহস্র বর্ষ-ব্যাপী অধঃপতনের ব্যাপারে অতীতে এবং বর্তমানে, যাঁহারাই কোনো রূপে সাহায্য করিয়াছেন, সেই সকল স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র করুণা ছিল না। বৈদিক ধর্মকে, তাঁহার

১ দয়ানন্দ-রচিত হিন্দী গ্রন্থ 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এ এই টিকা বা মন্তব্যগুলি রহিয়াছে।

২ ভলতের—(১৬৯৪-১৭৭৮) বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক।—অনুঃ

৩ নয়া-বৌদ্ধধর্মীরা উল্লেখযোগ্য। অবশ্য, বুদ্ধের সেই পবিত্র সুন্দর নাম, যাহা মূলত বিশ্বশান্তি এবং নির্লিপ্তির প্রতীক ছিল, তাহা আজ সকল ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ এবং আক্রমণশীল প্রচারে ব্যবহৃত হইতেছে, ইহা বিশ্বাস করাও কঠিন।

৪ তাঁহার বিপুলভারতের ইতিহাস লক্ষণীয়। সপ্তদশ শতাব্দীর বস্যুএ-র বিখ্যাত রচনার সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে একপ্রকার আবেগময়ী 'বিশ্বেতিহাসের আলোচনা' বলা চলে। মানব জাতির জন্ম এবং পৃথিবীতে (আমেরিকা এবং মহাসামুদ্রিক দ্বীপগুলি সহ) ভারতের আধিপত্য-ও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। [কারণ তাঁহার মতে 'নাগ' (সর্প) জাতি এবং পুরাণের উপকথায় বর্ণিত রসাতলবাসী দৈত্য-দানবরা পৃথিবীর অপর গোলার্ধের মানুষ। তাঁহার মতে, অসুর এবং রাক্ষসাদির সহিত যুদ্ধ ছিল আসিরীয়াবাসীদের সহিত বা নিগ্রো জাতিদের সহিত যুদ্ধ।] পৌরাণিক সমস্ত কাহিনীকেই দয়ানন্দ পৃথিবীতে সংঘটিত ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। মহাভারতে বর্ণিত শতাব্দীব্যাপী আত্মঘাতী যুদ্ধের ফলেই বৈদিক আধ্যাত্মিকতার ধ্বংস এবং ভারতের দুর্ভাগ্যের প্রারম্ভ হয় বলিয়া দয়ানন্দ মনে করেন।—পরবর্তীকালে যে বাস্তববাদের জন্ম হয়, কেবল তাহার প্রতি নয়, জৈন ধর্মের প্রতিও তিনি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। তিনি শংকরাচার্যকে আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে হিন্দুদের প্রথম স্বাধীনতা-প্রয়াসের, যদিও ব্যর্থ তথাপি গৌরবান্বিত নায়ক বলিয়াই মনে করেন। শকরাচার্য কুসংস্কারের শৃংখল ভাঙিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যেই শংকরাচার্যের মৃত্যু হয়। অতঃপর শংকরাচার্য জৈন ধর্মীদের, বিশেষত, মায়াবাদীদের হাতে পড়েন। দয়ানন্দ কোনদিন স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না, তিনি কঠোর বাস্তবতার মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন ; তাই মায়াবাদ তাঁহার মধ্যে একটি দুর্জয় ঘৃণার উদ্রেক করিত।

মতে, যাঁহারাই বিকৃত এবং অশুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই তিনি নির্মমভাবে সমালোচনা করেন।[১] তিনি ছিলেন একজন লুথার[২]—যিনি তাঁহার স্বদেশের বিভ্রান্ত, বিপথে-পরিচালিত 'রোমান' চার্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।[৩] তাই তিনি সর্বপ্রথমে শাস্ত্রের নির্ঝর ধারাগুলিকে জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিতে চাহিলেন; চাহিলেন, তাঁহার স্বদেশের জনসাধারণ এই নির্ঝরগুলিতে আসিয়া নিজেরা সেগুলির নির্মল ধারা পান করুক। তিনি মাতৃভাষায়[৪] বেদের অনুবাদ এবং টিকা রচনা করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ, যখন বেদ পাঠে সকল মানুষেরই অধিকার আছে, কেবল তাহা স্বীকার করিলেন না এবং সেই সংগে প্রত্যেক আর্যেরই যে বেদ পাঠ অবশ্য কর্তব্য, এ কথাও প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন সত্যই ভারতের পক্ষে এক নব যুগের সূত্রপাত হইল।[৫]

১ তিনি সকল প্রকার পৌত্তলিকতাকেই পাপ বলিয়া ঘোষণা করেন। অবতারবাদকে তিনি অসম্ভব ও অধর্ম বলিয়া মনে করিতেন।

২ লুথার—মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) জার্মানির বিখ্যাত ধর্ম-সংস্কারক। প্রো'টেস্ট্যান্ট খৃস্টান ধর্মের প্রবর্তক।—অনু:

৩ তিনি ব্রাহ্মণদিগকে "পোপ" এই নামে অভিহিত এবং তিরস্কৃত করেন।

৪ ১৮৭৬ খৃস্টাব্দ হইতে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি একদল পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন এবং পণ্ডিতরা তাহা কথ্য ভাষায় অনুবাদ করিতেন। তবে মূল শ্লোকগুলি তিনি নিজেই অনুবাদ করিতেন। তাঁহার অনুবাদগুলির পূর্বে শ্লোকগুলির ব্যাকরণ এবং শব্দার্থের ব্যাখ্যা থাকিত এবং অনুবাদগুলির পরে থাকিত শ্লোকগুলির সাধারণ ভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং টিকা। অনুবাদগুলিকে পুনর্বার পাঠ করিবার মতো সময় দয়ানন্দের ছিল না।

৫ লাহোর হইতে প্রকাশিত (১৮৭৭ খৃ: অ:) "দশটি মূলনীতির" তৃতীয় নিবন্ধ: "সত্যজ্ঞানের গ্রন্থ হইল বেদ। প্রত্যেক আর্যেরই প্রথম কর্তব্য হইল সেগুলিকে পাঠ করা এবং সেগুলিকে শিক্ষা দেওয়া।"

খৃস্ট ধর্মের বন্যার বিরুদ্ধে বৈদিক ধর্মকে খাড়া করিবার ভিত্তিতে দয়ানন্দ অন্যতম পাশ্চাত্য সম্প্রদায় 'থিওজফিক্যাল সোসাইটির' সহিত কয়েক বৎসরের জন্য (১৮৭৯-১৮৮১) একটি কূটনৈতিক সন্ধি স্থাপন করেন। ঐ পাশ্চাত্য সম্প্রদায় পরবর্তীকালে মহান কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের সহিত দয়ানন্দের সন্ধিকে অত্যন্ত অদ্ভুত এবং আকস্মিক মনে হয়। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে একজন রুশ মহিলা মাদাম ব্লাভাতস্কি এবং জনৈক আমেরিকান কর্ণেল অলকট থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সোসাইটি হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষত, গীতা এবং উপনিষদ পাঠে হিন্দুদিগকে উৎসাহিত করিতেন। কর্ণেল অলকট ছয় খণ্ডে সংস্কৃত ভাষায় উপনিষদ প্রকাশ করেন। তিনি ভারতবর্ষে, বিশেষত সিংহলে, বিদ্যালয় স্থাপনের আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন; এমন কি, অস্পৃশ্যদের জন্য

ইহা সত্য যে, দয়ানন্দের অনুবাদ ছিল একপ্রকার ব্যাখ্যা; উহার যথাযথ নির্ভুলতা,[১] ঐ সকল শাস্ত্র-বাক্য হইতে গৃহীত নীতিবাক্যের কঠোরতা, বেদের "মানবপূর্ব," অতিমানবিক ঐশী উদ্ভবে বিশ্বাস এবং অন্য ধর্মের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বিদ্বেষ, কর্মের প্রতি আস্থা, সংগ্রামে অটল দৃঢ়তা[২] এবং সর্বোপরি, তাঁহার দেশীয় ভগবান,—এ সমস্ত কিছুর মধ্যেই সমালোচনা করিবার মতো অনেক বস্তুই রহিয়াছে।[৩]

স্কুল করিতেও তিনি ভয় পান না। ফলে থিওজফিক্যাল সোসাইটি ভারতের জাতীয়, ধর্মীয় এবং সামাজিক জাগরণে প্রচুর সহায়তা করে। তাই দয়ানন্দ উহার সহিত একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিবেন মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সোসাইটি যখন দয়ানন্দের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সহিত সত্যসত্যই সহযোগিতা করিতে আসিল, তখন দয়ানন্দ সে সহযোগিতা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে 'থিওজফিক্যাল সোসাইটির' আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল। অতঃপর উহা একটি গৌণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে কাশীতে যে কেন্দ্রীয় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা যদি মিসেস বেসান্তের প্রভাবে হইয়াছিল বলা হয়, তবে সামাজিক দিক হইতে থিওজফিক্যাল সোসাইটির উপযোগিতা ছিল। এই সোসাইটিতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণের মধ্যে যে-ইংগ-মার্কিন অংশ প্রধান এবং প্রতিপত্তিশালী ছিল, তাহা হিন্দু অধিবিদ্যার বিশাল, উদার বিষয়কে তাহাদের সমুন্নত অথচ সীমাবদ্ধ ব্যবহারিকবাদী মনোভাবের ফলে বিকৃত করে। সেই সংগে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই সোসাইটি নিজেকে একটি চূড়ান্ত কর্তৃত্বের এবং প্রামাণিকতার গূঢ় অথচ কঠিন অধিকারে ভূষিত করে। ফলে, বিবেকানন্দ প্রভৃতির ন্যায় ভারতীয় স্বাধীনতাকামী মনীষীদের কাছে তাহা ধরা পড়ে। আমরা পরে লক্ষ্য করিব, তাই আমেরিকা হইতে ফিরিয়া বিবেকানন্দ এই সোসাইটিকে তীব্রভাবে নিন্দা করেন।

এই বিষয়ে, থিওজফিক্যাল সোসাইটির সমর্থনে, জি, ই, মডন হারজেন লিখিত একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে: "An Indo-European Influence, the Theosophical Society (*Feuilles de l' Inde*, Paris 1928). কাউণ্ট কেইজেরলিংও তাঁহার 'দার্শনিকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' (১৯১৮) নামে এ বিষয়ে বুদ্ধিদৃপ্ত, সম্পূর্ণ এবং বিদ্বেষপ্রণোদিত একটি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

১ কিন্তু উহার প্রতি তাঁহার ভক্তি এবং বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত আবেগময়। ফলে, তাহা সকল আক্রমণের প্রতিই দয়ানন্দকে নির্বিকার রাখিত।

২ 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থের শেষে অবশ্য-পালনীয় যে সমস্ত নীতি উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দয়ানন্দের নিম্নলিখিত আদেশগুলিও রহিয়াছে: "হউক তাহারা পৃথিবীর শাসক, শক্তিমান ব্যক্তি, দুষ্কৃতকারী হইলে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে, তাহাদিগকে পরাজিত করিতে, তাহাদিগকে দমন করিতে, ধ্বংস করিতে চেষ্টা কর। অন্যায়কে শক্তিহীন করিতে সর্বদা চেষ্টা করিবে, ন্যায়কে শক্তিশালী করিবে। এই চেষ্টায় কেহ অবহেলা করিবে না—ভয়ংকর দুঃখযন্ত্রণা, এমন কি, মৃত্যুর বিনিময়েও না।"

৩ "বেদে বর্ণিত সেই এক এবং অদ্বিতীয় ভগবানের মহিমা সমাজ প্রচার করিবে, সমাজ তাঁহারই উপাসনা করিবে এবং তাঁহারই সহিত মিলনসাধন করিবে।...ভগবান এবং বিশ্ব-বস্তু সম্পর্কে ধারণা

দয়ানন্দের মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসধারা ছিল না, ছিল-না আধ্যাত্মিকতার প্রশান্ত সূর্যালোক—যাহা মনুষ্য জাতিকে এবং তাহার দেবতাদিগকে আলোক-

কেবলমাত্র বেদ এবং অন্যান্য সত্যকারের শাস্ত্রের বাণীর উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।" এবং সেই সত্যকার শাস্ত্রের বাণীকেই তিনি প্রচার করিয়াছেন।

যুগের হাওয়া তখন সমস্ত কিছুর বিনিময়েই ঐক্যমুখী হইয়া উঠিয়াছিল। তাই অদ্ভুত লাগিলেও রামমোহন এবং কেশবচন্দ্রের ঐক্যবাদের মতোই দয়ানন্দের জাতীয়তাবাদের মধ্যেও বিশ্বব্যাপিতার একটি ভাব ছিল: "এই সমাজের উদ্দেশ্য হইবে সমগ্র মানবতার মংগল। (১৮৭৫ খৃস্টাব্দে নির্ধারিত আর্য-সমাজের মূলনীতি দ্রষ্টব্য)।

"সমাজের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইল পৃথিবীর মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক উন্নতি সাধন করিয়া সমগ্র পৃথিবীর মংগল করা। (১৮৭৭ খৃস্টাব্দে লাহোরে সংশোধিত আর্য-সমাজের মূলনীতি দ্রষ্টব্য।)

"মানব সভ্যতা যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ যাহাকে মানিয়া চলিবে, সেই সর্বগ্রাহ্য মূলনীতিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মে আমি বিশ্বাসী। এবং সেই ধর্মকেই আমি বলি 'ধর্ম': 'আদিম সনাতন ধর্ম' (কারণ, উহা মানুষের বিরুদ্ধে ধর্মবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।)...যাহাকে সকল কালের মানুষ বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া ভাবে, তাহাকে আমি গ্রহণীয় মনে করি।" ('সত্যার্থ-প্রকাশ')

অন্যান্য সকল আবেগময় ধর্মবিশ্বাসীর মতোই তিনি সনাতন ও সর্বগ্রাহ্য সত্যের (তিনি যাহার সেবা করেন বলিয়া দাবী করেন) ধারণাকে তাঁহার নিজের মতের সহিত সরল বিশ্বাসে গুলাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি এই সত্যের বিচারের জন্য পাঁচটি প্রাথমিক পরীক্ষা অবলম্বন করেন। তাঁহার প্রথম দুইটি পরীক্ষা বেদের শিক্ষা এবং ভগবানের গুণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁহার স্বপ্রদত্ত দুইটি সূত্র অনুসারেই হয়। অরবিন্দ ঘোষ বলিয়াছেন যে, "বেদের মধ্যে ধর্মের নীতির এবং বিজ্ঞানের একটি সামগ্রিক প্রকাশ ঘটিয়াছে। ধর্ম সম্পর্কে বেদের যে শিক্ষা তাহা একেশ্বরবাদী। বৈদিক দেবতারা সেই একমাত্র ভগবানের বিভিন্ন বর্ণনাসূচক নাম মাত্র। তাঁহার যে বিভিন্ন শক্তি প্রকৃতির মধ্যে কাজ করিয়া চলে, ঐ বিভিন্ন নামগুলি তাহারই পরিচয় মাত্র। আধুনিক অনুসন্ধান এবং গবেষণার ফলে যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমরা বেদগুলিকে নির্ভুলভাবে বুঝিলে তবে সেই সকল সত্যে গিয়া উপনীত হইতে পারি। ("বেদের মূলকথা"—'আর্য', নভেম্বর, ১৯১৪, পণ্ডিচেরী।) দয়ানন্দও বেদ সম্পর্কে এইরূপ একটি মত পোষণ করিতেন। সুতরাং সেই বেদকে সমগ্র মানবতার উপর প্রয়োগ করা যে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ করিবার আর কি কারণ থাকিতে পারে?

দয়ানন্দের বেদের এই জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা প্রাচীন ভারতের দর্শন, অনুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার সমস্ত দিককেই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে পুস্তিকার প্লাবনে আত্মপ্রকাশ করিল। পাশ্চাত্য মতবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রাচীন আদর্শের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। (১৯২৮ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকা তুলনীয়।)

ধারায় স্নাত করাইয়া দেয়। রামকৃষ্ণের সমস্ত সত্তা হইতে যে কাব্যসুলভ জ্যোতিরুদ্ভাস উৎসারিত হইত, তাহা বা বিবেকানন্দের রচনার যেই সুগম্ভীর সমুন্নত কাব্যময়তা—তাহাও দয়ানন্দের মধ্যে ছিল না। কিন্তু দয়ানন্দের মধ্যে ছিল এক প্রচণ্ড অনমনীয় শক্তি, এক স্থির অটল সুনিশ্চয়তা—সিংহের শোণিত—যাহা তিনি ক্লান্ত রক্তাল্প ভারতের দেহে প্রবিষ্ট সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। একটি দুর্দম শক্তিতে তাঁহার কথাগুলি ধ্বনিত হইত। তিনি নিয়তিতে বিশ্বাসী নিষ্ক্রিয় পার্থিব মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, আত্মা বিমুক্ত,—কর্মই নিয়তির স্রষ্টা।[১] তাঁহার অসির আঘাতে তিনি সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা এবং কুসংস্কারের জটিল জংগমকে উৎপাটিত বিধ্বস্ত করেন। তাঁহার দর্শন নীরস, অস্পষ্ট[২] হইলেও তাঁহার ধর্মনীতি সংকীর্ণ, আমার মতে, প্রতিক্রিয়াশীল হইলেও, তাঁহার সামাজিক কার্যাবলী এবং আচার-ব্যবহারের মধ্যে নির্ভীক, বলিষ্ঠ দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। কার্যত, ব্রাহ্ম-সমাজ এবং এমন কি, আজ রামকৃষ্ণ মিশন যতোদূর অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই, তাহা ছাড়াইয়াও তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন।

দায়ানন্দ-সৃষ্ট আর্য-সমাজ স্ত্রী-পুরুষের সামানাধিকারের সংগে সকল দেশ ও জাতির সকল মানুষের প্রতিই ন্যায়বিচারের নীতি নির্দেশ করে। বংশপরম্পরায় যে বর্ণ বিভেদ চলিয়া আসিতেছে, আর্য-সমাজ তাহাকে অস্বীকার করে; এবং কেবল মাত্র সমাজে মানুষের রুচি ও শক্তি অনুসারে পেশা ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লয়। এইরূপে কর্ম অনুসারে যে বিভেদের সৃষ্টি হইবে, তাহার সহিত ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকিবে না, থাকিবে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রই কর্তব্য কর্মগুলির পরিমাপ করিয়া দেখিবে, কেবল রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে কাহাকেও সমাজের মংগলের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি হিসাবে এক বর্ণ হইতে অন্য বর্ণে তুলিতে বা নামাইতে পারিবে। দয়ানন্দ চাহিলেন, প্রত্যেক মানুষ তাহার স্বকীয় শক্তি অনুসারে যাহাতে সমাজে যথাসম্ভব উন্নত স্তরে উপনীত হইতে পারে, সেজন্য তাহাকে জ্ঞানার্জনের

১ "নিয়তির নিয়মকে স্বীকার করিয়া লইবার অপেক্ষা সকল সক্রিয় জীবনকে গ্রহণ করাই শ্রেয়তর। নিয়তি কর্মের ফসল। কর্মই নিয়তির জন্ম দেয়। নিষ্ক্রিয় পরাজয়ের অপেক্ষা সৎ কর্ম শ্রেয়তর।..."

"আত্মা প্রমুক্ত কর্মী, তাহা যেমন অভিরুচি কাজ করিতে পারে। কিন্তু কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য তাহাকে ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিতে হয়।" (সত্যার্থ প্রকাশ)

২ মনে হয়, দয়ানন্দ তিনটি সনাতন বস্তুকে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন—ভগবান, আত্মা

পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। সর্বোপরি, দয়ানন্দ কখনো অস্পৃশ্যতার অস্তিত্বের ঘৃণ্য অবিচারকে সহ্য করিতে পারিতেন না; অস্পৃশ্যদের অস্বীকৃত অধিকারগুলিকে স্বীকার করাইবার জন্য দয়ানন্দের ন্যায় এমন প্রাণপণ চেষ্টা আর কেহই করেন নাই। সমান অধিকারের ভিত্তিতেই অস্পৃশ্যরা আর্যসমাজে গৃহীত হইয়াছিল। কারণ, আর্যদের কোনও জাতি নাই। "আর্যগণ সকলেই উন্নততর আদর্শের মানুষ; যাহারা অন্যায় ও পাপের মধ্য দিয়া জীবন নির্বাহ করে, তাহারাই অনার্য—দাস-জাতির লোক।"

ভারতে মেয়েদের অবস্থা শোচনীয়। মেয়েদের অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম করিতেও দয়ানন্দ বিন্দুমাত্র কম উদারতা বা সাহস দেখান নাই। নারীরা যে সকল অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেন, দয়ানন্দ সেগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি স্মরণ করাইয়া দেন, প্রাচীন গৌরবের যুগে নারীরা সমাজে এবং গৃহে অন্ততঃপক্ষে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিতেন। তাঁহার মতে, মেয়েদের সমান শিক্ষা, বিবাহে[১] আত্মাধিকার এবং আর্থিক ও সাংসারিক বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা উচিত। বস্তুতপক্ষে, দয়ানন্দ বিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষের সামানাধিকার দাবী করেন। বিবাহকে অবিচ্ছেদ্য ভাবিলেও বিধবা বিবাহকে তিনি স্বীকার করেন এবং তিনি এমন কথাও বলেন যে, বিবাহের ফলে যদি সন্তান উৎপন্ন না হয়, তবে সন্তান লাভের ইচ্ছায় পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সাময়িকভাবে অন্য স্ত্রী বা পুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারেন।

অবশেষে, "জ্ঞানের প্রসার এবং অজ্ঞতার বিলোপ"। উহা আর্যসমাজের অষ্টম নীতি হওয়ায় ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারে আর্যসমাজ একটি বিশিষ্ট অংশ

এবং বিশ্বের বস্তুগত কারণ—প্রকৃতি। ভগবান এবং আত্মা দুইটিই পৃথক অস্তিত্ব, তাহাদের যে সকল গুণ রহিয়াছে সেগুলি পরস্পরের মধ্যে বিনিময়যোগ্য নহে, এবং সেগুলি প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। যাহাই হউক, তাহারা অবিচ্ছেদ্য। ভগবৎ শক্তির মূল ক্রিয়া—সৃষ্টি—প্রাথমিক বস্তুগুলির ভগবৎ-শক্তিকৃত সংযোগ এবং শৃংখলার উর্ধ্বেই ঘটিয়া থাকে। আত্মার পার্থিব বন্ধন অজ্ঞানতার ফলেই হয়। মোক্ষ হইল ভ্রান্তি হইতে মুক্তি এবং বিধাতার স্বাধীনতাকে আয়ত্ত করা। কিন্তু উহা সাময়িক মাত্র, উহা শেষ হইলেই আত্মা পুনরায় অন্য দেহ গ্রহণ করে।...ইত্যাদি।

১ বিবাহে মেয়েদের ষোলো এবং পুরুষের বয়স অনূ্যন পঁচিশ হইতে হইবে। দয়ানন্দ বাল্য-বিবাহের কঠোর বিরোধী ছিলেন।

গ্রহণ করে। বিশেষত, পাঞ্জাবে এবং যুক্তপ্রদেশে উহা বালক ও বালিকাদের জন্য অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপন করে। বালক-বালিকাদের এই কর্ম-চক্রগুলি দুইটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানকে[১] কেন্দ্র করিয়া দুইটি দলে গড়িয়া উঠে। লাহোরের দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ এবং কাংড়ির গুরুকুল বিদ্যালয়। হিন্দুশিক্ষার দুইটি জাতীয় দুর্গ। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান একই সংগে জাতীয় শক্তিকে পুনর্জাগ্রত করিতে এবং পাশ্চাত্যের অধিগত বুদ্ধি ও শিল্প-কৌশলকে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

সেই সংগে অনাথ আশ্রম, বালক-বালিকাদের জন্য কারখানা, বিধবাদের আশ্রয়-ব্যবস্থা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও দেশের অন্যান্য বিপদে নানাপ্রকারের সামাজিক সেবা প্রভৃতি জনহিতকর কার্যও রহিয়াছে। এবং ইহা সুস্পষ্ট যে, আর্যসমাজ ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিদ্বন্দ্বী।[২]

দয়ানন্দ দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার জন্য আমি নেতার আত্মা সমন্বিত এই রূঢ় রুক্ষ সন্ন্যাসীটির সম্পর্কে যথেষ্ট বলিয়াছি। বস্তুতঃপক্ষে ভারতের জাতীয় চেতনার পুনর্জন্ম এবং পুনর্জাগরণের সেই মুহূর্তে দয়ানন্দই ছিলেন অব্যবহিত কর্মের সর্বাপেক্ষা প্রাণবান শক্তি। তাঁহারই

১ এই তথ্য আমরা দশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত লজপৎ রায়ের পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি। ঐ তারিখের পরে শিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলন দেশে সম্ভবত আরো প্রসার লাভ করিয়াছে।

লাহোরের দয়ানন্দ এ্যাংলোবেদিক কলেজ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সংস্কৃত, হিন্দী, পারসিক, ইংরেজী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি, বিজ্ঞান, কলা এবং শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। গুরুকুল বিদ্যালয় ১৯০২ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ছাত্ররা ষোল বৎসরের জন্য ত্যাগ, সংযম এবং আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইল নৈতিক শক্তির দ্বারা হিন্দুর দার্শনিক এবং সাহিত্যিক সংস্কৃতিকে সজীব করিয়া তদ্দ্বারা আর্যগণের চরিত্রকে গড়িয়া তোলা। পাঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি বৃহৎ কলেজও রহিয়াছে। সেখানে সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী, এই তিনটি ভাষার জ্ঞান এবং অন্যান্য মানসিক শিক্ষার সহিত স্ত্রীলোকদের উপযোগী বিষয় ও অর্থনীতিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

২ মনে হয়, এ বিষয়ে বিবেকানন্দ এবং তাঁহার শিষ্যরা দয়ানন্দকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। লজপৎ রায়-উল্লিখিত আর্য সমাজের প্রথম জনহিতকর কার্য হইল ১৮৯৭-১৮৯৮ খৃস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান। ১৮৯৪খৃস্টাব্দের পর হইতে বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্য অখণ্ডানন্দ এই জনসেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি অংশ দুর্ভিক্ষ এবং ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে এবং পর বৎসর প্লেগ রোগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন।

আর্যসমাজ, তাঁহার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়,[১] বাংলা দেশে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। দয়ানন্দ ছিলেন জাতীয় পুনর্গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋষি। আমি অনুভব করি, তিনিই প্রহরার কাজ করিতেছিলেন; তবে তাঁহার শক্তি ছিল তাঁহার দুর্বলতাও। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল কর্ম, এবং সে কর্মের সম্পাদন এবং জাতির সংগঠনই যথেষ্ট হইতে পারিত। কিন্তু ভারতের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল না—বৃহত্তর বিশ্ব তাহার ইচ্ছাশক্তির সম্মুখে প্রসারিত ছিল।

১ দয়ানন্দ এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিতে প্রকাশ্য ভাবে নিষেধ করেন। তিনি বৃটিশ-বিরোধী রাজনীতির সহিত বিজড়িত নয় বলিয়াই দাবী করিতেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার অন্যরূপ ভাবিলেন। সদস্যগণের কার্যকলাপের ফলে আর্যসমাজও বিদ্রোহে জড়াইয়া পড়িল।

রামকৃষ্ণ ও ভারতের মহান জননায়কগণ

সুতরাং, এই গিরিমালার ঊর্ধ্বে নির্মেঘ মহিমায় রামকৃষ্ণের নক্ষত্র যখন উদিত হইল, তখন, সেই মুহূর্তে, যাঁহারা ভারতের মহান্ জননায়কত্ব করিতেছিলেন, তাঁহারা ছিলেন এমনি।[১]

রামকৃষ্ণ এই পূর্বাচার্যগণের প্রথম জন রামমোহন রায়কে চিনিতেন না, তবে তিনি অন্য তিন জনকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতেন। রামকৃষ্ণের মধ্যে একটি দুর্বার ভগবৎ-পিপাসা ছিল, তাহার ফলে তিনি সর্বদা নিজেকে প্রশ্ন করিতেন, "আর কি কোনো ভগবৎ-নির্ঝর নাই, যাহার বারিধারা তিনি এখনো পান করেন নাই?" এবং এই তৃষ্ণা-তাড়নার ফলেই রামকৃষ্ণ তাঁহার পূর্বাচার্যগণের সহিত একে একে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের চোখ ছিল অভ্যস্ত, তাই প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন। বিচার করিবার শক্তি রামকৃষ্ণের মধ্যে চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ছিল। রামকৃষ্ণ তৃষ্ণার্ত ভক্তি সহকারে ঐ সকল নির্ঝরধারায় পান করিতে গেলেন, কিন্তু গিয়া তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে না হাসিয়াও পারিলেন না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘোষণা করিলেন, তাঁহার নিজের মধ্যে যে পানীয় ধারা উৎসারিত হইতেছে, তাহা এগুলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বাহিরের চাকচিক্য, জাঁকজমক এবং বাক্যঝংকারে বিমুগ্ধ অভিভূত হইবার মতো মানুষ ছিলেন না রামকৃষ্ণ। যে আলোকের সন্ধান তিনি করিতেছিলেন, সেই জ্যোতির্ময় বিধাতার মুখমণ্ডল ছাড়া অন্য কোনো আলোকেই তাঁহার অবগুণ্ঠিত দৃষ্টিকে ঝলসাইয়া দিতে পারিত না। তাঁহার চোখের দৃষ্টি দেহের প্রাচীর ভেদ করিয়া যেন

১ আমি সর্বশ্রেষ্ঠদের কথাই উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা ছাড়া আরো অনেকে ছিলেন। ভারতবর্ষে ভগবানের বাণীবাহক এবং ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার অভাব কখনো ঘটে নাই। এবং ঐ সময়ে অবিরাম তাঁহাদের আবির্ভাব ঘটিতেছিল। সম্প্রতি হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ লিখিত "*Religiose Reform-bewegungen im huetigen Indien*" (১৯২৮, লাইপসিগ, জে. সি. হেনরিখ, মর্গেনল্যাণ্ড সংগ্রহ) প্রবন্ধে দুইটি সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক প্রতিষ্ঠানের—নিরীশ্বরবাদী অতিমানবের উপাসক 'দেবসমাজ' এবং অতীন্দ্রিয়বাদী শব্দ ব্রহ্মের* উপাসক রাধাস্বামী সৎসংগের বর্ণনা আছে।

* সেই সর্বশক্তিমান্ সত্তার প্রতিনিধি, দুর্জ্ঞেয় শব্দ (ইহা আর বৈদিক যুগের ওঁ-র মতো একটি গৌণ স্থান মাত্র অধিকার করিয়া ছিল না) সম্বন্ধে এখানে বলা হইতেছে। উহা সেই স্বর্গীয় শব্দ, যাহা

বাতায়নের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিত এবং উদ্বিগ্ন কৌতূহলের সহিত অন্তঃস্তল পর্যন্ত সন্ধান করিয়া ফিরিত। কিন্তু সেখানে সে দৃষ্টি যাহা আবিষ্কার করিত, অনেক সময় তাহা তাঁহাকে অকস্মাৎ প্রশান্ত একটি উল্লাসে হাসাইয়া দিত। অবশ্য, সে হাসিতে বিন্দুমাত্র ঈর্ষা বা দ্বেষের চিহ্ন থাকিত না।

বিরাট-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিতও রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটে। রামকৃষ্ণ স্বয়ং সে-সাক্ষাৎ হাস্যচ্ছলে একদা বর্ণনা করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ণনার মধ্যে ঐ মহাগুরু রাজর্ষির প্রতি কনিষ্ঠের বিচারমূলক রসিকতা এবং অশ্রদ্ধান্বিত শ্রদ্ধার স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্বের মধ্যে কম্পিত এবং স্পন্দিত হইতেছে—উহা সেই উদ্‌ঘোষিত সংগীত, যাহা হইতে (প্রাচীন কালীন গ্রীক-রোমান ভাষায় বলিতে গেলে) শূন্যের সংগীত ধ্বনিত হইতেছে। মৈত্রায়ণী উপনিষদের অতীন্দ্রিয়বাদে ইহাকে একটি অন্যতম রূপে দেখা যায়। এখানে সেদুটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইল না, কারণ, সেদুটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের। ১৮৮৭ খ্রস্টাব্দে শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্র কর্তৃক দেবসমাজের প্রতিষ্ঠা হইলেও উহা ১৮৯৪ খ্রস্টাব্দের পরে "অতিমানবিক" নিরীশ্বরবাদী নাম গ্রহণ করে। যুক্তি, নীতি এবং বিজ্ঞানের নামে একজন "অতিমানব দেবগুরু" (এই ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং) ভগবানের বিরুদ্ধে যে তীব্র সংগ্রাম শুরু করেন, তাহার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে তিনি নিজেকে উপাস্য দেবতারূপে প্রচার করেন। বর্তমানে বিধাতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছে। রাধাস্বামী সৎসংগ পর পর অনুরূপ তিনজন গুরুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত তিনজন গুরু যথাক্রমে ১৮৭৮, ১৮৯৮ এবং ১৯০৭ খ্রস্টাব্দে মারা যান। এবং কেবলমাত্র গত শতাব্দীর শেষ হইতেই তাঁহাদের মতবাদ দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় উহাকে স্থান দিই নাই। দেব-সমাজের প্রধান কাযালয় লাহোরে। এই সম্প্রদায়ের ভক্তরা সকলেই প্রায় পাঞ্জাবের লোক। রাধাস্বামী সৎসংগের প্রধান দুইটি কেন্দ্র রহিয়াছে এলাহাবাদে এবং আগ্রায়। সুতরাং, ইহা লক্ষণীয় যে, এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই উত্তর ভারতে অবস্থিত। নানা নূতন ধর্মমত দক্ষিণ ভারতে প্রবর্তিত হইবার কথা গ্লাসেনাপ কিছুই লেখেন নাই। তবে সেগুলি দক্ষিণ ভারতে নিতান্ত অল্প ছিল না। মহাগুরু শ্রীনারায়ণের ধর্ম এমন ছিল যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া ত্রিবাংকুর রাজ্যে বহু লক্ষ ধর্মবিশ্বাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। (এই সেদিন মাত্র, ১৯২৮ খ্রস্টাব্দে শ্রীনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে।) তাঁহার মতবাদের মধ্যে শংকরের অদ্বৈতবাদী অধিবিদ্যার প্রভাব অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দেখা যায়। তবে এই মতবাদে কর্মের প্রতি অনুরাগ রহিয়াছে এবং সেই অনুরাগই উহাকে বংগদেশের অতীন্দ্রিয়বাদ হইতে স্পষ্টত পৃথক করিয়া দিয়াছে। বংগীয় অতীন্দ্রিয়বাদের মধ্যে ভগবৎ ভক্তির যে আতিশয্য রহিয়াছে, তাহা গুরু শ্রীনারায়ণকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, বলা চলে। তিনি একটি কর্মগত জ্ঞান, একটি বিরাট বুদ্ধিগত ধর্মের প্রচার করেন। এবং সেই ধর্মের মধ্যে জনসাধারণ এবং তাহাদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি সজীব বুদ্ধির পরিচয় মিলে। এই মতবাদ দক্ষিণ ভারতে উৎপীড়িত সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের কার্যে প্রচুর সহায়তা করে। এবং ইহার কার্যকলাপ কতক পরিমাণে গান্ধীর মতবাদের সহধর্মী ছিল। (১৯২৮ খ্রস্টাব্দের ডিসেম্বর এবং তাহার পরবর্তী কয়েক মাসে, জেনেভার 'দি সুফী কোয়ার্টার্লি' পত্রিকায় শ্রীনারায়ণের শিষ্য পি. নটরাজনের প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।)

একদা রামকৃষ্ণকে একজন প্রশ্ন করেন,[১] "সংসারের সহিত বিধাতার সামঞ্জস্যবিধান কি সম্ভব? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আপনার কি মত?"

রামকৃষ্ণ বিনতকণ্ঠে কয়েকবার উচ্চারণ করিলেন, "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর… দেবেন্দ্র…দেবেন্দ্র…" এবং কয়েকবার মস্তক নত করিয়া নমস্কার করিলেন। তারপর বলিলেন :

"তা জানো, এক জনার বাড়ী দুর্গোৎসব হ'তো, উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হতো। কয়েক বৎসর সে বলির আর ধূমধাম নাই। একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'মশাই, আজকাল যে আপনার বাড়ীতে বলির ধূমধাম নাই?' সে বললে, 'আরে! এখন যে দাঁত পড়ে গেছে।"

অশ্রদ্ধাবান কাহিনীকার বলিয়া চলিলেন, "দেবেন্দ্রও যে এখন ধ্যান-ধারণা করছেন, তা করবেনই তো। তিনি যে প্রৌঢ় বয়সে যোগাভ্যাসে মন দেবেন, তা তো স্বাভাবিক।"[২]

রামকৃষ্ণ থামিলেন। কিন্তু, আরো একবার নমস্কার করিয়া পরে বলিলেন, "তিনি যে একজন মানুষের মতো মানুষ, তাতে সন্দেহ নাই।"

১ কেশবচন্দ্র সেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী, এ. কে. দত্ত, এই কথোপকথনটির উল্লেখ করিয়াছেন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ দ্রষ্টব্য।)

২ অবশ্য, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রামকৃষ্ণের ব্যংগ-রসিকতা দেবেন্দ্রনাথের প্রতি ঘোর অবিচার করিয়াছে। রামকৃষ্ণ, সম্ভবত না জানার ফলেই, মহর্ষির পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থতা এবং তাঁহার কয়েক বৎসরব্যাপী কঠোর উদার আত্মত্যাগের কথা বিবেচনা করেন নাই। ইহার মধ্যে আমি একজন বড়ো অভিজাতের প্রতি জনসাধারণের মনোভাবকেই লক্ষ্য করিতেছি।

শশীভূষণ ঘোষ তাঁহার বাংলা স্মৃতিকথায় (২৪৫-৭ পৃঃ) যে বিবরণী দিয়াছেন, তাহাতে রামকৃষ্ণের গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তিকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া উক্ত ব্যংগের তিক্ততাকে কমাইয়া দিয়াছে। ফলে, রাজর্ষির প্রতি অধিকতর সুবিচার হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ বলেন, দেবেন্দ্রনাথের নিকট তিনি এইভাবে প্রথম পরিচিত হন : "ইনি একজন ভগবৎ-উন্মত্ত মানুষ!" দেবেন্দ্রনাথকে আমার অহংকারী মনে হইল। তবে, এতো জ্ঞান, এতো খ্যাতি, এতো সম্পদ, এবং সকলের নিকট এতো শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া তিনি অহংকারী বা না হইবেন কেন? কিন্তু আমি আবিষ্কার করিলাম, দেবেন্দ্রনাথের জীবনে যোগ এবং ভোগ পাশাপাশি ছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি সত্যই এই কলিযুগের রাজর্ষি জনক। জনক একই সংগে যোগ এবং ভোগ উভয়কেই সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারই মতো আপনার আত্মা ভগবানের জন্য উৎসর্গীকৃত রহিয়াছে, কিন্তু দেহ বস্তুর জগতে সঞ্চরণ করিতেছে। তাই আমি আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। আপনি ভগবান সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন।"

অতঃপর রামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত নিজের সাক্ষাৎকার বর্ণনা করেন।[১]

"প্রথমে আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন আমি তাঁকে দাম্ভিক বলেই মনে করেছিলাম। আর তাই ছিল স্বাভাবিক। সৎবংশ, সম্মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ, এমনি সব হাজারো গুণের ভারে তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।...আমি যখন কোনো মানুষকে ভালো ক'রে বুঝতে পারি তখন অকস্মাৎ আমি তাঁর মতো অবস্থা পাই। তখন আমি যদি ভগবানের দর্শন না পাই, তবে সব চেয়ে বড়ো পণ্ডিত মানুষকেও আমার তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান হয়।...তাই নিজের অজানতে আমি হেসে ফেললাম...কারণ, দেখলাম, এই লোকটি পার্থিব বস্তু উপভোগ করেছেন। অথচ সেই সংগে ধর্মাচরিত জীবনও যাপন করেছেন। তিনি অনেকগুলি সন্তানের জনক। সন্তানগুলি সবাই অল্পবয়স্ক। তাই তিনি জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও পার্থিব জগতের সংগে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি আমাদের একালের জনক রাজা। জনক রাজা পার্থিব বস্তুর সংগে জড়িত ছিলেন। কিন্তু তিনি উচ্চতম উপলব্ধির অধিকারীও হয়েছিলেন। আপনিও পার্থিব জগতের সংগে জড়িত আছেন, অথচ আপনার মন আছে ভগবানের সেই ঊর্ধ্বলোকে। আমাকে ভগবান সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন!'

দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের নিকট বেদ হইতে কয়েকটি সুন্দর শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।[২]

১ তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স মাত্র চারি বৎসর। রামকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষক মথুরবাবু দেবেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। তিনিই দেবেন্দ্রনাথের সহিত রামকৃষ্ণের পরিচয় করাইয়া দেন। এই সাক্ষাৎকারের কৌতূহলোদ্দীপক বিশদ বর্ণনা আমাদের ইউরোপীয় মনো-দেহ-বিজ্ঞানীদিগের ভালো লাগিতে পারে। প্রথম পরিচয় শেষ হইবার সংগে সংগেই রামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথকে পোশাক খুলিয়া বুক দেখাইতে বলিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ বিস্মিত না হইয়া তাহাই করিলেন। ত্বকের বর্ণ ছিল রক্তিম। রামকৃষ্ণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। এই স্থায়ী রক্তিমা কোনো কোনো যোগাভ্যাসের অন্যতম বিশেষ লক্ষণ। রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের বুক এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ক্ষমতা পরীক্ষা না করিয়া কখনও তাঁহাদিগকে যোগাভ্যাস করিতে দিতেন না।

২ "ঝাড় লণ্ঠনের মতোই এই বিশ্ব। আমরা প্রত্যেকে তাহার এক একটি বাতি। আমরা যদি দগ্ধ না হই, তবে সমগ্র ঝাড় অন্ধকার হইয়া থাকিবে। ভগবান তাঁহার মহিমা উদ্‌ঘোষিত করিবার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

শশীর বর্ণনা অনুসারে রামকৃষ্ণ সরল ভাবে বলেন:

"অদ্ভুত! আমি যখন পঞ্চবটীতে (দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে) বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম, তখন একটি ঝাড় লণ্ঠনের রূপই দেখিতে পাইলাম। দেবেন্দ্রনাথের নিশ্চয় গভীর পাণ্ডিত্য ছিল।"

রামকৃষ্ণের সহিত দেবেন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুরেই চলিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অতিথির চক্ষের দীপ্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং রামকৃষ্ণকে পরদিন একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। তবে সেই সংগে তিনি তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যদি আসিতে চান, তবে তিনি যেন "তাঁহার দেহটা একটু ঢাকিয়া আসেন"। কারণ তীর্থংকর রামকৃষ্ণের পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। রামকৃষ্ণ দুষ্টামি করিয়া জবাব দিলেন, সে-ভরসা তিনি দিতে পারেন না। তিনি যেমন মানুষ, তেমনভাবেই আছেন, এবং সেই ভাবেই তিনি আসিবেন। এই ভাবে মধুর সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তাঁহারা বিদায় লইলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালেই দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে একটি সৌজন্যপূর্ণ পত্র আসিল, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণকে অনর্থক কষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এইভাবে ব্যাপারটি শেষ হইল। এমনি ভাবেই আভিজাত্য তাহার থাবার একটিমাত্র সস্নেহ আঘাত দিয়াই ভাববাদের স্বর্গে আপনাকে সাবধানে সরাইয়া ফেলিল।

দয়ানন্দের বর্ণনা রামকৃষ্ণ আরো সংক্ষেপেই করেন। তিনি তাঁহাকে বিচার করিয়া দেখেন এবং আরো সাধারণ স্তরের মানুষ বলিয়া ভাবেন। তবে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, যখন ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে তাঁহাদের দুইজনের সাক্ষাৎ হয়, তখনো আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় নাই এবং তখনো সংস্কারক দয়ানন্দ কেবল মাত্র তাঁহার কর্মজীবনের মাঝামাঝি আসিয়া পৌছিয়াছেন। রামকৃষ্ণ দয়ানন্দকে বিচার করিয়া[1] তাঁহার মধ্যে "সামান্য মাত্র শক্তির" পরিচয় পান। শক্তি বলিতে রামকৃষ্ণ ভগবানের সহিত বাস্তবিক যোগাযোগের কথাই বলেন। বৈদিক প্রচারক দয়ানন্দের চরিত্রের

১ দয়ানন্দের বক্ষেও রামকৃষ্ণ রক্তাভা লক্ষ্য করেন। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তারিখের একটি সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে) যে উল্লেখ করিয়াছেন, রামকৃষ্ণ তাহাতে দয়ানন্দ সম্পর্কে একটি অদ্ভুত মন্তব্য করেন, বলা হইয়াছে। বৈদিক দেবতাগণে কেশবচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন না। রামকৃষ্ণ নাকি শুনিয়াছিলেন যে, দয়ানন্দ তাহার প্রতিবাদে কেশবচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া বলেন, ভগবান এতো কিছুই করিয়াছেন, তবে তিনি দেবতাগণকেই বা সৃষ্টি করিতে পারেন না কেন?" অনেকেশ্বরবাদের ঘোর শত্রু দয়ানন্দ যে-মতবাদ প্রচার করিতেন, তাহার সহিত ইহার কোনো সামঞ্জস্য নাই। দয়ানন্দের কথাগুলি রামকৃষ্ণের নিকট বিকৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছিল, কিম্বা দেবতাদিগের সম্বন্ধে না বলিয়া এই কথাগুলি দয়ানন্দ বেদে বর্ণিত যজ্ঞাগ্নি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,—বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী হওয়ায় এই যজ্ঞাগ্নি সম্পর্কে দয়ানন্দের বিশ্বাস ছিল স্থির। আমি এই আপাত বৈপরীত্যের কোনো সামঞ্জস্য বা সমাধান খুঁজিয়া পাই না।

উৎপীড়িত হইবার এবং উৎপীড়ন করিবার দিকটি, বা তাহার বৈরীভাবাপন্ন সংগ্রামের দিকটি বা একমাত্র তিনিই নির্ভুল, সুতরাং, একমাত্র তাঁহার ইচ্ছাকেই সকলের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার অধিকার তাঁহার রহিয়াছে, তাঁহার এই কথা বারে বারে উত্তেজিতভাবে ঘোষণা করিবার দিকটি, দয়ানন্দের আদর্শের কয়েকটি ত্রুটি রূপে রামকৃষ্ণের চক্ষে ধরা পড়িয়াছিল। রামকৃষ্ণ লক্ষ্য করেন, দয়ানন্দ দিবারাত্রি শাস্ত্রবাক্য লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিকৃত করিতেছেন, এবং একটি নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ব্যক্তি-গত এবং পার্থিব সাফল্যের চিন্তা সত্যকারের ভগবৎ-প্রেমকে কলংকিত করে। তাই রামকৃষ্ণ দয়ানন্দ হইতে দূরে সরিয়া আসেন।

কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। সে সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, স্নেহপরায়ণ এবং চিরস্থায়ী।

রামকৃষ্ণ এবং কেশবচন্দ্র সম্পর্কে কিছু বলিবার পূর্বে আমি দুঃখের সহিত জানাইতে চাই, তাঁহাদের উভয়ের শিষ্যরাই পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। একের শিষ্যেরা অন্য ভগবৎ ভক্তকে নিজেদের গুরুদেবের অনুগতে পরিণত করিতে প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণের শিষ্যেরা তবু কেশবচন্দ্রকে সহানুভূতির চক্ষে দেখেন এবং তিনি পরমহংসকে শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের অনেক শিষ্য ছিলেন, যাঁহারা কেশবচন্দ্রের অপেক্ষা রামকৃষ্ণের বাস্তবিক বা কাল্পনিক প্রভাব-প্রতিষ্ঠার জন্য রামকৃষ্ণকে কখনো ক্ষমা করিতে পারেন না। সুতরাং কেশবচন্দ্রের উপর রামকৃষ্ণের যে কোনও প্রভাব থাকিতে পারে, তাহা অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা রামকৃষ্ণ এবং কেশবচন্দ্রের মধ্যে চিন্তার দুস্তর দুর্লংঘ্য একটি প্রাচীর খাড়া করিবার মতলব করিয়াছেন। তাঁহারা ঘৃণার সহিত রামকৃষ্ণের সত্যকার মূল্যকেও বিকৃত করিয়া তোলেন। যিনি রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করিয়া তাহাকে একদা কার্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দকেও তাঁহারা ঘৃণা করিতেন।[১]

---

১ আমি প্রধানত বি. মজুমদার-রচিত পুস্তিকা *Professor Max Muller on Ramakrishna; The World on K. Chunder Sen* (১৯০০, কলিকাতা) পুস্তকের কথা ভাবিতেছি। তুলনীয়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: *'Absurd Invention and Reports made to Max Muller by the Disciples of Ramakrishna'*, ৩য় পরিচ্ছেদ: *"Differences between Two Doctrines,"* এবং সর্বোপরি অপমানজনক পঞ্চম পরিচ্ছেদ: *Concerning Vivekananda, the Informant of Mux Muller;* স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম সংক্রান্ত বিতর্কে প্রচণ্ডভাবে যে সকল অ্যাংলো-মার্কিন পাদরিদের আঘাত করিয়া-ছিলেন, এই পরিচ্ছেদে তাঁহাদের সহিত হাত মিলাইতে-ও লেখক বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

আমি কেশবচন্দ্রের রচনার কতিপয় সুন্দর ও সজীব পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বিবেকানন্দের চিন্তা ও ধর্মের পূর্বাভাস স্পষ্টরূপেইরহিয়াছে। আমি সেগুলি পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, রামকৃষ্ণ মিশন এ বিষয়ে নীরব ও বিস্মৃত থাকায় ব্রাহ্মরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এই অবিচারের সংশোধনের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কারণ, আমার বিশ্বাস, এই ব্যাপারটি বুদ্ধিহীনতারই পরিচয়। কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মসমাজী কেশবচন্দ্রকে তাঁহাদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চান এবং রামকৃষ্ণের প্রতি কেশবচন্দ্রের যে নিঃস্বার্থ প্রীতি ছিল, তাহাকে চাপা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের স্মৃতিকেই আঘাত করেন। কেশবচন্দ্র যখন তাঁহার খ্যাতি ও চিন্তাশক্তির শীর্ষদেশে, তখন হইতে তাঁহার শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের এই ক্ষুদ্র, হয় অখ্যাত, নয় বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত, মানুষটির জন্য যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের মনোভাব পোষণ করিতেন, শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপযুক্ত কেশবচন্দ্রের সমগ্র জীবনের মধ্যে আমাদের কাছে তেমন আদরের আর কিছুই নাই। ঐ "ভগবৎ-উন্মত্ত" মানুষটির সহিত শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর কেশবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় ব্রাহ্মদের আত্মম্ভরিতায় আঘাত লাগিত। এবং তাহারই ফলে তাঁহারা কেশবচন্দ্রের বিভিন্ন রচনা হইতে তাঁহাদের মতে, রামকৃষ্ণের উচ্ছৃংখল ভাবোচ্ছ্বাস[১] সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের সদর্প বিরুদ্ধ মতামতগুলিকে যতোই উদ্‌ধৃত করিতে লাগিলেন, ততোই রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের বাস্তবিক সম্পর্কটি আরো বিস্ময়কর হইয়া উঠিল।

১ বি. মজুমদার রচিত পূর্বোল্লিখিত পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। কেশবচন্দ্র তাঁহার যোগ সংক্রান্ত প্রবন্ধে বলেন: "জ্ঞান ও ভক্তি, কথা দুইটি পরস্পরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। যিনি জ্ঞানী, কেবল তাঁহার পক্ষেই ভক্তি সম্ভব। অজ্ঞান ভক্ত অসম্ভব।" কিন্তু ইহাতে রামকৃষ্ণের ধর্মভাবোচ্ছ্বাসকে নিন্দা করা হয় না। কারণ, সেজন্য প্রথমে প্রমাণ করা প্রয়োজন যে, রামকৃষ্ণের ধর্মভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে কোনো প্রকারের জ্ঞান ছিল না। ইহা হইতে কেবলমাত্র লক্ষ্য করা যায় যে, কেশবচন্দ্রের ধ্যান-ধারণার প্রকৃতি ভিন্ন রূপ ছিল। কেশবচন্দ্রের নিকট সর্বোচ্চ অবস্থা ছিল পরমপুরুষের সহিত মনের মিলন—যে-মিলনের ফলে জীবন, সমাজ এবং গৃহের বহু বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধি অস্পষ্ট হয় না। কেশবচন্দ্রের মতামতগুলি ব্রাহ্ম-সমাজের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল। পরে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে, বি. মজুমদার কেশবচন্দ্রের একটি উক্তি উদ্‌ধৃত করেন: "যোগী যদি যোগের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে, তবে সে যোগীকে শত ধিক।...যাহাদের পালনের ভার ভগবান আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাদিগকে ত্যাগ করা পাপ।" বি. মজুমদার দাবী করেন যে, তিনি কেশবচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে রামকৃষ্ণের প্রতি ইংগিত লক্ষ্য করিয়াছেন; রামকৃষ্ণ তাঁহার স্ত্রীর প্রতি তাঁহার কর্তব্য পালন করিতেছিলেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁহার স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করিতেছিলেন, একথা বলা মিথ্যা। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার প্রেম কেবল শুদ্ধ এবং সুগভীর ছিল না। স্ত্রীর মধ্যে প্রেমকে

ভারতবর্ষের অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিই গুরু, অর্থাৎ ভগবান এবং নিজের মধ্যে একজন মধ্যস্থ, গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র যদি সেরূপ কোনো গুরু গ্রহণ না করিয়া থাকেন,[১] যাহার ফলে কেশবচন্দ্রকে রামকৃষ্ণের শিষ্য বলিয়া দাবী করিবার—রামকৃষ্ণের শিষ্যেরা এইরূপ দাবী করেন[২]—উপায় কাহারও না থাকে, তবে কেশবচন্দ্রের উদার মনোভাব যে সকল প্রকার মহত্ত্বকে গ্রহণের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত ছিল, তাহা বলা চলে। কারণ, কেশবচন্দ্রের সত্যের প্রতি প্রীতি এত ব্যাপক ছিল যে, তাহাতে আত্মম্ভরিতার বিন্দুমাত্রও স্থান ছিল না। সুতরাং শিক্ষক কেশবচন্দ্র শিক্ষালাভ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।[৩] তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমি জাত ছাত্র।...সকল বস্তুই আমার শিক্ষক। আমি সকল কিছু হইতে শিক্ষালাভ করি।"[৪] সুতরাং তিনি ভগবৎ-উন্মত্ত রামকৃষ্ণের নিকট হইতেও শিক্ষালাভ না করিয়া কেমন করিয়া পারেন?

১৮৭৫ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে কয়েক মাস কেশবচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী একটি বাগানবাড়ীতে সশিষ্য বাস করিতেছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান[৫] এবং বলেন:

কেমন করিয়া উদ্‌বুদ্ধ করিতে হয়, তাহাও তিনি জানিতেন, যে-প্রেম তাঁহার স্ত্রীর নিকট শান্তি ও সান্ত্বনার উৎসে পরিণত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ স্ত্রীর প্রতি তাঁহার দায়িত্বকে কিরূপ গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে তিনি কিরূপে তাঁহাদিগের উপর নির্ভরশীল পিতামাতা এবং স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের প্রতি গৃহীত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিতে দেন নাই, তাহা ইতিপূর্বেই আমি আলোচনা করিয়াছি।

১ কেশবচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "আমার ধর্ম-জীবনের আরম্ভ হইতে, হে ভগবান, আমি কেবলই তোমার নিকট হইতে আমার শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি।..."

২ এই খণ্ডের শেষে ইংরাজী সংস্করণের প্রকাশের টীকা দ্রষ্টব্য।—অনু:

৩ আনন্দের বিষয় যে, আমি যে মত পোষণ করি, তাহা আমি কেশবচন্দ্রের খৃস্টান শিষ্য মণিলাল সি· পারেখ-লিখিত বিশ্বাসোজ্জ্বল সুন্দর গ্রন্থ "ব্রহ্মর্ষি কেশবচন্দ্র সেন"-এর মধ্যেও লক্ষ্য করিয়াছি। ('ব্রহ্মর্ষি কেশবচন্দ্র সেন', ১৯২৬ খৃস্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল ক্রাইস্ট হাউস, রাজকোট, বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) মণিলাল সি· পারেখ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে কেশবচন্দ্রের নিকট সম্ভবত রামকৃষ্ণ যতোখানি ঋণী ছিলেন, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী ঋণী ছিলেন কেশবচন্দ্র,—রামকৃষ্ণের নিকট। কিন্তু উহার মধ্যে মণিলাল আমার মতোই কেশবচন্দ্রের মানসিক উদারতা এবং মহৎ হৃদয়ের প্রশংসা করিবার অন্যতম কারণের সন্ধান পাইয়াছেন।

৪ কিন্তু কেশবচন্দ্র এ কথাও বলেন: "প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেকটি গুণের আকাঙ্ক্ষী হইবার শক্তি ভগবান আমার মধ্যে ন্যস্ত করিয়াছেন।"

৫ রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে প্রথম দেখেন। ঐ সময় কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্ম সমাজের পরিচালনায় দেবেন্দ্রনাথের সহকারিত্ব করিতেছিলেন। কেশবচন্দ্রের মুখ রামকৃষ্ণের চোখে পড়ে। সে

"শুনলাম, তুমি নাকি ভগবানের দর্শন পেয়েছ। কি দেখেছ, আমি তাই দেখতে এলাম।"

বলিয়া রামকৃষ্ণ একটি বিখ্যাত শ্যামা-সঙ্গীত গাহিলেন। এবং গাহিতে গাহিতেই ভাবাবিষ্ট হইলেন। যুক্তিবাদী হিন্দুদের নিকটও এইরূপ দৃশ্য অসাধারণ কিছুই ছিল না। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি, কেশবচন্দ্র এই ধরণের ভক্তির, বলা চলে অসুস্থ, প্রকাশ-ভংগিকে যথেষ্ট সন্দেহের চক্ষেই দেখিতেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাধ্যযত্নে যখন সমাধি হইতে জাগিয়া উঠিলেন,[১] তখন তিনি যদি অদ্বিতীয় অনন্ত ভগবান সম্পর্কে অনর্গল সুন্দর কতকগুলি কথা উচ্চারণ না করিতেন, তবে কেশবচন্দ্র বিন্দুমাত্রও বিমুগ্ধ বিস্মিত হইতেন না। রামকৃষ্ণের এই ভাবোচ্ছ্বাস-অনুপ্রাণিত অনর্গল কথাগুলির মধ্যেও তাঁহার শ্লেষাত্মক বিচারবুদ্ধি বিন্দুমাত্রও ব্যাহত ছিল না এবং এই ব্যাপারটাই কেশবচন্দ্রকে বিস্মিত বিচলিত করিল। কেশবচন্দ্র তাঁহার শিষ্যদিগকে এই বিষয়টি লক্ষ্য করিতে বলিলেন। অল্পকালের মধ্যেই কেশবচন্দ্রের আর কোন সংশয় রহিল না যে, একজন অসাধারণ ব্যক্তির সংস্পর্শে তিনি অসিয়াছেন। এই অসাধারণত্ব কি, কেশবচন্দ্র তাহার সন্ধান করিতে চাহিলেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব হইল। কেশবচন্দ্র তাঁহার ব্রহ্ম-সমাজের উৎসবে রামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তিনি রামকৃষ্ণকে মন্দির হইতে গঙ্গাতীরে বেড়াইবার জন্যও সংগে লইয়া যাইতেন। কেশবচন্দ্রের মন ছিল উদার, তাই তিনি রামকৃষ্ণের মধ্যে যাহা কিছুই

মুখ সহজে ভুলিবার মতো ছিল না। কেশবচন্দ্র ছিলেন দীর্ঘকায়, তাঁহার মুখমণ্ডল ছিল ডিম্বাকৃতি। "তাঁহার গাত্রবর্ণ ছিল ইতালীয়দের ন্যায় স্বচ্ছ"। (—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়) কেশবচন্দ্রের মানসিক অবস্থা, তাঁহার মুখমণ্ডলের ন্যায়, পশ্চিমের অপ্রখর সূর্যালোকে উদ্‌ভাসিত হইলেও, আত্মার গভীরে তিনি ছিলেন নিতান্ত ভারতীয়। রামকৃষ্ণ ধ্যানস্থ কেশবচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ভুল করেন নাই। রামকৃষ্ণ ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বলেন, "কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি সমাজে। তাকের (বেদীর) উপর ক'জন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ। সেজবাবুকে বললুম, দেখ, ওর ফাৎনায় মাছ খেয়েছে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ২য় ভাগ, ২০৭ পৃঃ—অনুঃ) উপমাটি অত্যন্ত পরিচিত, অর্থ, ভগবান তাঁহার প্রার্থনায় সাড়া দিতেছেন।)

১ ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপকারার্থে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রামকৃষ্ণকে তাঁহার ভাবাবেশ হইতে জাগাইবার জন্য ভাবাবেশের তীব্রতা এবং প্রকারভেদ অনুসারে তাঁহার কানে ভগবানের বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত। আত্মিক অভিনিবেশের লক্ষণ তখন অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিত; এবং প্রারম্ভিক দৈহিক বিশৃংখলার কথা বলা সম্ভব ছিল না; সমস্ত কিছুই আত্মিক শক্তির বশীভূত থাকিত।

আবিষ্কার করিলেন, তাহাই তিনি অন্যান্য সবাইকে জানাইতে লাগিলেন ; বক্তৃতায়, পত্রিকাদিতে, রচনায়, ইংরেজিতে, বাংলায় সর্বত্রই সর্বভাবে তিনি রামকৃষ্ণের কথা কহিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার নিজের খ্যাতিকে রামকৃষ্ণের হাতে তুলিয়া দিলেন। এ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের খ্যাতি, দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, ধর্মভীরু জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে নাই। কেশবচন্দ্র অল্পকালের মধ্যেই বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে তাঁহাকে পৌছাইয়া দিলেন।

গ্রন্থবিদ্যাহীন, সংস্কৃতশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, লিখন পঠনে অপটু, এই অজ্ঞাতনামা মানুষটির কাছে ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত নেতা এবং বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, সম্মানে ও মর্যদায় সমৃদ্ধ কেশবচন্দ্র যেভাবে নতি স্বীকার করিলেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু রামকৃষ্ণের সুগভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কেশবচন্দ্রকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল। কেশবচন্দ্র শিষ্যের মতো রামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া রহিলেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব লইলেন, যেমনটি রামকৃষ্ণের কোনো কোনো অত্যুৎসাহী শিষ্য দাবী করেন। ইহাও সত্য নহে যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার মূল চিন্তার কোনো কোনোটি রামকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১] কারণ ঐ সকল ধারণা রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাতের পূর্বেই কেশবচন্দ্রের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, ১৮৬২ খৃস্টাব্দের পরেই কেশবচন্দ্র বিভিন্ন ধর্মের আদিম ঐক্য এবং সেগুলির সংগতিবিধান সম্পর্কে চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছেন। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে তিনি বলেন : "সমস্ত সত্যই সকলের কাছে সমান, কারণ, সকল সত্যই ভগবানের সত্য। সত্য যেমন কেবল ইউরোপবাসীর নহে, তেমনি তাহা কেবল এশিয়াবাসীরও নহে, তেমনি তাহা কেবল আপনার নহে, কেবল আমার নহে।" ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে 'ভাবী ধর্ম' Future Church সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসংগে কেশবচন্দ্র সকল ধর্মের একটি বিপুল সমন্বয় কল্পনা করেন। এই সমন্বয়ের মধ্যে সকল ধর্ম তাহার স্ব স্ব পার্থক্য, সংগীত-যন্ত্রের স্বতন্ত্র সুর ও স্বতন্ত্র ধ্বনি বজায় রাখিয়া পিতা ভগবান এবং ভ্রাতা মানবের বিশ্বব্যাপী জয়গানে একত্রিত হইবে। পাশ্চাত্যের জগৎ-পিতার ধারণার মতোই ভারতবর্ষে যুগে যুগে জগন্মাতার ধারণাটি প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং জগন্মাতা সম্পর্কিত ধারণায় উপনীত হইবার জন্য কেশবচন্দ্রের রামকৃষ্ণকে যে কোনো প্রয়োজন ছিল, এমন দাবীও মিথ্যা। জগন্মাতা সম্পর্কে ধারণাটিকে রামকৃষ্ণ সৃষ্টি করেন নাই রামকৃষ্ণের স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রামপ্রাসাদের গানগুলির মধ্যেও সেই 'মা'র

১ এই খণ্ডের শেষে ইংরাজী সংস্করণের প্রকাশের টীকা দ্রষ্টব্য।—অনুঃ।

কথাই বিভিন্ন সুরে গীত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যের যুগেই ব্রাহ্ম-সমাজে ভগবানের মাতৃত্ব সম্পর্কে ধারণাটি গৃহীত হইয়াছিল। তাই কেশবচন্দ্রের শিষ্যরা তাঁহাদের গুরুদেবের রচনা হইতে মাতৃবন্দনা উদ্ধৃত করিতে বেগ পাননাই।[১]

জগন্মাতা এবং তাঁহার ভক্তদের ভ্রাতৃত্ব এই দুইটি সহজাত ধারণার প্রকাশ বা অনুষ্ঠান যে রূপই হউক, ধারণা দুইটি যে সুন্দর, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ধারণা হিসাবে এ দুইটিকে কেশবচন্দ্র ইতিপূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অকপট বিশ্বাসের জোরে সেগুলি পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণের মতো মানুষের মধ্যে জীবন্ত শক্তিমান অবস্থায় এই দুইটি ধারণার সাক্ষাৎ পাওয়া ছিল স্বতন্ত্র কথা। এই ক্ষুদ্র সর্বহারা মানুষটি থিওরি লইয়া মাথা ঘামান নাই। তাঁহার অস্তিত্বই ছিল যথেষ্ট। তাঁহার অস্তিত্ব ছিল ভগবান এবং ভক্তদের মধ্যে যোগাযোগের অস্তিত্ব। তাঁহার অস্তিত্ব ছিল 'মা' এবং তাঁহার প্রিয়জনের মধ্যে সম্পর্কের অস্তিত্ব। তিনি 'মাকে' দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্য দিয়াই 'মা' দৃষ্ট হইয়াছিলেন, 'মা' স্পষ্ট হইয়াছিলেন। যাঁহারাই এই অনুভূতি-প্রতিভার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই দেবীর উষ্ণ নিঃশ্বাস এবং তাঁহার সুন্দর বাহুবন্ধের স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলেন। কেশব নিজেও ছিলেন ভক্ত, ভালোবাসার মধ্য দিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং রামকৃষ্ণের ন্যায় অনুভূতি-প্রতিভাকে আবিষ্কার করা এবং তাঁহার নিবিড় সংস্পর্শে আসা কেশবচন্দ্রের পক্ষে কী অপূর্বই না হইয়াছিল[২]!...

১ ১৮৬২ খ্রস্টাব্দে: কেশবচন্দ্র তখনো দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্ম সমাজে পৌরোহিত্য করিতেন, তখন একটি শ্যামাসঙ্গীত গীত হয়: "মায়ের কোলে বসে" ইত্যাদি।

১৮৬৬ খ্রস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের কড়চা: "মা, তোমার করুণা দিয়ে বাঁধো, মা, তুমি এসো, মা, তোমার কাছে নাও।" ইত্যাদি।

১৮৭৫ খ্রস্টাব্দে: "আমি সুখী। আমি আমার মার অন্তরে নিমজ্জিত হইয়াছি, আমি মার সন্তানদের মধ্যে রহিয়াছি; মা তাঁহার সন্তানদের সহিত নৃত্য করেন।..."

কিন্তু এই শেষোক্ত তারিখটির পূর্বেই কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটে। বি. মজুমদার রচিত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২ প্রমথলাল সেন বলেন, কেশচবন্দ্র প্রতিদিনই ভগবানের নিকট নিজেকে বলিতেন:

"উপাসনাই তোমার প্রধান কর্তব্য হোক। অবিরাম, উৎসাহভরে তুমি উপাসনা করো। একাকী, এবং একত্রে। উপাসনাই তোমার জীবনের একমাত্র উপজীব্য হোক।"

কেশবচন্দ্রের অন্যতম জীবনীকার চিরঞ্জীব শর্মা বলেন, "রামকৃষ্ণের সহজ, সরল, উদার, মধুর প্রকৃতি কেশবচন্দ্রের যোগাভ্যাস এবং ধর্ম সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণাকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করে।"

কেশবচন্দ্রের অন্যতম ধর্ম-প্রচারক শিষ্য বাবু গিরিশচন্দ্র সেন[১] লিখিয়াছেন :

"শিশুর ন্যায় সহজ বাৎসল্যে মধুর মাতৃ নামে ভগবানকে ডাকিবার ধারণাটি কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন[২]।...

উপরোক্ত কথাগুলির কেবল উদ্ধৃত শেষাংশ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন : কারণ, আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ভগবানকে মাতৃরূপে আহ্বান করিবার জন্য কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের অপেক্ষা করেন নাই। অবশ্য রামকৃষ্ণ এই আহ্বানের মধ্যে নূতন করিয়া বাৎসল্য, আশু নিশ্চয়তা এবং শিশুর সহজ সারল্য আনিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্র যখন প্রচার করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পথ রামকৃষ্ণের পথের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছে[৩], তখন তাহা নববিধানের আবিষ্কার মাত্র ছিল না, বরং তাহা ছিল কেশবচন্দ্রের ধর্ম বিশ্বাস এবং উল্লাসের দুর্নিবার, এক উৎসার, যে উৎসার, তাঁহার বাণীকে বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিল।

১ 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত পরমহংস রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্পর্কে প্রবন্ধ।

২ রামকৃষ্ণের ভক্তরা বাবু গিরিশচন্দ্র সেন এবং চিরঞ্জীব শর্মার রচনা হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম সমাজের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করিয়াছে। প্রমাণের বাড়াবাড়িটা মানুষকে সন্দেহভাজন করিয়া তোলে। চিরঞ্জীব যে বলিয়াছেন, "কেশবচন্দ্রের ভগবানকে মাতৃরূপে পূজা করা রামকৃষ্ণের প্রভাবের ফলেই ঘটিয়াছিল" ইহা তথ্যবিরোধী। রামকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজে মাতৃপূজার ধারাটিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল, একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ব্রাহ্ম সমাজের অনুষ্ঠান ও আংগিকগুলি কঠিন ছিল বলা চলে। বাবু গিরিশচন্দ্র সেনের কথায়, "রামকৃষ্ণের ছায়ায় তাহা অনেকখানি নরম হইয়াছিল।"

৩ তবে প্রতাপচন্দ্র তাঁহার রচিত কেশবচন্দ্রের সহানুভূতিপূর্ণ জীবনী গ্রন্থে স্বীকার করেন যে, রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাতের ফলে 'নববিধানের' মূল একেশ্বরবাদী রূপের কোনো পরিবর্তন হয় নাই, কেবল তাহার ফলে কেশবচন্দ্র একেশ্বরবাদকে আরো আপোষমনোভাবাপন্ন ও সহজগ্রাহ্যরূপে প্রকাশ ও প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, এই মাত্র।

রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের অনেকেশ্বরবাদের মূল ভাবগুলিকে একটি চয়নপন্থী আধ্যাত্মিকতার মৌলিক কাঠামোর মধ্যে সংগ্রহ ও সঞ্চিত করিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত চয়নপন্থিতা হইতেই কেশবচন্দ্রের গুণগ্রাহী মনে তাঁহার নিজের ধর্মান্দোলনের আধ্যাত্মিক গঠনটিকে আরো বিস্তৃত করিবার কথা উদিত হইয়াছিল।... হিন্দুধর্মে ভগবানের যে বহু বিভিন্ন গুণের ভাবগুলি প্রচলিত রহিয়াছে, সেগুলি স্বতঃই কেশবচন্দ্রের নিকট সুন্দর এবং সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। এবং কেশবচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মমতকে দেশের

ব্রাহ্মণদিগের নিকট রামকৃষ্ণ ছিলেন এক বিস্ময়কর শক্তির উৎস। তিনি ছিলেন পেন্টেকস্ট উৎসবে[১] অ্যাপস্‌ল্‌গণের[২] মস্তকের ঊর্ধ্বে প্রজ্জ্বলিত নর্তমান বহ্নির একটি শিখা, যে শিখা দগ্ধ হইতেছিল এবং আলোক দান করিতেছিল। রামকৃষ্ণ ছিলেন ব্রাহ্মণদের যেমন অকপট বন্ধু, তেমনই বিচারক। তিনি তাঁহাদের যেমন স্নেহ করিতেন, তেমনি করিতেন তীব্র কঠোর সমালোচনা।

রামকৃষ্ণ যখন সর্বপ্রথম পরিদর্শন করেন, তখন তাঁহার অন্তর্ভেদী ও কৌতুক-পরায়ণ দৃষ্টির ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রেষ্ঠ সদস্যগণের প্রথাগত ভক্তির দিকটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। তাঁহার প্রদত্ত রসিকতাপূর্ণ বিবরণী নিম্নোক্তরূপ[৩] :

আচার্য বলেন, 'আসুন, আমরা 'তাঁর' সংগে যোগসাধন করি।' আমি ভাবলাম, 'এবার তাঁরা বুঝি অন্তর্জগতে যাবেন এবং সেখানে অনেকক্ষণ থাকবেন।' ওমা, কয়েক মিনিট না যেতেই তাঁরা সকলেই চোখ মেললেন। আমি ত অবাক। এই সামান্য মাত্র ধ্যান ক'রেই কেউ কখনো তাঁর সন্ধান পায়? অনুষ্ঠান শেষ হবার পর আমি একলা ছিলাম, তখন কেশবকে এ সম্বন্ধে বললাম : 'উপাসনা-সভায় যখন ওঁরা চোখ মুদে ছিলেন তখন আমি ওঁদের লক্ষ্য করছিলাম। আমার কি মনে হচ্ছিল জানো? মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আমি গাছের তলায় এই ভাবে বাঁদরগুলোকে বসে থাকতে দেখেছি। অনড়, অসাড়, যেন কিছুই জানে না।…কিন্তু তারা তখন একটু বাদে কোন্ বাগানে কোথায় গিয়ে কি ফল ছিঁড়বে, কি মূল তুলবে, কি অন্য খাবার যোগাড় করবে, তার কথাই ভাবছিল, আর তলে তলে সব মতলব আঁটছিল। তোমার শিষ্যরা আজ যেভাবে ভগবানের সংগে যোগ সাধন করলেন তা তার চেয়ে বেশী কিছু হলো মনে হয় না।"

লোকের নিকট বোধগম্য করিয়া তুলিতে হইলে সেগুলিকে সত্য এবং সুন্দররূপে গ্রহণ করাই ছিল অভ্রান্ত উপায়। অবশ্য, কেশবচন্দ্র তাঁহার একেশ্বরবাদের সহজ সরল বিশ্বব্যাপী ভিত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের সহিত সেই সংগে মজুমদার বলিয়াছেন, ভগবানের বহু গুণের সহিত মিশ্রিত করিয়া একেশ্বর-বাদকে এইরূপ ব্যাখ্যা ও প্রচার করার ফলে তাহা জনপ্রিয় পৌত্তলিকতার পক্ষেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

১ পেন্টেকস্ট উৎসব—মিশর হইতে ইহুদি জাতির প্রত্যাবর্তনের স্মৃতি দিবস হিসাবে ইহুদিরা বসন্তকালে যে 'পাস-ওভার' উৎসব পালন করেন, তাহার পঞ্চাশ দিন বাদে ইহুদিরা এই উৎসব পালন করেন। 'পেন্টেকস্ট' শব্দের অর্থ গ্রীক ভাষায় পঞ্চাশৎ।—অনু:

২ অ্যাপস্‌ল্‌রা—প্রচার দূতরা। এখানে খৃস্টের প্রাথমিক দ্বাদশ প্রচার দূতের কথা বলা হইতেছে। —অনু:

৩ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত "*The Face of Silence*" বা 'মৌনের মুখ' (১৯২৬) দ্রষ্টব্য। অভেদানন্দও ব্রাহ্মসমাজ এবং রামকৃষ্ণের বিষয়ে একটি অনুরূপ বিবরণী দেন।

ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা সংগীতের মধ্যে এই কথাগুলি আছে: "প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ভগবানের চিন্তা করো, তাঁহার পূজা করো।"

রামকৃষ্ণ গায়ককে থামাইয়া বলিলেন, "গানটি বদলাইয়া বলা উচিত, দিনে দুবার ভগবানের উপাসনা করো, পূজা করো। যা সত্যি করেন, তাই বলুন না। ভগবানের কাছে মিছে কথা বলে লাভ কি?"

অ্যাংলিকানদের[১] মতোই কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম সমাজ যখন তাঁহাদের ধর্মমত প্রচার করিতেন, তখন তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই উন্নাসিক, দুর্বোধ্য এবং গুরুগম্ভীর একটি ভংগী অবলম্বন করিতেন। মনে হইত, তাঁহারা যেন সর্বদা পৌত্তলিকতার কণামাত্র সন্দেহ সম্পর্কেও সন্ত্রস্ত সতর্ক হইয়া আছেন। রামকৃষ্ণ দুষ্টামি করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে নরম রকমের পৌত্তলিকবাদী নাম দিয়াছিলেন। কথাটি নিতান্ত মিথ্যাও নয়। একদিন রামকৃষ্ণ শুনিলেন, কেশবচন্দ্র ভগবানের অনুপম গুণাবলী গণনা করিতেছেন।

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "এত সব হিসাব দিচ্ছ কেন? ছেলে কি তার বাবাকে বলে, 'ও বাবা, তোমার এতোগুলি বাড়ী আছে, এতোগুলি বাগান আছে, এতোগুলি ঘোড়া আছে, এই সব…?' যাহা কিছু আছে, ছেলের হাতে তুলে দেওয়াই তো বাবার পক্ষে স্বাভাবিক। তুমি যদি ভগবানকে এবং তাঁর দানগুলিকে অতুলনীয় অসাধারণ কিছু ব'লে ভাবো, তবে তুমি তাঁর সংগে কখনো ঘনিষ্ঠভাবে মিলতে পারবে না, তাঁর কাছে আসতে পারবে না। ভেবোও না যে তিনি তোমার কাছ থেকে বহু দূরে আছেন। ভেবো, তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী তিনি। এ রকম ভাবলেই তো তিনি তোমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন।…তুমি কি লক্ষ্য কর নি যে, যখন তুমি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর গুণ কীর্তন শুরু করো, তখন তুমি পৌত্তলিক হয়ে পড়?"[২]

কেশব তাঁহার এই দুর্বলতায় আঘাত পাইয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, তিনি পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করেন, তিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। রামকৃষ্ণ কিন্তু শান্তভাবে উত্তর দিলেন :

"ভগবান সাকার এবং নিরাকার, দুই-ই। মূর্তি বা অন্যান্য প্রতীকগুলি সমস্তই

১ অ্যাংলিকানরা—'চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের' অনুবর্তী খৃস্টানরা।—অনুঃ

২ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থ এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ' *Life of Sri Ramakrishna* ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তোমার গুণাবলীর মতোই সত্যি। আর ঐ গুণাবলী পৌত্তলিকতা থেকে পৃথক্ নয়। ওটা কেবল পৌত্তলিকতার কঠিন নীরস রূপ মাত্র।"

আবার বলিলেন :

"তুমি গোঁড়া এবং পক্ষপাতদুষ্ট দু-ই হতে চাও।...কিন্তু আমি, আমি প্রাণপণে চাই, ভগবানকে যতো রকমে পারি ততো রকমে পূজো করতে। অবশ্য, আমার মনের আশা কখনো মেটে নি। আমি ফল-মূল দিয়ে পূজা করতে চাই, আমি তাঁর পুণ্য নাম জপ করতে চাই, আমি তাঁর ধ্যান করতে চাই, আমি তাঁর গান গাইতে চাই, তাঁর আনন্দে অধীর হ'য়ে নাচতে চাই।...যারা বিশ্বাস করে, ভগবান নিরাকার, আর যারা বিশ্বাস করে ভগবান সাকার, তারা উভয়েই ভগবানকে পায়। দুটি মূল বস্তু হ'ল বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণ।..."

আমি কেবল বিবর্ণ বিশুষ্ক শব্দগুলিকে উদ্ধৃত করিতে পারি। কিন্তু তাঁহার সেই জীবন্ত উপস্থিতি, তাঁহার ব্যক্তিত্বের জ্যোতিবিকাশ, তাঁহার কণ্ঠস্বর, তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার সেই মৃদু বিমোহন হাসি, আমি কিছুই প্রকাশ করিতে পারি না। যিনিই রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই সেগুলিকে ঠেকাইতে পারেন নাই। তাঁহার জীবন্ত স্থির নিশ্চিন্ত বিশ্বাসই তাঁহার দর্শকদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক অভিভূত করিত। অন্য লোকের মত তাঁহার বেশভূষা ছিল না, তাঁহার অলংকার ছিল না। যাহা ছিল তাহা তাঁহার জীবনের অতল গভীরকে গোপন না করিয়া তাহাকে প্রকাশ করিয়া দিত। রামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁহার জীবনের সকল গভীরতাই কুসুমিত হইয়া প্রকাশ পাইত। এমন কি অধিকাংশ ধার্মিক মানুষের পক্ষেও ভগবান হইলেন একটা চিন্তার কাঠামো মাত্র—যে কাঠামোকে আশ্রয় করিয়া এই "অজ্ঞাত মহা সৃষ্টির"[১] উপরে একটি আবরণ টানিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণের বেলায় তাহা ছিল ঠিক বিপরীত। তাঁহার মধ্য দিয়া ভগবান পরিস্ফুট হইতেন। কারণ, তিনি যখন কথা কহিতেন, তখন তিনি ভগবানে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি যেন স্নানার্থী, তিনি ডুবিতেছেন, ডুবিবার পরমুহূর্তেই আবার ভাসিয়া উঠিতেছেন, আর সেই সংগে তিনি বহিয়া আনিতেছেন সমুদ্র-শৈবালের সুমিষ্ট গন্ধ, মহাসমুদ্রের লবণাক্ত আস্বাদ। এই গন্ধ ও আস্বাদের দুর্বার প্রলোভন কে উপেক্ষা করিতে পারে? পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক মন হয়তো উহার বিশ্লেষণ করিতে পারে। কিন্তু উহার উপাদান যাহাই হউক, উহা হইতে উৎপন্ন বাস্তবতাকে কেহ সংশয় করিতে পারে

[১] বিখ্যাত ফরাসী লেখক বালজাকের একখানি উপন্যাসের নাম।

না। এই ডুবুরি যখন তাঁহার স্বপ্নের গভীরতা হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন মহা মহা সংশয়ীরাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেন, তাঁহার দুই চক্ষের সমুদ্রজ পত্রপুষ্পের সেই প্রতিফলনকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। কেশব এবং তাঁহার কয়েকজন শিষ্য এই দৃশ্য দেখিয়াই মুগ্ধ বিমোহিত হইয়াছিলেন।

গঙ্গাবক্ষে কেশবচন্দ্রের জাহাজ একদিক হইতে অন্যদিকে আনাগোনা করিতেছিল, রামকৃষ্ণ সেই জাহাজে বসিয়া অপূর্ব অদ্ভুত কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছিলেন, তিনি যেন ভারতীয় প্লেটো।[১] তাঁহার সেই কথোপকথনগুলি একান্ত পঠনযোগ্য।[২] এই কথোপকথনগুলির যিনি বিবরণী দিয়াছেন, তিনি পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে মানুষের মধ্যে যে কখনো এই বিভিন্ন মানসিক গঠনের মিলন ঘটিতে পারে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, এই ভগবৎ-উন্মত্ত মানুষটির সহিত এই সংসারী বুদ্ধিবাদী ইংরাজ-উন্মত্ত মানুষ কেশবচন্দ্রের মিলিবার মত ঠাঁই কেমন করিয়া থাকিতে পারে? জাহাজের কামরার দোরের সম্মুখে কেশবচন্দ্রের শিষ্যরা মধুমক্ষিকার মত দলে দলে ভীড় করিতেছিলেন। রামকৃষ্ণের কথাগুলি মধু প্রবাহের মতো তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল ক্ষরিত হইতেছিল এবং মক্ষিকারা তাহাতে নিমগ্ন হইতেছিলেন।

"ইহা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। অথচ সেদিন পরমহংসদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি কথা আজও যেন আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হইয়া লাগিয়া আছে। তাঁহার মতো করিয়া কথা বলিতে আমি আর কাহাকেও শুনি নাই। কথাগুলি বলিবার সময় তিনি কেশবচন্দ্রের কোলের দিকে ঘেঁষিয়া বসিতেন, তারপর নিজের অজ্ঞাতে কেশবচন্দ্রের কোলে নিজের খানিকটা দেহ ন্যস্ত করিতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন, সরিবার জন্য বিন্দুমাত্রও নড়িতেন না।

"রামকৃষ্ণের চারিদিকে যাঁহারা বসিতেন, সস্নেহ সুগভীর দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ তাঁহাদের মুখের পানে তাকাইতেন এবং তাঁহাদের চোখ, কপাল, নাক, দাঁত ও

---

১ প্লেটো—বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। খৃস্টপূর্ব ৪২৮ অব্দে ইঁহার জন্ম এবং খৃস্টপূর্ব ৩৪৮ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইতি সক্রেতিসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য।—অনুঃ

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের লেখক 'ম'-র (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ১৮৮২ খৃস্টাব্দের ২৭ অক্টোবরের বিবরণীতে দুইটি কথোপকথন পাওয়া যায়। অন্য একজন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮১ খৃস্টাব্দে অন্য একটি সাক্ষাতের বিবরণী দিয়াছেন। (মডার্ণ রিভিউ, কলিকাতা, মে, ১৯২৭ দ্রষ্টব্য।)

কান দেখিয়া একে একে তাঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্র বর্ণনা করিতেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, দন্ত ও ললাটের ভাষা রামকৃষ্ণের জানা ছিল। রামকৃষ্ণ তাঁহার সুন্দর মধুর তোৎলামির সংগে কথা বলিতেছিলেন। এবার নিরাকার ব্রহ্মের বিষয় আসিয়া পড়িল।

"তিনি দুই তিনবার নিরাকার কথাটি উচ্চারণ করিলেন এবং তারপর ধীর শান্তভাবে সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। সে যেন ডুবুরি, গভীর সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন।... আমরা মনোযোগের সহিত তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তাঁহার সমস্ত দেহ শিথিল এবং পরে ঈষৎ শক্ত হইল। দেহের পেশী বা শিরা-উপশিরাগুলির মধ্যে কোনো প্রকার আকুঞ্চনের ভাব বা অন্য অংগ-প্রত্যংগে কোনো প্রকার স্পন্দন বা চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তাঁহার বসিবার ভংগীটি সাবলীল অথচ সম্পূর্ণরূপে স্থির ছিল। বদ্ধ অঞ্জলি কোলের উপর ন্যস্ত। ঈষৎ উন্নত মুখখানিতে একটি প্রশান্ত বিশ্রামের ভাব। চোখ দুটি সম্পূর্ণ বন্ধ না হইলেও প্রায় বন্ধ ছিল, চোখের তারাগুলি উপরের দিকে হইতে ঘূর্ণিত বা পাশের দিকে অপসৃত ছিল না; ছিল স্থির, নিশ্চল। একটি অপরূপ অবর্ণনীয় মৃদু হাসিতে অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিস্ফারিত; দুই ঠোঁটের ফাঁকে শাদা দাঁতের শুভ্রতা দেখা যায়। হাসির মধ্যে বিস্ময়কর এমন কিছু, যাহা কোনো ফটোগ্রাফ কোনোদিন ধরিতে পারে নাই।"[১]

একটি গান গাহিয়া রামকৃষ্ণের সমাধি ভংগ করা হইল।...

"রামকৃষ্ণ চোখ মেলিলেন এবং তাঁহার চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, যেন অজানা অচেনা কোনো স্থানে তিনি রহিয়াছেন। গান থামিল। পরমহংসদেব আমাদের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "এঁরা কারা? তারপর তিনি মাথার তালুতে জোরে জোরে কয়েকবার আঘাত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, নাম! নাম! ...রামকৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপে সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং সুমিষ্ট কণ্ঠে একটি শ্যামাসংগীত ধরিলেন।"

মা এবং পরমপুরুষ এক, রামকৃষ্ণ এই গানটি গাহিলেন। গাহিলেন, মা আত্মার ঘুড়ি ছাড়িয়া দিয়াছেন, আত্মার ঘুড়ি পরমানন্দে উড়িতেছে। কিন্তু মায়ার সুতা দিয়া মা তাহাকে আপনার কাছে ধরিয়া রাখিয়াছেন।[২]

১ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

'ম' অন্য একটি ভাবাবেশের বর্ণনা দিয়াছেন। রামকৃষ্ণ তখন 'মার' উদ্দেশ্যে বলেন: "মা, এরা সকলেই গারদে আটক আছে; কেউ স্বাধীন নয়। গারদ থেকে এদের কি ছাড়া যায় না, মা?"

২ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঘুড়ি উড়াইবার উপমাটি রামপ্রসাদের একটি শ্যামাসংগীতের মধ্যে পাওয়া

"জগৎ লইয়া মা খেলা করেন। তাঁহার খুশী হইলে এই সকল ঘুড়ির মধ্য হইতে দুই একটিকে তিনি মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এইরূপ মুক্ত করিয়া দেওয়া তাঁহার খেলা মাত্র। তিনি যেন চোখ টিপিয়া দুষ্টামি করিয়া মানবাত্মাকে বলেন, 'আমি তোমাকে যতোক্ষণ অন্য কিছু করিতে না বলি, ততোক্ষণ তুমি সংসারে থাকো!' অতঃপর 'মা'র অনুকরণে কেশবচন্দ্রের শিষ্যদের প্রতি সহাস্য শ্লেষে রামকৃষ্ণ বলেন :

"তোমরা সংসারে আছ। সেখানেই থাকো! সংসার ত্যাগ তোমাদের জন্যে নয়। খাঁটি সোনা আর ভেজাল যেমন, কিম্বা চিনি আর গাদ, তোমরাও ঠিক তেমনি। আমরা মাঝে মাঝে এক রকম খেলা করি, তাতে সতেরো ফোঁটা জিততে হয়। আমি জেতার সীমা ছাড়িয়ে গেলাম, তাই হেরে গেছি।...কিন্তু তোমরা চালাক মানুষ, বেশী ফোঁটা জিতলে না, তাই এখনো খেলে যেতে পারছ। সত্যি, সংসারে থাকো, কি যেখানেই থাকো, যতোক্ষণ ভগবানের সংগে তোমাদের যোগা-যোগ থাকবে, ততোক্ষণ কিছুই যায় আসে না।"

রামকৃষ্ণের কথাগুলির মধ্যে বিচার এবং উচ্ছ্বাস, শ্লেষাত্মক সাধারণ জ্ঞান এবং উচ্চতম কল্পনা অপূর্বভাবে সংমিশ্রিত থাকিত। আমরা ইতিপূর্বে ভগবান সম্পর্কে কতকগুলি ঘাটওয়ালা পুকুর এবং মা কালী সম্পর্কে মাকড়সার যে সুন্দর তুলনাগুলি ব্যবহার করিয়াছি, সেগুলি রামকৃষ্ণ এইভাবেই বলিয়াছিলেন। বাস্তবতা সম্পর্কে রামকৃষ্ণের অতি তীক্ষ্ণ একটি অনুভব শক্তি ছিল। তিনি তাঁহার শ্রোতাদের অন্তরের গভীর তলদেশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। তাই তিনি মুক্তাত্মার যে উর্ধ্বলোকে আপনি প্রয়াণ করিয়াছিলেন, সেখানে এই সকল শ্রোতাকে উন্নীত করিবার কথা কখনো কল্পনাও করেন নাই। রামকৃষ্ণ তাঁহার শ্রোতাদের জ্ঞান ও শক্তির পরিমাপ করিতেন, এবং সেই জ্ঞান এবং শক্তির সবটুকুই দাবী করিতেন।

যায়। গানটি রামকৃষ্ণ গাহিতে ভালবাসিতেন। নরেশচন্দ্রও একটি গানে এই উপমা ব্যবহার করিয়া-ছিলেন। গানটি কথামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সমস্ত উপমাগুলি, বিশেষত জীবন-সমুদ্র এবং তাহার গভীরে ডুব দিবার উপমাটি, সামান্য পরিবর্তিত হইয়া বাংলার গ্রাম্য গান ও কাব্যে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বারে বারে ব্যবহৃত হইয়াছে।

[রামপ্রসাদের ঘুড়ি সংক্রান্ত গানটির প্রথম দুই কলি এইরূপ :

"শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)
আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা মাপা দড়ি॥"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—অনু]

সর্বোপরি, রামকৃষ্ণ কেশব এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে জীবনের মূলশক্তি, সৃজনের প্রাণ-বীজ কি, তাহা একটি ব্যাপক বুদ্ধিজাত সহিষ্ণুতার সংগে শিক্ষা দিতেন। এই সহিষ্ণুতার ফলে সত্যের বিভিন্ন দিককে স্বীকার করা সহজ হইয়াছিল—যে-দিকগুলি ইতিপূর্বে একই সংগে স্বীকার করা বা গ্রহণ করা অসম্ভব মনে হইত। তাঁহাদের যুক্তির আবরণে জড়তাপ্রাপ্ত মানসিক প্রত্যংগগুলিকে রামকৃষ্ণ সহজ এবং সাবলীল করিয়া তুলেন। দুর্বোধ্য অবাস্তব আলোচনার বন্ধন হইতে তিনি তাঁহাদিগকে মুক্ত করেন। তাঁহাদের ধমনীতে রক্তস্রোত পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠে। "বাঁচিয়া থাকো, ভালবাসো, এবং সৃষ্টি করো!"

কেশবচন্দ্র অবিরাম, অকারণ তর্কবিতর্কে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলেন, "সৃষ্টি করা হইল ভগবানের মতো হওয়া। যাহা কিছুরই অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাহার মূল সত্তায় যখন তুমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন তুমি যাহা বলিবে, তাহাই সত্যে পরিণত হইবে। কবিরা তো সৎগুণ এবং সত্যের এতো প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পাঠকরা কি সৎগুণ ও সত্যের অধিকারী হইয়াছেন? যখন কোনো নিঃস্বার্থ মানুষ আমাদের মধ্যে বাস করেন, তখন তাঁহার প্রতিটি কাজ সৎগুণ ও সত্যে স্পন্দিত প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। তিনি অপরের জন্য যাহা করেন, তাহাই অপরের ক্ষুদ্রতম নীচতম স্বপ্নকেও উন্নত করিয়া তোলে। তিনি যাহাই স্পর্শ করেন, তাহাই সত্য এবং শুদ্ধ হইয়া উঠে। তিনি বাস্তবের জন্মদাতা হন।[১] তিনি যাহাই সৃষ্টি করেন, তাহা কালের গর্ভে "কখনো হারাইয়া যায় না। আমি চাই, তুমিও তাহাই করো। তিরস্কারের এই ঘেউ ঘেউ চীৎকার বন্ধ করো। সত্তার হস্তী তাঁহার আশীর্বাদ ঘোষণা করুন। তোমার সে শক্তি আছে; তুমি সে

১ গান্ধীর সহিত তুলনা করুন। তিনি লেখা বা বক্তৃতার দ্বারা ধমপ্রচারের বিরোধী। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল: "তবে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ভাগ কেমন করিয়া অপরকে দিব?" উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "আমাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাগুলির ভাগ অপরে পায়-ই, আমরা তাহা জানি, বা না জানি। তবে সে ভাগ দেওয়ার অস্ত্ররূপে আমাদের জীবন এবং দৃষ্টান্তকেই ব্যবহার করিতে হইবে, আমাদের ভাষাকে নয়। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাগুলি চিন্তার অপেক্ষাও গভীরতর। আমরা যে বাঁচিয়া আছি, কেবল এই কারণেই আমাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাগুলি উপচাইয়া উৎসারিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু তুমি যদি অন্যকে তোমার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভাগ দিবার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করিতে থাক, তবে তুমি নিজের ও অপরের মধ্যে একটি বুদ্ধির ব্যবধান গড়িয়া তুলিবে।" (১৯২৮ খ্রস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে শবরমতী সত্যাগ্রহী আশ্রমে 'ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপ'-এর এক সম্মিলনে অনুষ্ঠিত আলোচনা হইতে।)

শক্তির সদ্ব্যবহার করিবে কি? না, কেবল লোককে গালাগালি দিয়া, তিরস্কার করিয়া তোমার এই সমগ্র জীবনটা কাটাইয়া দিবে?"[১]

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের এই উপদেশ শ্রবণ করেন এবং জীবন্ত মৃত্তিকার উষ্ণতায় মূল সঞ্চার করিয়া বিশ্ব সত্তার রসে আপনাকে স্নাত করেন। রামকৃষ্ণই তাঁহার মধ্যে অনুভূতি জাগান যে, মানবিক চিন্তার ক্ষুদ্রতম হীনতম উদ্ভিদের মধ্যেও এই রসের কণামাত্র ব্যর্থ হয় নাই। কেশবচন্দ্রের মন এবার সকল প্রকার ধর্মমত এবং ধর্মবিশ্বাসের প্রতি উদার ও সহানুভূতিশীল হইয়া উঠে। এমন কি কোনো কোনো বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিও। ভগবানের বিভিন্ন গুণের প্রকাশরূপে তিনি শিব, শক্তি, সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং হরি প্রভৃতি নামে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। যীশু, বুদ্ধ এবং চৈতন্য প্রভৃতি পরামাত্মার শ্রেষ্ঠ অবতারদের দ্বারা প্রচারিত বিভিন্ন ধর্মগুলির প্রতিটির মধ্যে কেশবচন্দ্র দুই বৎসর করিয়া নিমগ্ন রহিলেন। তাঁহার নিকট যীশু, বুদ্ধ এবং চৈতন্য ছিলেন একটি 'মহা মুকুরের' বিভিন্ন দিক্। তিনি এক একটি করিয়া সেগুলি আত্মসাৎ করিতে চাহিলেন, চাহিলেন সেগুলির সংহতি সাধনের মধ্য দিয়া সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি ধর্মাদর্শ গড়িয়া তুলিতে। রামকৃষ্ণ যে ধরণের ভক্তির সহিত সুপরিচিত ছিলেন সেই আবেগময় মাতৃপ্রেমের প্রতিই কেশবচন্দ্র তাঁহার শেষ রোগভোগের সময় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। রামকৃষ্ণ যখন মৃত্যুশয্যায় কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বলেন যে, "একটি প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটিয়াছে।" "তাঁহাকে প্রায়ই মার সহিত কথা বলিতে দেখা যায়, তিনি মার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন, কাঁদেন।" রামকৃষ্ণ এই সংবাদ শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইলেন। মুমূর্ষু কেশবচন্দ্র মারাত্মক কাশির তাড়নায় কাঁপিতে কাঁপিতে দেওয়াল এবং ঘরের আসবাবপত্রের উপর কোনোরকমে ভর করিয়া রামকৃষ্ণের পায়ের তলায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। এই চূড়ান্ত সাক্ষাৎকারের সমগ্র বিবরণীর মধ্যে[২] উহার অপেক্ষা মর্মস্পর্শী ঘটনা আর কিছুই নাই। রামকৃষ্ণ সমাধিতে তখনো অর্ধনিমগ্ন ছিলেন। রামকৃষ্ণের মুখ দিয়া 'মা' যেন নিজেই কথাগুলি কহিলেন। কেশবচন্দ্র নীরবে সেই অপরূপ শব্দসুধা পান করিতে লাগিলেন। কথাগুলি কেশবচন্দ্রের নিকট তাঁহার যন্ত্রণা এবং সমাসন্ন মৃত্যুর গভীর এক অর্থকে নিষ্করুণ অথচ সান্ত্বনাবাহী প্রশান্তির সহিত বহিয়া

১ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তারিখে দিবাশেষে রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের গৃহে তাঁহার কয়েকজন শিষ্যসহ প্রবেশ করেন।

আনিল।[১] কেশবচন্দ্রের ধর্ম-বিশ্বাসী এবং অধীর প্রেমময় জীবনের মধ্যে যে গোপন বিভ্রান্তি এবং অসংগতি বিরাজ করিতেছিল রামকৃষ্ণ তাহা কী গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিতই না লক্ষ্য ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন!

রামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—"তোমার অসুখ হয়েছে কেন, তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ঐ রকম হয়েছে। যখন ভাব হয়, তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না; ওমা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপর জল ধপাস ধপাস করছে; আর তোলপাড় ক'রে দিচ্চে! হয়তো কিনারার খানিকটা ভেঙে জলে পড়লো!

"…হয় কি জান? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে; আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম ক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে; তারপর অহং বুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে!

"তুমি মনে কচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল! কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে নাম লেখাও, আর চ'লে আসবার জো নেই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লেখালে কেন?"[২]

ভগবান হইলেন মালী, এবং তিনি গোলাপ গাছের শিকড়গুলি যাহাতে রাত্রিতে শিশির খাইতে পারে, সেইজন্য গাছের গোড়া খুঁড়িতেছিলেন,—রামকৃষ্ণ অতঃপর এই উপমাটি ব্যবহার করেন।[৩]

১ রামকৃষ্ণের ভাবাবেশ তখনো সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, রামকৃষ্ণ চারিদিকে চাহিয়া বৈঠকখানার সুন্দর আসবাবপত্র এবং আয়নাগুলিকে লক্ষ্য করিলেন এবং মৃদু হাসিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন: "হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগেও এই জিনিসগুলোর কিছু দরকার ছিল। কিন্তু এখন আর নেই…তুই যখন নিজেই এখানে আছিস।…তুই কী সুন্দর, মা!…" এই সময়ে কেশবচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া রামকৃষ্ণের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের দিকে তাকাইলেন, কিন্তু যেন তাঁহাকে স্পষ্ট চিনিতে পারিলেন না। 'মা' এবং মানবজীবন সম্পর্কে তাঁহার কথাগুলি তিনি বলিয়া চলিলেন। কেশবচন্দ্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এই দু'জনের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হইল না। অথচ স্বাস্থ্যের খবর লইবার জন্যই রামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। আমি উপরে যে কথাগুলির সম্বন্ধে বলিয়াছি, সেগুলি তিনি ইহার কিছুক্ষণ বাদেই বলিয়াছিলেন।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, ১০২, ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—অনুঃ।

৩ "শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির খেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। ফিরে ফিরতি বুঝি একটা বড়ো কাণ্ড হবে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, বাংলা সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।)

"রোগ তোমার শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে।"

কেশব কথাগুলি নীরবে শুনিলেন এবং মৃদু হাসিলেন। তবে রামকৃষ্ণের মৃদুমন্দ হাসিই এ গৃহে আসন্ন মৃত্যুর অন্ধকার এবং রোগীর যন্ত্রণার উপর যেন একপ্রকার দুর্বোধ্য প্রশান্ত আলোকপাত করিল। ক্লান্ত কেশবচন্দ্র উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইবার পূর্ব পর্যন্ত রামকৃষ্ণের বিন্দুমাত্র গাম্ভীর্য ছিল না। এবার তিনি মুমূর্ষু কেশবচন্দ্রকে বলিলেন, অন্দরমহলে স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের সংগে এত বেশী না থাকিয়া কেশবচন্দ্র ভগবৎ চিন্তায় একাকী থাকিলেই ভালো করিতেন।

কথিত আছে, কেশবচন্দ্র তাঁহার মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও শেষ কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন: "মা! মা!"[১]

এই আদর্শবাদী, যিনি ভগবানে, যুক্তিতে, ন্যায়ে, শিবে ও সত্যে বিশ্বাস করিতেন, তিনি কেমন করিয়া তাঁহার বেদনাময় শেষের দিনগুলিতে আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, তিনি পরম পুরুষ হইতে, অনধিগম্য ভগবান হইতে, বহু দূরে সরিয়া রহিয়াছেন, এবং সেই ভগবানের, পরমপুরুষের সান্নিধ্যলাভ করিবার জন্য রামকৃষ্ণের পদধূলির প্রয়োজন রহিয়াছে, রামকৃষ্ণের মধ্য দিয়াই তিনি ভগবানের দর্শন পাইবেন, রামকৃষ্ণের মধ্য দিয়াই তিনি ভগবানকে শ্রবণ করিবেন, এবং তাঁহার অসুস্থতার মধ্যেও শক্তিলাভ করিবেন, তাহা অত্যন্ত সহজেই বোঝা যায়। এই কারণেই কেশবের আত্মম্ভরি শিষ্যরা রামকৃষ্ণকে কখনো ক্ষমা করিতে পারেন নাই। অন্যপক্ষে, আমি রামকৃষ্ণের ভক্তদেরও অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এই বিষয় লইয়া বাড়াবাড়ি না করেন। তাঁহারা তাঁহাদের সেই অমায়িক গুরুদেবের পথই অনুসরণ করুন। এখানে বর্ণিত এই শেষ সাক্ষাৎকারের সময়ে কেশবচন্দ্র যখন উঠিয়া গেলেন, রামকৃষ্ণ তখন বিনয় ও প্রশংসার সহিত কেশবচন্দ্রের মহত্ত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন, এই মহত্ত্ব একই সংগে সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের ও শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে এবং তাঁহার নিজের

১ এই শেষ সাক্ষাৎকার কালে কেশবচন্দ্রের শেষ চিন্তাগুলির উপর রামকৃষ্ণের কথাগুলির যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, আমার বিশ্বাস, তাহা পূর্বে কখনো লক্ষিত হয় নাই।

রামকৃষ্ণ দীর্ঘকাল ধরিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত 'মা' সম্পর্কে আলাপ করেন: "মা তাঁর ছেলেমেয়েদের উপর লক্ষ্য রাখেন। তিনি জানেন, ছেলেমেয়েদের সত্যকারের মুক্তি কেমন ক'রে দেওয়া যায়।...ছেলে কিছুই জানে না।...তার 'মা' জানে সব। মার ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়। মাগো, তোমার ইচ্ছা তুমিই পূর্ণ করো, তোমার কাজ তুমিই সারো। বোকা লোক বলে: 'আমিই করছি।"

তাছাড়া, রুগ্ণ যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় কেশব তাঁহার গর্ভধারিণী মাকে বলেন, "সবার চেয়ে বড়ো 'মা' যিনি, তিনিই আমার মংগলের জন্য এই রোগ দিয়াছেন। তিনি আমাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন, আমাকে লইয়া খেলা করিতেছেন।"

মতো সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করিয়াছে। রামকৃষ্ণ পরেও চিরদিন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।[১]

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মরাও বিনিময়ে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।[২] তাঁহারা জানিতেন রামকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিলে তাঁহারা উপকৃতই হইবেন। রামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁহাদের হৃদয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার ঘটে। পাশ্চাত্য হইতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রথম বন্যা আসায় এবং তাঁহাকে যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে না পারায়, ভারতীয় জনসাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজকে বিদ্বেষের চক্ষেই দেখিতে থাকে। এই অবস্থায় রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজকে ভারতীয় জনসাধারণের এবং ভারতীয় শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তেমন আর কেহই করেন নাই।

১ ১৮৭৮ খ্রস্টাব্দে যখন ব্রাহ্ম সমাজে নূতন করিয়া দলের সৃষ্টি হইল, তখন কেশবচন্দ্র তাঁহার একদল শিষ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তবে তিনি ব্রাহ্মসমাজের তিনটি বিভিন্ন শাখার মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য মানিতেও অস্বীকার করিলেন এবং তিনি তাঁহাদের সকলের সহিত উপাসনায় যোগ দিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ব্রাহ্মসমাজে রামকৃষ্ণের কতিপয় উপস্থিতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষত, ১৮৮২ খ্রস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে রামকৃষ্ণ যে কেশব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন সে-কথার উল্লেখ আছে। ঐ সময় রামকৃষ্ণকে সকলে ঘিরিয়া ধরিয়া উদ্‌গ্রীবভাবে ধর্মসংক্রান্ত নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে থাকেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতার সহিত তাঁহাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি গানে (কবীরের গানে) এবং নৃত্যেও অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বিদায় লইবার সময় সমস্ত ভক্তদের নমস্কার জানাইয়া শেষে ব্রাহ্মসমাজবাদীদেরও নমস্কার জানান: "ভাগবতভক্ত ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।..."

ব্রাহ্মসমাজের অপর দুইটি শাখা কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রতি ততোখানি সম্মান দেখায় নাই। উহাদের মধ্যে ছিল অধুনাতম 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'-ও। কেশবচন্দ্রের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব থাকায় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিত। দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাকে যে নিম্নস্তরের মানুষ ভাবা হইত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ১৮৮৩ খ্রস্টাব্দে ২রা মে তারিখে রামকৃষ্ণ যখন আদি ব্রাহ্মসমাজে যান, তখন তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহাকে সৌজন্যপূর্ণ বলা চলে না। (ঐ সময় বালক রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন, ঐ ঘটনার কথা তাঁহার স্মরণ থাকিতে পারে।)—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত দ্রষ্টব্য।

২ বিশেষত, কেশবচন্দ্রের উত্তরাধিকারী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। বিজয়কৃষ্ণ পরে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন। কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত সংগীত রচয়িতা এবং গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল বলেন যে, তাঁহার বহু গানের প্রেরণা তিনি রামকৃষ্ণের ভাবাবেশ হইতে লাভ করেন।

একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। রামকৃষ্ণের মহান্ শিষ্য বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম সমাজের একটি অংশ,—অন্ততঃপক্ষে, সাময়িকভাবে সর্বাপেক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অংশ, যাহা পাশ্চাত্ত্য যুক্তির নামে হিন্দু ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কালাপাহাড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল—হইতেই আসিয়াছিলেন। পরে বিবেকানন্দ ঐ হিন্দু ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা এবং সংরক্ষণ করিতে শিখিয়াছিলেন। হিন্দু জাগৃতির ফলে পাশ্চাত্যের সত্যকার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় নাই। এখন প্রাচ্যের চিন্তা তাহার স্বাধীন সত্তা অর্জন করিয়াছে। এখন আর এক সভ্যতা অপর সভ্যতাকে দমন বা পদদলিত করিবে না, এক সভ্যতা অপর সভ্যতাকে হত্যা করিবে না। এখন হইতে সমান ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বগুলির মধ্যে মিলন ও ঐক্য সম্ভব হইবে।

৮

শিষ্যের ডাক

রামকৃষ্ণ এবং ব্রাহ্ম সমাজের এই মিলনের ফলে যে ভারতবর্ষ কি পাইয়াছিল, তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রামকৃষ্ণ নিজে কি পাইয়াছিলেন, তাহা সুনির্দিষ্ট হইলেও তাহা সেরূপ সহজে লক্ষণীয় নহে। এই মিলনের ফলে রামকৃষ্ণ সর্বপ্রথম তাঁহার দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের মারফৎ তিনি প্রগতি এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অগ্রদূতদের সহিত পরিচিত হন। তাঁহাদের মনোভাব সম্পর্কে ইহার পূর্বে রামকৃষ্ণ কিছুই জানিতেন না বলা চলে।

রামকৃষ্ণের মধ্যে কোনো সংকীর্ণ গোঁড়ামি ছিল না, সুতরাং এই সংস্পর্শের প্রতিক্রিয়ারূপে তিনি তাঁহার কক্ষের বাতায়নগুলি দ্রুত রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন না। বরং করিলেন ঠিক বিপরীত; তিনি সেই বাতায়নগুলিকে উদ্দাম উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণের মধ্যে অতৃপ্ত কৌতূহল, জীবন-বৃক্ষের প্রতিটি ফলের আস্বাদ গ্রহণ কবিবার লালসা, এবং মানসিক প্রবৃত্তিগুলি এতোই প্রবল ছিল যে, নূতন নূতন ফসলের আস্বাদ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ না করিয়া তিনি পারিলেন না। তাঁহার চোখের দীর্ঘ সন্ধানী দৃষ্টিতেও ইহারই ইংগিত ছিল; সে যেন কোনো লতা, গৃহের ফাটলের পথে আগাইয়া চলিয়াছে। তিনি যেন আশ্রয়দাতা গৃহস্থের গৃহের বিভিন্ন অংশগুলিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন; সেই গৃহে যে সকল বিভিন্ন মনোভাবের মানুষ রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও লক্ষ্য করিতেছেন; এবং তাঁহাদিগকে আরো ভালভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহাদের সহিত এক হইয়া যাইতেছেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি (সেই সংগে তাহাদের অর্থও) বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেককে তাঁহাদের জীবনের আদর্শ এবং ব্যক্তিগত কর্তব্য ভাগ করিয়া দিতেন। কোনো মানুষের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোনো আদর্শ বা কাজকে তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার কল্পনাও কখনো রামকৃষ্ণ করিতেন না। রামকৃষ্ণের নিজের নিকট ব্যক্তিগতভাবে ত্যাগই ছিল সত্যের প্রথম ও শেষ কথা। কিন্তু তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, অধিকাংশ মানুষই ত্যাগের এই সত্যকে গ্রহণ করিতে চায় না। কিন্তু এই আবিষ্কারের ফলে তিনি বিস্মিত বা দুঃখিতও হইলেন না। মানুষ নিজেদের মধ্যে পার্থক্য ও মতদ্বৈধের বেড়া তুলিতেই ব্যস্ত। কিন্তু রামকৃষ্ণের নিকট এই পার্থক্য ও মতদ্বৈধ ছিল একই ক্ষেতের বিভিন্ন ফুলের ঝোপ, সেগুলি সমস্ত

একত্রে মিলিয়া দৃশ্যটিকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। তিনি তাই তাহাদিগকে সবাইকে ভালোবাসিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌছিবার পথ কি তাহা তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন, এবং সেগুলি তিনি সবাইকে বাৎলাইয়া দিতেন। তিনি যখন কাহারও সহিত কথা কহিতেন, তখন দর্শকরা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন যে, তিনি সেই লোকটির বিশেষ শব্দ ব্যবহার এবং কথা বলিবার ধরণটিও আয়ত্ত করিয়া তাহাতেই কথা কহিতেছেন। ইহা যে কেবল সর্বতোমুখিতা, তাহাই নহে। তাঁহার আধ্যাত্মিক সত্তা যেন দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া ঐ মানুষগুলিকে তীরের একস্থান হইতে অন্য স্থানে পৌছাইয়া দিত—আর ঐ তীর ছিল সর্বদাই ভগবানের তীর। তাঁহাদের অতর্কিতেই তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তির জোরেই তীরে উঠিতে সাহায্য করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, মানুষের সকল প্রকৃতিই ভগবান-প্রদত্ত, এবং ভগবান-প্রদত্ত বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করিতেন, সকল প্রকৃতির মানুষকে তাহাদের পরিপূর্ণ পরিণতির পথে পথ দেখাইয়া লইয়া চলাই তাঁহার কর্তব্য। এই আধ্যাত্মিকতার পথে পথপ্রদর্শকের কাজ করিবার শক্তি যে তাঁহার আছে, তাহা তিনি নিজের বিনা ইচ্ছা বা চেষ্টাতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইতালীয় নবজাগৃতির যুগে পাশ্চাত্য দেশে একটি কথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে বলা হইত, 'ভুলোয়ার স্' এ পুভোয়ার', ইচ্ছাই শক্তি। ইহা তরুণের সুন্দর আস্ফালন—যে তরুণের সব কাজ করিতে তখনো বাকী আছে। অপেক্ষাকৃত পরিণতবয়স্ক মানুষ কিন্তু মৌখিক আস্ফালনেই এতো সহজে তৃপ্ত হয় না, তাহারা কথার অপেক্ষা কাজের উপরই জোর দেয় বেশি, এবং এই প্রবচনটিকে উল্টাইয়া বলে, "পুভোয়ার, স্' এ ভুলোয়ার"—শক্তিই ইচ্ছা।[১]

অকস্মাৎ রামকৃষ্ণ নিজের মধ্যে এই শক্তি অনুভব করিলেন, এবং শুনিলেন, এই শক্তি ব্যবহারের জন্য সমগ্র বিশ্ব তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের অপেক্ষাও তিনি যে অধিকতর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহা হইতেই ঐ সকল মনীষিদের দুর্বলতা, তাঁহাদের উচ্চাশার অপূর্ণতা, তাঁহারা বিজ্ঞান হইতে যে সকল উত্তর লাভ করিয়াছিলেন, সেগুলির অপর্যাপ্ততা এবং রামকৃষ্ণের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা, সমস্তই সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। সংঘবদ্ধতার মধ্যে কি শক্তি

১ ব্রাহ্মদের সহিত অন্যান্য হিন্দুদের কি পার্থক্য রহিয়াছে, একথা একবার তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "বিশেষ কিছু না। সানাই বাজাইবার সময় একজন পোঁ ধরিয়া থাকে, আর অন্যরা বিভিন্ন সুর বাজায়। ব্রাহ্মরা সর্বদাই কেবল এক সুরে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে,—ব্রহ্মের নিরাকার দিকটায়। কিন্তু হিন্দুরা ভগবানের বিভিন্ন সুর বাজাইতে থাকেন।"

রহিয়াছে, বা কতকগুলি আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন তরুণ মানুষের একটি দল যখন তাঁহাদের অগ্রজকে ঘিরিয়া সমবেতভাবে ভগবানের নিকট অর্ঘ্য উৎসর্গ করেন, তখন তাহার কি সৌন্দর্য, সেগুলি সমস্তই রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন।

ফলে অবিলম্বে তাঁহার আদর্শ,—এ পর্যন্ত যাহা অনির্দিষ্ট ছিল—দানা বাঁধিয়া উঠে। উহা একটি স্থির সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করিয়া সচেতন চিন্তার দীপ্ত নীহারিকা রূপে প্রথমে সংহত থাকে, এবং পরে তাহা কর্মে রূপান্তরিত হয়।

প্রথমে এই আদর্শগুলির সমগ্রতার মধ্যে তিনি ভগবানের সহিত তাঁহার সম্পর্কটিকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, তাঁহার অন্তর্নিহিত দেবতা[১] অন্যান্য সাধকের মতো তাঁহার ব্যক্তিগত মোক্ষে সন্তুষ্ট হইবেন না, তিনি তাঁহার নিকট মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও তাহার সেবা দাবী করেন।[২] তাঁহার আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, তাঁহার ভাবাবেশ, তাঁহার আত্মোপলব্ধি, কিছুই তাঁহার নিজের লাভের জন্য ছিল না।

"*Sic vos non vobis*"[৩] "কাজ করো, তবে তোমার নিজের জন্য নহে।"

---

১ ভৈরবী ব্রাহ্মণী যে প্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ অবতার, রামকৃষ্ণ এখানে তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার সম্মুখে এইরূপ কোনো উল্লেখও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সাধারণত প্রশংসা তাঁহার ভালো লাগিত না। বিশেষ কোনো আধ্যাত্মিক শক্তির কথা তিনি প্রকাশ্যে প্রায়ই অস্বীকার করিতেন। উহা তাঁহার অনেক শিষ্যের কাছে প্রীতিপ্রদ হইত না। তাঁহারা চাহিতেন যে, রামকৃষ্ণ ঐ সমস্ত সুযোগ সুবিধার অংশ গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিহিত ছিল তাঁহার অন্তর্মুখী কর্ম-শক্তির মধ্যে; উহা ছিল গোপন রশ্মি, যাহা তিনি কখনো দেখাইয়া বেড়াইতেন না। আমি আমার পশ্চিমী পাঠকদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। প্রশ্নটি হয়তো তাঁহাদের অদ্ভুত লাগিবে। কোনো আদর্শে উদগ্র আবেগময় আত্মবিশ্বাস, যাহা আমাদের মহা মানবদিগের উপর চিন্তা ও কর্মের গুরুভার ন্যস্ত করে, তাহা কি ঠিক এই ধরণের একটি চেতনার, এই ব্যক্তি-সীমার ঊর্ধ্বে সত্তার পরিপূর্ণতারই কতকটা অনুরূপ নহে? আমরা তাহাকে যে নামই দিই না কেন, তাহাতে কি আসে যায়?

২ রামকৃষ্ণের শিষ্যরা তাঁহাদের মিশন সম্পর্কে যে 'সেবা' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, রামকৃষ্ণ স্পষ্টত তাহা ব্যবহার করেন নাই। তবে আত্মত্যাগ করিয়াও অপরের জন্য কাজ করিবার প্রতি প্রীতির যে-নীতি রামকৃষ্ণ প্রচার করেন, তাহার আগাগোড়াই এই সেবার নীতি। স্বামী অশোকানন্দ স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, সেবাই উহার উদ্দেশ্য এবং উহার শক্তি। (*The Origin of Swami Vivekananda's Doctrine of Service*," প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা, আলমোড়া, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮।) আমরা পরবর্তী খণ্ডে এ সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করিব।

৩ ভির্জিলের বহুব্যবহৃত এক কলি কবিতা।

সে সমস্ত কিছুই ছিল মানব-পরিণতির পথ প্রস্তুতির জন্য, আত্মোপলব্ধির এক নব যুগ প্রবর্তনের জন্য। মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবার বা আশা করিবার অধিকার অন্যের রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাই। সেদিকে লক্ষ্য দিলে তাঁহার চলিবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, মানবসমাজ যখনই বিপন্ন হইয়াছে, তখনই তিনি তাহার সাহায্যে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।[১]

তাঁহার সমসাময়িক মানুষের নিকট তিনি সেদিন যে সংহতির আহ্বান ও যে-মোক্ষের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :

১। সমস্ত ধর্মই মূলে এবং ধর্মবিশ্বাসীদের অকপট আন্তরিক বিশ্বাসে সত্য। এই সর্বগ্রাহী সত্যকে রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধারণ বুদ্ধি এবং অনুভূতির দ্বারাই লাভ করিয়াছিলেন এবং এই সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যই তিনি বিশেষত পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন।

২। অধিবিদ্যাগত চিন্তার তিনটি মহান স্তর রহিয়াছে : দ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ এবং পরিপূর্ণ অদ্বৈতবাদ। এই তিন স্তর দিয়া পরম সত্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই স্তরগুলি পরস্পর-বিরোধী নহে, বরং পরস্পরের পরিপূরক। বিশেষ স্তরের ব্যক্তির বিশেষ মানসিক গঠনের উপযোগীরূপে এই বিশেষ স্তরগুলি রহিয়াছে। জনসাধারণ, যাঁহারা অনুভূতির মধ্য দিয়া আকৃষ্ট হন, তাঁহাদের জন্য উৎসব, গীতবাদ্য এবং মূর্তি ও বিগ্রহসহ দ্বৈতবাদী ধর্মই কার্যকরী। বিশুদ্ধ বুদ্ধিশীল যাঁহারা, তাঁহারা বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদে উপনীত হইতে পারেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধি জানে উহার পরেও কিছু রহিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি সে পরবর্তীকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তাহাকে আয়ত্তের জন্য অন্য একটি স্তর রহিয়াছে। যৌগিক সংযমের মধ্য দিয়াই সেই অবর্ণনীয়, নিরাকার অব্যয়ের পূর্বাস্বাদ মিলিতে পারে। উহা শব্দ ও আধ্যাত্মিকতার যুক্তিগত উপায়ের উর্ধ্বে। উহা অদ্বিতীয় বাস্তবতার সহিত ঐক্য।

৩। এই চিন্তার সোপানের সহিত স্বভাবত কর্তব্যেরও একটি সমান্তরাল সোপান রহিয়াছে। সাধারণ লোকে সংসারে থাকিয়া সেখানেই তাহাদের কর্তব্য করিতে পারে, এবং করেও। কাজের মধ্যে একটি সস্নেহ উৎসাহ থাকে, অথচ

১ একটি অদ্ভুত বিষয় এখানে উল্লেখ করিতে চাই। রামকৃষ্ণ উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া বলেন, দুইশত বৎসর বাদে তিনি পুনরায় অবতাররূপে সেখানে আবির্ভূত হইবেন। (রাশিয়া ?)

নিজের প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকে না। সে যেন সাধু ভৃত্য, সে জানে, এ গৃহ তাহার নহে, অথচ গৃহের প্রতি সে বিন্দুমাত্র অবহেলা করে না। শুদ্ধি এবং প্রেমের দ্বারাই বাসনা হইতে তাহাকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। তবে তাহা করিতে হইবে, ধীরে ধীরে, ধৈর্য ও বিনয় সহকারে।

"তোমার বিশুদ্ধ চিন্তা ও কল্পনার সীমার মধ্যে যাহা পড়ে, কেবল এমন কর্মেরই দায়িত্ব গ্রহণ করো বিরাট কাজের দায়িত্ব লইয়া আত্মম্ভরিতা করিতে চাহিও না। তুমি ভগবানের কাছে যেটুকু আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে, সেইটুকু কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করো। অতঃপর তোমার স্বার্থহীনতা এবং শুদ্ধি যতোই বৃদ্ধি পাইবে—এবং আধ্যাত্মিক বস্তুগুলি বড়োই দ্রুত বৃদ্ধি পায়—ততোই এই পার্থিব জগতের মধ্যে তুমি আপনার পথ করিয়া লইয়া অগ্রসর হইবে এবং গঙ্গা যেমন হিমালয়ের কঠিন পাষাণ হইতে উত্থিত হইয়া শত শত মাইল তাহার স্রোতধারায় নিষিক্ত করে, তেমনি করিবে।"[১]

ব্যস্ত হইয়া ছুটিও না, নিজের সাধ্যমত পা ফেলিয়া হাঁটা। তুমি তো তোমার লক্ষ্যে গিয়া পৌছিবেই, তবে তোমার ছুটিবার প্রয়োজন কি? তবে থামিলেও চলিবে না। "ধর্ম হইল সেই পথ, যাহা ভগবানের কাছে মানুষকে পৌছাইয়া দেয়। তবে তাহা পথ, গৃহ নহে।…"—"এ পথ অতিক্রম করিতে কি অধিক সময় লাগিবে?" —"অবস্থা অনুসারে। পথের দৈর্ঘ্য সবার জন্যই সমান। কেহ দীর্ঘ পথ বেশিক্ষণ হাঁটে, তারপর পথের শেষে গিয়া পৌছে।"

"কুমারেরা হাঁড়ী শুকোতে দেয়, তার ভিতর পাকা হাঁড়ীও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়ীও আছে। কখনো গরুটরু এলে হাঁড়ী মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ী ভেঙে গেলে কুমোর সেগুলোকে ফেলে দেয়। কিন্তু কাঁচা হাঁড়ী ভেঙে গেলে সেগুলি কুমোর আবার ঘরে আনে, এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নূতন হাঁড়ী করে; ছাড়ে না। যতোক্ষণ কাঁচা থাকবে কুমোর ছাড়বে না, যতোক্ষণ না জ্ঞান লাভ হয়, ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে; ছাড়বে না। অর্থাৎ ফিরে ফিরে এ সংসারে আসতে হবে, নিস্তার নাই, তাঁকে লাভ করলে তবে মুক্তি হয়। তবে কুমোর ছাড়ে। কেননা, তার দ্বারা মায়ার সৃষ্টির কোনো কাজ হয় না। জ্ঞানী মায়াকে পার হয়ে গেছে। সে আর মায়ার সংসারে কি করবে?"[২]

১ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২ ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎকার।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট ৫৭, ৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য—অনুঃ)

রামকৃষ্ণ ছিলেন এমনি একজন মানুষ, যে তাঁহার অপেক্ষা এক স্তর পিছনে পড়িয়া আছে, তিনি[1] তাহারই খোঁজ করিতেন। এবং মার ইচ্ছা অনুসারে তাহাদিগকে লইয়া তিনি একটি নূতন স্তর গড়িয়া তুলিতেন, যে স্তর তাঁহার বাণী বহন করিবে, জগৎকে সত্যের কথা শিখাইবে। সেই কথাটি ছিল "সর্ব-ঐক্য"— ভগবানের সকল দিকের, প্রেম ও জ্ঞানের সকল প্রকার প্রকাশের, মানবতার সকল প্রকার আকারের একতা এবং ঐক্য।

এ পর্যন্ত কেহই ভগবানের একাধিক দিক উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সকল দিকই জানিতে হইবে। তাহাই আজিকার কর্তব্য। এবং যে মানুষটি তাঁহার প্রত্যেকটি জীবিত সহধর্মীর সহিত একান্বিত হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টি, তাঁহাদের অনুভূতি, তাঁহাদের মন ও মস্তিষ্ক নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া এই কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তিনিই এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পথদ্রষ্টা নেতা।[2]

রামকৃষ্ণ যখনই এই আদর্শের কথা অনুভব করিলেন, তখনই উহাকে কার্যে পরিণত করিবার তীব্র বাসনা তাঁহার মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।[3] তিনি যেন কোনো পক্ষীর জাদুকর; তিনি অন্যান্য পক্ষসঞ্চারী মানবাত্মাদিগকে তাঁহার পক্ষীশালার চারিদিকে ভীড় করিয়া আসিবার জন্য শূন্যে তাঁহার ব্যাকুল আমন্ত্রণ পাঠাইলেন। সময় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। অপেক্ষা করিবার মতো সময় আর ছিল না। তাঁহার বিহংগদিগকে এবার তাঁহার চারিদিকে জড়ো করিতেই হইবে।

১ তিনি বলেন, "যাহারা তাহাদের শেষ জন্মে আছে।"

২ স্বামী অশোকানন্দের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩ ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রামকৃষ্ণের নিকট ইহা উদ্‌ঘাটিত হয় যে, বহু বিশুদ্ধাত্মা ধর্মবিশ্বাসী তাঁহার কাছে আসিবেন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ ২০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) কিন্তু ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের আগে পর্যন্ত তিনি এদিকে কোনো মনোযোগ দেন নাই। সারদানন্দ বলেন, ঐ বৎসর একটি দীর্ঘ সমাধির পর তাঁহার ভাবী শিষ্যদের সম্পর্কে একটি তীব্র বাসনা তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁহাদের আগমনের প্রতীক্ষায় চীৎকার করিয়া প্রার্থনা করিতেন। উহা চূড়ান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় পরবর্তী ছয় বৎসর বাদে (১৮৬৬-৭২)। শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে এবং ঐ সময়কার ভারতের আধ্যাত্মিক অবস্থা হৃদয়ংগম করিতে তাঁহারও কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। ঐ সময়ের শেষাশেষি তাঁহার ভাবী শিষ্যদের কল্পনা তাঁহার নিকট তীব্র হইয়া উঠে। (স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, ১ম খণ্ড, ৩৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দের প্রথমের দিকে তিনি প্রচার শুরু করেন। ঐ সময় কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার প্রচারকাল ১৮৭৪ হইতে ১৮৮৬-র আগস্ট মাসের মধ্যে পড়ে বলা চলে।

এই প্রিয় সাথীদের চিন্তায় রামকৃষ্ণের দিবারাত্রি পূর্ণ হইয়া রহিল। তিনি কাতর হইয়া আপন মনে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন।...

"আমার তীব্র বাসনার আর সীমা রহিল না। ভালোই হউক, কি মন্দই হউক, সেইদিনই উহা আমার করিতে হইবে। আমার চারিদিকে কে কি কহিতেছিল, সে দিকে আর কর্ণপাত করিলাম না।...তাহারা আমার মন ভরিয়া রহিল। আমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাদিগের প্রত্যেককে কাহাকে কি বলিব, তাহাও পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া ফেলিলাম।...দিন যখন শেষ হইল, তাহাদের চিন্তাই আমার মনের উপর বোঝার মতো নামিয়া আসিল।...আরো একদিন কাটিল, তবু তাহারা আসিল না। ..কাঁসরঘণ্টা বাজিল শঙ্খধ্বনি হইল। আলো ক্রমেই ম্লান হইয়া আসিল। আমি ছাদে আসিলাম। ক্ষতবিক্ষত মনে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, 'আয় তোরা! তোরা সব কোথায়? তোদের ছাড়িয়া যে আমি আর থাকিতে পারি না।'...মা, বন্ধু এবং প্রেমিকদের অপেক্ষাও যে আমি তাহাদিগকে ভালোবাসি। আমি তাহাদিগকে চাই। তাহাদের অনুপস্থিতিতে আমি যে মরিতেছি।"

রাত্রির গভীরে এই আত্মার আর্তনাদ একটি পবিত্র সর্পের মতো উত্থিত হইল। পক্ষধারী আত্মার দলের উপর সে আর্তনাদ কাজ করিল। কাহার আদেশ বা কি শক্তি তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহা না বুঝিয়াই চারিদিক হইতে তাঁহারা অনুভব করিলেন, কি যেন তাঁহাদিগকে কেবলই টানিতেছে, কি অদৃশ্য সূত্রে যেন তাঁহারা বাঁধা পড়িয়াছেন। তাঁহারা ঘুরিতে লাগিলেন, তাঁহারা অগ্রসর হইলেন, এবং অবশেষে তাঁহারা একে একে আসিয়া পৌছিলেন।

সর্বপ্রথমে শিষ্য যাঁহারা আসিলেন (এই ব্যাপারটি ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে ঘটে), তাঁহারা ছিলেন কলিকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুইজন বুদ্ধিজীবী। সম্পর্কে তাঁহারা আত্মীয় ভাই: একজন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, পরিপূর্ণরূপে বস্তুবাদী এবং নিরীশ্বরবাদী: নাম, রামচন্দ্র দত্ত; অপরজন বিবাহিত, সংসারের কর্তৃস্থানীয়: মনোমোহন মিত্র। ব্রাহ্মসমাজ পত্রিকায় রামকৃষ্ণের উল্লেখ করিয়া কয়েক লাইন লেখা প্রকাশিত হয়, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহারা আসিলেন এবং রামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে জয় করিলেম। তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিলেন না, তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ করাইবার জন্যও রামকৃষ্ণ কিছুই করিলেন না। কিন্তু এই অসাধারণ অদ্ভুত মানুষটি তাঁহার চরিত্র এবং মধুর ব্যবহার দিয়া তাঁহাদিগকে বিমুগ্ধ

করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারাই রামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন শিষ্যকে আনিয়া দেন—একজনের নাম ব্রহ্মানন্দ (রাখালচন্দ্র ঘোষ), যিনি রামকৃষ্ণ মঠের সর্বপ্রথম মঠাধ্যক্ষ হন। অপর জন বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত), যিনি ভারতবর্ষ এবং সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করেন।

প্রধান ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে, যাঁহারা ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের[১] মধ্যে রামকৃষ্ণের চারিদিকে আসিয়া জুটিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিতদের নাম এবং সেই সংগে তাঁহাদের জন্মের এবং পেশার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিতেছি :

১৮৭৯ : ১ এবং ২। ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার আত্মীয় ভাই মনোমোহন মিত্র।

৩। লাটু, রামচন্দ্র বাবুর চাকর, বিহারে সাধারণ ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। পরে তিনি অদ্ভুতানন্দ নামে আশ্রমে পরিচিত হন।

৪। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি একজন সাহেবের দোকানের ধনী কর্মচারী, বাড়ির মালিক এবং ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন।

১৮৮১ : ৫। রাখালচন্দ্র ঘোষ, এক জমিদারের ছেলে। তিনি পরবর্তীকালে ব্রহ্মানন্দ নামে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ হন।

৬। গোপালদা, কাগজের ব্যবসায়ী, (পরে অদ্বৈতানন্দ)।

৭। নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তরুণ মনীষী। তিনি এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। (পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ)।

১৮৮২ : ৮। কলিকাতা, শ্যামবাজারস্থ বিদ্যাসাগর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পরে তিনি 'ম' এই ছদ্মনামে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' রচনা করেন। আমার যদি ভুল না হয়, তবে ইনি 'মর্টন ইনস্টিটিউশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক ছিলেন।

৯। তারকনাথ ঘোষাল। ইনি ব্রাহ্মসমাজের একজন সদস্য এবং উকিলের পুত্র। বর্তমানে ইঁহার নাম শিবানন্দ। ইনি বর্তমান প্রধান মঠাধ্যক্ষ।

১ সারদানন্দের মতে, রামকৃষ্ণের শিষ্যরা সকলেই ১৮৮৪ খৃস্টাব্দ শেষ হইবার আগেই আসেন। এবং তাঁহাদের অধিকাংশ আসেন ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি এবং ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে।

১০। যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। দক্ষিণেশ্বরের একটি অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে ইঁহার জন্ম। (পরে যোগানন্দ নামে পরিচিত)।

১৮৮৩ : ১১। শশীভূষণ। (রামকৃষ্ণানন্দ)।

১২। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। (পরবর্তীকালে সারদানন্দ)। ইনি পঁচিশ বৎসরেরও অধিক কাল রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী ছিলেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মসমাজের সদস্য। ইনি রামকৃষ্ণের বিখ্যাত জীবনীকার।

১৩। কালীপ্রসাদ চন্দ। ইনি ইংরেজী ভাষার জনৈক অধ্যাপকের পুত্র। (পরে অভেদানন্দ নামে পরিচিত)।

১৪। হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ; জাতিতে ইনি ব্রাহ্মণ। (পরে তুরীয়ানন্দ নামে পরিচিত)।

১৫। হরিপ্রসন্ন চাটার্জী, জনৈক ছাত্র। (বিজ্ঞানানন্দ)।

১৮৮৪ ১৬। গঙ্গাধর ঘটক, চতুর্দশবর্ষীয় জনৈক ছাত্র। (পরে অখণ্ডানন্দ)।

১৭। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত অভিনেতা এবং নাট্যকার। আধুনিক বাংলা রংগমঞ্চের প্রবর্তক ; কলিকাতা স্টার থিয়েটারের পরিচালক।

১৮৮৫ ১৮। সুবোধ ঘোষ, জনৈক সপ্তদশবর্ষীয় ছাত্র। পরে ইনি কলিকাতার একটি কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। (সুবোধানন্দ)।

১৯। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। ইনি মাত্র তেরো বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণের নিকট আসেন। ইনি রামকৃষ্ণের ছয়জন শ্রেষ্ঠ শিষ্যের অন্যতম।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সহিত রামকৃষ্ণের ঠিক কবে আলাপ হইয়াছিল, তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই :

২০। ধনী জমিদার বলরাম বসু। তিনি পরিণতবয়স্ক এবং অতীব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অর্থ সাহায্য করেন।

২১। একদা প্রেততত্ত্বের প্রক্রিয়ার তরুণ 'মিডিয়াম' নিত্যরঞ্জন ঘোষ ; তাঁহাকে রামকৃষ্ণ তাঁহার নিজের শক্তির দ্বারা প্রেততত্ত্ব হইতে উদ্ধার করেন।[১] ইনি পরে নিরঞ্জনানন্দ নামে পরিচিত হন।

১ "তুমি যদি কেবল ভূতের কথা ভাবো, তবে নিজেও ভূত হইয়া যাইবে। যদি তুমি ভগবানের কথা ভাবো, তবে নিজে ভগবানে পরিণত হইবে। বাছিয়া লও।"

২২। দেবেন্দ্র মজুমদার ; জনৈক পরিণতবয়স্ক বিবাহিত ভদ্রলোক। ইনি একটি জমিদার সেরেস্তায় চাকরি করিতেন। ইনি বাংগালী কবি স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভ্রাতা।

২৩। প্রায় বিশ বৎসর বয়স্ক ছাত্র বাবুরাম ঘোষ। (পরবর্তীকালে প্রেমানন্দ)।

২৪। অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক ছাত্র তুলসীচরণ দত্ত। (পরে নির্মলানন্দ)

২৫। দুর্গাচরণ নাগ ; ইনি রামকৃষ্ণের সংসারী শিষ্মের মধ্যে প্রধান। ইত্যাদি।[১]

ইহা সহজেই লক্ষণীয় যে, গরীব চাকর লাটু ছাড়া শিষ্যদের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী, এবং অভিজাত ব্রাহ্মণ ও ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা কেহ কিশোর, কেহ বা যুবক। তাঁহাদের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়াছিলেন। তবে যাঁহারা রামকৃষ্ণ মিশনে সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়াছিলেন এবং রামকৃষ্ণের চিন্তাধারাকে ব্যাখ্যা ও বহন করিয়াছিলেন, এখানে আমি কেবল তাঁহাদেরই উল্লেখ করিয়াছি।

জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে একটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল মানুষের জনতা সর্বদা তাঁহাকে অধীরভাবে ঘিরিয়া থাকিত। মহারাজা হইতে ভিক্ষুক, সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিদ্বান, পণ্ডিত, ব্রাহ্ম, খৃস্টান, মুসলমান, ধর্মাশ্রয়ী, ব্যবসায়ী, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একসংগে একত্রে আসিয়া ভীড় করিত। বহুদূর হইতে লোকে তাঁহাকে প্রশ্ন শুধাইতে আসিত। দিবারাত্রি তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ ঘণ্টা কাল তিনি যাত্রীদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। পরিশ্রমের ভারে তাঁহার দুর্বল দেহ ভাঙিয়া পড়িলেও তিনি কাহাকেও ফিরাইতেন না। প্রত্যেককে সহানুভূতির সহিত জ্ঞান বিতরণ করিতেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি যখন কোনো কথা কহিতেন না, তখনো তাঁহার আত্মার সেই অপূর্ব অপরূপ শক্তি যাত্রীদের সমস্ত মনকে যেন সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিত এবং যাত্রীরা কয়েকদিনের জন্য যেন নূতন মানুষ হইয়া থাকিতেন। রামকৃষ্ণ সকল অকপট ধর্মবিশ্বাসীদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন মতের ধর্মার্থীরা যাহাতে তাঁহার সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাহাতে মীমাংসা সম্ভব হয়, সেজন্য তিনি সকল ধর্মের লোককেই সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিতেন।

১ সারদা প্রসন্ন মিত্রের (স্বামী ত্রিগুণাতীতের) নাম এই তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে। তিনি রামকৃষ্ণদেবের আশ্রমশিষ্যদের অন্যতম।—ইংরেজী সংস্করণের প্রকাশকের টীকা দ্রষ্টব্য।—অনুঃ

কিন্তু তাঁহার নিকট উহা ছিল সংগতিসাধনের একটি অংগ মাত্র। যুধ্যমান ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলন-সাধনের অপেক্ষা তিনি বহুগুণে মহত্তর কিছু চাহিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, মানুষ মানুষকে বুঝিবে, তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে, তাহাকে ভালবাসিবে, সমগ্র মানবজীবনের সহিত নিজেকে এক করিয়া তুলিবে। কারণ, ভগবান যদি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই থাকেন, তবে প্রত্যেক মানুষের জীবনই তো তাঁহার ধর্ম। এবং তাহা সকলেরই ধর্ম হওয়া উচিত।

মানব-জাতির মধ্যে যতোই পার্থক্য থাক, আমরা যতোই তাহাকে ভালোবাসিব, আমরা ততোই ভগবানের নিকটতর হইব।[১] ভগবানকে মন্দিরে খুঁজিয়া, ভগবানের নিকট অলৌকিক ক্রিয়া করিবার বা আবির্ভূত হইবার জন্য আবেদন করিয়া কোনো লাভ হইবে না। তিনি এখানে, ওখানে, সর্বত্র সর্বদাই রহিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে দেখিতেছি, তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি। কারণ, তিনি আমাদেরই ভাই, বন্ধু, পরিজন, শত্রু, তিনিই আমাদের আত্মা। এই সর্বব্যাপী বিধাতা রামকৃষ্ণের আত্মা হইতে উৎসারিত হইতেন বলিয়াই রামকৃষ্ণের দীপ্তিতে তাঁহার চারিদিকের সংখ্যাতীত মানুষ নিঃশব্দে অজ্ঞাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেন। তাই তাঁহারা, কারণ না বুঝিলেও অনুভব করিতেন, তাঁহারা যেন উর্ধ্বতর লোকে নীত হইয়াছেন, শক্তিলাভ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলেন :

"নূতন ভিতের উপর ভিত্তি করিয়াই আমাদের প্রাসাদ রচনা করিতে হইবে। অন্তর্জীবনে আমাদিগকে এমন তীব্রভাবে বাঁচিতে হইবে যে, সে-জীবনই একদা পরম সত্তায় পরিণত হইবে। এই পরম সত্তাই আমাদিগকে সত্যের অবণিত আলোক পাঠাইয়া দিবেন। সমুদ্র উঠে নামে, কারণ, তাহার মালিক যে-পাহাড়, সে ঠায় স্থির বসিয়া থাকে।…যতোদিন লাগে ক্ষতি নাই, এস, আমরা আমাদের মধ্যেও ভগবানের পর্বত গড়িয়া তুলি। এই গড়া যখন আমাদের শেষ হইবে, তখন সকল কালের সকল মানুষের জন্য করুনা ও জ্ঞানের আলোক এই পর্বত হইতে প্রবাহিত হইবে।"[২]

১ "ভগবানকে খুঁজিতেছ। তাঁহাকে মানুষের মধ্যেই খোঁজো। সকল বস্তুর অপেক্ষা মানুষের মধ্যেই তিনি অধিক প্রকট।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)

২ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ।

সুতরাং সেখানে নূতন কিছু ধর্মমত গড়িয়া তোলার বা ব্যাখ্যা করিবার কোনো প্রশ্নই ছিল না।

প্রেমানন্দ রামকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছিলেন, "মা, যাঁহারা ধর্মমতে বিশ্বাসী, তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া আমার কাছে টানিয়া যেন আমাকে বিখ্যাত হইতে দিও না! আমার মধ্য দিয়া ধর্মমতের ব্যাখ্যা করিও না।"

তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে সকল প্রকার রামকৃষ্ণবাদিতার বিরুদ্ধেই সতর্ক করিয়া দেন।

সর্বোপরি, কোনো প্রকার বাধা থাকিতে দেওয়া হইবে না!

"বাধাতে নদীর কোনো প্রয়োজন নাই। নদীর গতি রুদ্ধ হইলে তাহা গতিহীন এবং দূষিত হইয়া পড়ে।"

বরং নিজের এবং অন্যান্য সকল মানুষের সংকল্পের পথগুলিকে উদার উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে একটি সর্বজয়ী ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে। তাঁহার স্বনির্বাচিত শিষ্যদের ইহাই ছিল প্রকৃত কর্তব্য—তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় "সেই পরম সত্তাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যে-সত্তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নরনারীকে পুষ্ট পরিণত করিয়া তুলিবে।"

তাঁহাদের ভূমিকা ছিল সক্রিয় ভূমিকা। এই ভূমিকায় প্রয়োজন ছিল বিরাট শক্তি এবং মন ও মস্তিষ্কের উদার সহনশীলতা। নিজের সম্পর্কে কাহারও কৃপণ হইলে চলিবে না, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিতে হইবে।

তাই ভগবানের সহিত যোগ-সাধনের জন্য রামকৃষ্ণ সকল মানুষকে আহ্বান করিলেও শিষ্য নির্বাচনের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কারণ, শিষ্যরাই পথ, এই পথের উপর পদক্ষেপ করিয়াই মানব-সমাজ অগ্রসর হইবে। রামকৃষ্ণ বলিতেন, তিনি তাঁহার শিষ্যদের নির্বাচন করেন নাই, 'মা'-ই করিয়াছেন।[১] কিন্তু

১ "আমি তাহাদিগকে নির্বাচন করি না। মা তাহাদিগকে আমার নিকট পাঠান। আমাকে দিয়া তিনি তাহাদিগকে পরীক্ষা করাইয়া লন। রাত্রিতে আমি যখন ধ্যানস্থ হই, তখন যবনিকা সরিয়া যায়, তাহারা আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করে; তখন নরনারীর অহমকে যেন কাচের ভিতর দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আমি দীক্ষা দিবার পূর্বে আমার শিষ্যদের চরিত্র সম্পর্কে জানিয়া লই।"

যাঁহাদের অনুভূতি-চেতনা রহিয়াছে, তাঁহাদের কেহই চিন্তার এই রীতিকে অস্বীকার করিতে পারেন না। এই রীতি হইল পার্থিব বস্তুর নীরব উগ্র পরিপার্শ্বের মধ্যে, মানসসত্তার নির্জন কেন্দ্রদেশে, নিমীলিত আঁখিপল্লবের আবরণে অনুভূতি বিদগ্ধ অন্তর্মুখী দৃষ্টির ব্যবহার-রীতি। এই দৃষ্টির তীব্রতা এবং প্রকাশের ভংগীতে পার্থক্য থাকে, এই মাত্র।

আমাদের অন্তরের গভীরে আমরা যে সত্তাকে বয়ন করিতেছি, মার সহিত তাহার পার্থক্য কি ? অসংখ্য মানুষের ভীড়ের মধ্যে থাকিয়াও জীবনে যাঁহারা রামকৃষ্ণের ন্যায় তীব্র একক সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার অসাধারণ শক্তি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সত্তা শুন্ধের ন্যায় কার্য করে, উহা অন্তরন্তর মানুষকে স্পর্শ ও পরীক্ষা করিয়া দেখে। অতীব অলক্ষ্যে তাহা মানুষের অন্তরের গভীরতাকে—তাহার শক্তি এবং দৌর্বল্যকে, তাহার দোষ এবং গুণকে যাহা লক্ষিত মানুষের কাছেও অস্পষ্ট এবং অলক্ষিতে থাকে, এমন বহু বস্তুকেই এবং তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে পরিমাপ করিয়া দেখে। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে গিয়া পৌছিতে পারে। তাহার শক্তির বাস্তবতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অবশ্য প্রায়ই সংশয় পোষণ করে। জল মাপিবার বাঁও যেমন জলের তলায় মাটি স্পর্শ করে এবং সেই বাঁও-এর উপরিভাগের কম্পন অনুসারে জলের গভীরতা নিরূপিত হয়, তেমনি ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও মানুষের অন্তর-অবগাহী দৃষ্টির দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে। উহা প্রকৃতি-সীমার বহির্ভূত নহে।

মার হাতে রামকৃষ্ণ ছিলেন অপূর্ব একটি দণ্ড। তাঁহার দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক অতি অনুভূতিশীলতা সম্পর্কে বহু অসাধারণ কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। জীবনের শেষের দিকে ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও আতংক এতোই প্রবল হইয়া উঠে যে, সোণার স্পর্শ লাগিলেও তিনি প্রদাহ অনুভব করিতেন।[১] লোকে বলে, অশুদ্ধ মানুষের ছোঁয়া লাগিলে তিনি নাকি বিষাক্ত সর্পের দংশনের মতো দৈহিক যতনা পাইতেন।[২]

১ বিবেকানন্দ বলেন, 'এমন কি তিনি যখন নিদ্রিত থাকিতেন, তখন যদি তাঁহার গায়ে মুদ্রার স্পর্শ দিতাম, তাহা হইলেও তাঁহার হাত বাঁকিয়া যাইত এবং সর্বাংগ যেন পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইয়া পড়িত।' '*My Master*' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২ এই কিম্বদন্তীমূলভ দিকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে : "একদিন রামকৃষ্ণ করুণা-পরবশ হইয়া একটি লোককে স্পর্শ করিতে রাজী হন। লোকটি বাহিরে পরিষ্কার থাকিলেও ভিতরে পরিচ্ছন্ন ছিল না। রামকৃষ্ণ যাহাতে তাহাকে শিষ্য করিয়া লন, সেজন্য সে রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করে। রামকৃষ্ণ তাহাকে সদয় করুণার সহিত বলেন : "ভগবানের স্পর্শ তোমার মধ্যে বিষে পরিণত হইয়াছে।" তিনি আরো বলেন, "বাছা, এজন্মে তোমার মুক্তি হইবে না।"

তাঁহার এই ধরণের অতি-অনুভূতিশীলতা সম্পর্কে হাজারো দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে ; রাস্তায় একটি লোক রাগিয়া উঠিয়া একবার একটি লোককে প্রহার করে, সেই প্রহারের চিহ্ন রামকৃষ্ণের দেহে দেখা যায়। রামকৃষ্ণের ভাইপো দেখিয়াছিলেন, একটি লোকের পিঠের চাবুকের ঘা রামকৃষ্ণের নিজের পিঠেও লাল হইয়া দেখা দেয় এবং তিনি সেখানে প্রদাহ অনুভব করেন। দাগ পড়িবার কথা গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিজে

কেহ তাঁহার কাছে আসিলে তিনি তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার আত্মাকে দেখিতে পাইতেন। তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে না জানিয়া কখনো কোনো শিষ্য গ্রহণ করেন নাই।[১] চরিত্র তখনো গঠিত হয় নাই, এমন অপরিণতবয়স্ক বালককে দেখিয়াও তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, সে কি জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অনেক সময় তিনি মানুষের মধ্যে এমন প্রচণ্ড শক্তি আবিষ্কার করিতেন, যে সম্পর্কে সেই শক্তির অধিকারী বিন্দুমাত্র সচেতন ছিল না। সম্ভবত, এই আবিষ্কারের দ্বারাও তিনি ঐ শক্তির উদ্ভবকে সাহায্য করিতেন। আত্মার এই বিরাট নির্মাতা তাঁহার অগ্নিময় অঙ্গুলির প্রয়োগে বিবেকানন্দের ন্যায় কঠিন ধাতুকে এবং যোগানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের মতো সুকোমল নবনীত বস্তুকে আপনার ছাঁচে ফেলিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। একটি অদ্ভুত বিষয় এই যে, রামকৃষ্ণের ইচ্ছার অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরোধীও, শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, তাঁহার ইচ্ছার নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইত, এবং তিনি তাহার জন্য যে আধ্যাত্মিক পথ নির্বাচিত করিয়াছেন, সে তাহাই গ্রহণ করিত। তখন সে পূর্বে যেরূপ আবেগের সহিত বিরোধিতা করিতেছিল, ঠিক সেইরূপ ঐকান্তিক আবেগের সহিতই তাঁহার নিকট আবার আত্মসমর্পণ করিত। কোন্ মানুষ কি উদ্দেশ্যে পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাহাকে নিয়োগ করিতেন। রামকৃষ্ণের শ্যেন দৃষ্টি কখনো ব্যর্থ হয় নাই।

পরিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ করা চলে না। সকল প্রকারের জীবনের সহিত এই আত্মিক যোগাযোগ রামকৃষ্ণকে এমন কি জীবজন্তু এবং লতাগুল্মের সহিত অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মাটিতে কঠিন ভাবে পা ফেলিলে, তাহাও তাঁহার বুকে গিয়া বাজিত।

১ রামকৃষ্ণ অন্ধের মতো তাঁহার অনুভূতি-চেতনার উপর নির্ভর করিতেন না। তিনি তরুণ শিষ্যদের শিক্ষকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহাদের নিকট খোঁজখবর লইতেন এবং শিষ্যদিগকে ধ্যানস্থ অবস্থায় তিনি নিজে লক্ষ্য করিতেন। তিনি নিবিড় মনোযোগের সহিত শিষ্যদের শ্বাস-প্রশ্বাসের, নিদ্রার এবং, এমন কি, হজম করিবার শারীরিক লক্ষণগুলি-ও লক্ষ্য করিতেন। শিষ্যদের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তাঁহাদের ভবিষ্যৎ নিরূপণ সম্পর্কে এগুলির প্রচুর গুরুত্ব আছে, রামকৃষ্ণ এমন মনে করিতেন।

৯

ঠাকুর ও তাঁহার সন্তানেরা

রামকৃষ্ণকে ঘিরিয়া যে সকল মহাত্মা ছিলেন, তাঁহাদিগকে দুইভাগে ভাগ করা যায় : একটি ভাগ হইল সেই সকল নরনারীদের লইয়া গঠিত একটি তৃতীয় স্তর[১] যাঁহারা সংসারে থাকিয়া ভগবানের সেবা করিবেন ; এবং অপর ভাগটি হইল একদল বাছাই-করা শিষ্য, যাঁহারা তাঁহার বাণী প্রচার করিবেন।

আমরা প্রথমে প্রথম ভাগটি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কারণ যে-সর্বগ্রাহিতার মনোভাব রামকৃষ্ণদেবকে এমন সজীব করিয়া তুলিত, তাহা এই ভাগটি হইতেই সহজে বোঝা যায়, এবং আরো বোঝা যায় যে, তাঁহার ধর্ম কি অপরের পক্ষে কি নিজের পক্ষে মনুষ্য সমাজের প্রতি সকলের কর্তব্য সম্পর্কে কিরূপ সচেতন ছিল।

সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষদিগকে তিনি কখনো সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে বলেন নাই। বিপরীত পক্ষে, যাঁহারা ইতিপূর্বেই বিবাহিত জীবনে বা পিতামাতার নিকট সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে 'মোক্ষের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করো' একথা বলিতে তিনি সর্বদা বিরত থাকিতেন।

তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন, "বাছা, তোমার নিজের ধর্মের জন্য অপরের ন্যায়সংগত অধিকার অস্বীকার করিও না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত মোক্ষ স্বার্থপরতায় পরিণত হইয়াছে। ফলে, তাহাতে আত্মার হীনতর মৃত্যু ঘটিয়াছে।"

"ভগবানের কাছে আমাদের ঋণ রহিয়াছে। পিতামাতার নিকট আমাদের ঋণ রহিয়াছে। স্ত্রীর নিকট আমাদের ঋণ রহিয়াছে। অন্ততঃপক্ষে পিতামাতার ঋণ শুধিবার আগে কোনো কাজই সন্তোষজনক ভাবে করা যাইতে পারে না ; হরিশ তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া এখানে আসিয়া আছে। তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণের সুব্যবস্থা যদি না থাকিত, তবে তাহাকে আমি বদলোক বলিতাম।...একদল লোক আছেন, তাঁহারা কেবলই শাস্ত্রবাক্য আওড়ান। কিন্তু তাঁহাদের কথার সংগে কাজের কোনো মিল নাই ! রমাপ্রসন্ন বলেন, মনু বলিয়াছেন, সাধুসেবা করো। অথচ তাঁহার মা ক্ষুধায় মরিতেছেন, ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।...এ সব ব্যাপারে আমি অত্যন্ত রুষ্ট হই। মা যদি অসৎ হন, তবু তাঁহাকে পরিত্যাগ করা

---

১ তৃতীয় স্তর : আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস অর্ধ-শিক্ষিত, অর্ধ-ধর্মপ্রাণিত লোকদের স্তরকে এই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই স্তরে ধর্মভীরু সংসারীরা থাকিতে পারিতেন (এখনো পারেন)।

চলে না। বাপমার অভাব অনটন যতোদিন থাকিবে, ততোদিন ভক্তিসাধনে কোনো ফল নাই।[১]

"স-র ভাই এখানে কয়েকদিনের জন্য আসিয়াছিল। সে তাহার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে তাহার শালার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে। আমি তাহাকে খুব বকিলাম।··· এতোগুলি ছেলেমেয়েকে লালন-পালন না করিয়া ফেলিয়া আসা কি অপরাধ নয়?—তাহাদিগকে কি রাস্তার লোকে খাওয়াইবে, দেখাশোনা করিবে?···একটা লজ্জাজনক ব্যাপার!···আমি তাহাকে গিয়া কাজের খোঁজ করিতে বলিলাম।"

"তোমার ছেলেমেয়েদের লালনপালন করিতে হইবে। স্ত্রীর খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তোমার মরিবার পর স্ত্রীর যাহাতে কোনো অভাব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা যদি তুমি না করো, তবে তুমি হৃদয়হীন। যাহার হৃদয় নাই, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য।[২]

"আমি লোককে বলি, ভগবানের কথা যেমন তাহাদিগকে ভাবিতে হইবে, তেমনি সংসারের কর্তব্যও তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে। আমি তাহাদিগকে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে বলি না। (মৃদু হাসিয়া) সেদিন বক্তৃতা দিবার সময় কেশব বলিয়াছিল: 'ভগবান, আমাদিগকে ভক্তি নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সচ্চিদানন্দের সাগরে গিয়া পৌঁছিতে দাও!' চিকের আড়ালে মেয়েরা ছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে দেখাইয়া কেশবকে বলিলাম, 'তোমরা যদি এক সংগে সবাই ঝাঁপাইয়া পড়ো, তবে ইঁহাদের অবস্থা কি হইবে?·· সুতরাং, তোমাদিগকে মাঝে মাঝে জলের উপরে আসিতে হইবে; ডুবিবে, উঠিবে; উঠিবে ডুবিবে!' কেশব এবং অন্যান্য সবাই হাসিতে লাগিলেন।"[৩]

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলপ্রসংগ (*Life of Ramakrishna*) দ্রষ্টব্য।

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, ২৬৬ পৃষ্ঠা।

ধনী কেশবের অপেক্ষা গরীবের ছেলে রামকৃষ্ণ জীবনে অভাব অনটন সম্পর্কে অধিক অবহিত ছিলেন। তিনি জানিতেন, কোনো নিষ্কর্মা ভক্তের মতো জীবনের সমস্ত সময় ধর্মকাজে অতিবাহিত করিবার অপেক্ষা কোনো গরীব মজুরের দিনান্তে একবার হরিনাম করিবার মূল্য অনেক বেশী।

"একদিন নারদ (এই নীতিগল্পটি যেমন জ্ঞানগর্ভ, তেমনি তিক্ত) ভাবিলেন যে, তিনিই সর্বাপেক্ষা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। ভগবান বলিলেন, তুমি গিয়া দেখ, মাঠের চাষারা তোমার চেয়ে অনেক বেশী পুণ্যবান। নারদ দেখিতে গেলেন। চাষারা ঘুম হইতে উঠিবার সময়, এবং ঘুমাইবার সময় মাত্র দুইবার হরিনাম

"বিবাহিত মানুষ হিসাবে তোমার দুই একটি ছেলেমেয়ে হওয়ার পর স্ত্রীর সহিত ভাই-বোনের মতো বাস করা, এবং যাহাতে সংযমের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে পাও, তাঁহার জন্য প্রার্থনা করাই তোমার কর্তব্য।"[১]

"যে মানুষ একবার ভগবানের স্বাদ পাইয়াছে, সংসার তাহার কাছে যে বিস্বাদ লাগিবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সংসারে থাকিয়া ধর্ম পালন করা হইল একটি মাত্র আলোক রশ্মিযুক্ত ঘরে বাস করা। উন্মুক্ত আলোকে যাহাদের বাস করা অভ্যাস, তাহারা ঐ কয়েদে বাস করিতে পারে না।[২] কিন্তু, গৃহে থাকিলে গৃহকর্মগুলি তোমাকে করিতে হইবে। ঐ আলোক রশ্মিটি উপভোগ করিবার জন্য গৃহকর্মগুলি করিতে শিখো। ঐ আলোকের এককণাও হারাইও না। কখনো উহার স্পর্শ হারাইও না। যখন কাজ করিবে, তখন একহাতে কাজ করো, এবং অন্যহাতে ভগবানের পা ছুঁইয়া থাকো। যখন কাজ থাকিবে না, তখন দুইহাতে তাঁহার পা জড়াইয়া বুকে চাপিয়া ধরো![৩]...যদি সংসার ছাড়ো, তাহাতে কি লাভ হইবে? পারিবারিক জীবন তোমার নিকট দুর্গের মতো।...তাহা ছাড়া, যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে সর্বদা মুক্ত। কেবল পাগলেই বলে, "আমি শিকলে বাঁধা আছি," এবং এইরূপ বলিয়া বলিয়া অবশেষে সত্যই সে শিকলে বাঁধা পড়ে।...মন-ই সব। মন যদি মুক্ত থাকে, তবে তুমিও মুক্ত। বনেই থাকি, আর সংসারেই থাকি, আমি শিকলে বাঁধা নই। রাজার রাজা যে ভগবান, আমি তো তাঁরই ছেলে।"

এইভাবে রামকৃষ্ণ প্রত্যেককে তাহার মুক্তিলাভের উপায় বাৎলান, বলেন,—অন্তরতর নির্ঝর ধারায় তৃষ্ণা নিবারণ করো; নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে না গিয়া,

---

করে। বাকী দিনটা সে মাঠে কাজ করে। নারদ কিছুই বুঝিলেন না। ভগবান তাঁহাকে বলিলেন যে, তুমি একবাটি তেল কানায় কানায় ভরিয়া তাহা হাতে করিয়া শহরের চারিদিকে ঘুরিয়া আইস, যেন এক ফোঁটাও না পড়ে। নারদ তাহাই করিলেন। নারদ যখন এক ফোঁটাও তেল না ফেলিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন ভগবান বলিলেন, 'তুমি আমার কথা কয়বার ভাবিয়াছিলে?' প্রভু, আপনার কথা আর কেমন করিয়া ভাবি? আমার সমস্ত মনটা তো তেলের বাটির দিকেই ছিল। এইরূপে ভগবান নারদকে বুঝাইলেন, কৃষকটির ভক্তি কতো; কৃষক তাহার কাজের মধ্যেও ভগবানের নাম লইতে ভুলে না।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী, প্রথম ভাগ, ৪৫ পৃষ্ঠা।)

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ।

২ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সহিত সাক্ষাৎকার।

৩ ১৮৮২ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্যদের সহিত সাক্ষাৎকার।

নিজের প্রকৃতিকে ব্যাহত বা "বাধ্য" না করিয়া, এবং, সর্বোপরি, তোমার উপর যাহারা নির্ভরশীল তাহাদিগের প্রতি অবিচার না করিয়া সকল মানুষের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, সেই ভগবানের সর্বব্যাপী অস্তিত্বকে উপভোগ করায় অংশগ্রহণ করো। মানুষকে তাহার ন্যায্য স্নেহমমতা হইতে রামকৃষ্ণ কখনো বিরত করেন নাই। বরং ঐ স্নেহ মমতাকেই তিনি জ্ঞানের পথ বলিয়া নির্দেশ করেন— ঐ শান্তিপূর্ণ পথেই সুন্দর চিন্তাগুলির সহিত মানুষের মিলন ঘটে, ঐ পথেই শুদ্ধ ও সরল মানুষরা ভগবানে গিয়া উত্তীর্ণ হন। উহার একটি সুন্দর নমুনা :

রামকৃষ্ণের জনৈক শিষ্যের (মণিলাল মল্লিকের) কন্যা চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি রামকৃষ্ণকে দুঃখের সহিত জানান যে, উপাসনার সময় ভগবানে তাঁহার কোনো রকমে মন বসে না। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন :

"পৃথিবীতে তুমি সবচেয়ে কাকে ভালোবাসো ?"

মহিলা বলেন, তাঁহার শিশু ভাইপোটিকে।

ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, "বেশ, তাহার উপরই তবে তোমার মন ন্যস্ত করো।"

মহিলাটি রামকৃষ্ণের কথামতো কাজ করিলেন এবং, ঐ শিশুর মধ্য দিয়াই তিনি বাল-গোপালের ভক্ত হইয়া উঠিলেন।[১]

রামকৃষ্ণের মধ্যে এই কোমলতার কুসুমটিকে আমি ভারি ভালবাসি! কী গভীর অর্থ এই কোমলতার! আমাদের হৃদয় রাত্রির মতো যতোই ঘনান্ধকার হউক না কেন, আমাদের প্রত্যেকের সত্যকার প্রেমের হীনতম তাড়নার মধ্যেও দিব্য স্ফুলিংগ বর্তমান থাকে। এই ক্ষীণ দীপালোক আমাদের প্রত্যেকেরই রহিয়াছে; এই দীপালোকই আমাদের পথ আলোকিত করিতে যথেষ্ট। এবং মানুষ যদি তাহার ব্যক্তিগত পথকে অকপট বিশ্বাসের সংগে অনুসরণ করে, তবে তাহার পক্ষে

---

১ অনুরূপ আর একটি কাহিনী :

এক ঠাকুরমা বৃদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে চাহিলেন! কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বাধা দিলেন, বলিলেন, বৃদ্ধা তাঁহার নাতনীকে অত্যন্ত বেশী ভালোবাসেন, সুতরাং তিনি একমনে ভগবানের কথা ভাবিতে পারিবেন না, নাতনীর কথা কেবলই তাঁহার মনে পড়িবে। রামকৃষ্ণ আরো বলিলেন :

"বৃন্দাবনে গিয়া তুমি যাহা পাইবে ভাবিতেছ, তাহা তুমি এখানে বসিয়াই পাইতে পার। তুমি তোমার নাতনীকে শ্রীরাধিকা বলিয়া ভাবো, এবং তাহার প্রতি তোমার স্নেহকে আরো বাড়াইয়া তোলো। তাহাকে তোমার অভ্যাসমতো আদর-যত্ন করো, মন ভরিয়া খাওয়াও, পরাও। তবে কেবলই ভাবো, ঐ কাজগুলি তুমি বৃন্দাবনের সেই দেবীর উদ্দেশ্যেই করিতেছ।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশাবলী, প্রথম ভাগ)

সুতরাং শুদ্ধি ও শান্তিতে জীবন যাপন করো এবং প্রিয়জনদের ভালোবাসো। অর্থাৎ তাহাদের মধুর আবরণের মধ্য দিয়াই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করো এবং তাঁহাকে সেজন্য ধন্যবাদ দাও।

সকল পথই সুপথ, এমন কি কুপথগুলিও।[১] এবং সেই পথই প্রত্যেকের স্ব স্ব ব্যক্তিগত নিয়তি। বাকীটুকু ভগবান নিজে দেখিয়া লইবেন। সুতরাং বিশ্বাস রাখিয়া অগ্রসর হও!

রামকৃষ্ণের "মাতৃ"[২] চক্ষু কিরূপ গভীর এবং তিতিক্ষু অন্তর্দৃষ্টির সহিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা পথভ্রষ্ট সন্তানকেও লক্ষ্য করিত এবং তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিত, তাহা অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার সম্পর্কের কাহিনী হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। এই কাহিনীটিও আসিসির ফ্রান্সিসের কাহিনী-কিম্বদন্তীগুলিরই অনুরূপ।

এই বিখ্যাত অভিনেতা এবং নাট্যকার ছিলেন উচ্ছৃংখল, ব্যভিচারী ও ঈশ্বরবিদ্বেষী। অবশ্য, প্রতিভার জোরে মাঝে মাঝে তিনি ধর্মসংক্রান্ত নাটকও লিখিতেন।[৩] তবে এই ধরণের রচনাকে তিনি খেলার মতো দেখিতেন। তিনি কখনো বুঝেন নাই যে, তিনি নিজে ভগবানের হস্তে একটি ক্রীড়নক মাত্র। অথচ রামকৃষ্ণ প্রথম দৃষ্টিতেই তাহা বুঝিতে পারিলেন।

লোকে পরমহংসের কথা বলে, তাহা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিরিশচন্দ্রের কৌতূহল হইল। সার্কাসে অদ্ভুত কিছু বস্তু দেখিতে মানুষের যেমন কৌতূহল হয়, এ-ও ঠিক তেমনি। তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় গিরিশচন্দ্র মত্ত ছিলেন, তিনি রামকৃষ্ণকে অপমান করিলেন। রামকৃষ্ণ প্রশান্ত পরিহাসের সংগে বলিলেন:

"তুমি অন্ততপক্ষে ভগবানের নামে মদটা খাইলে পারো। সম্ভবত তিনিও মদ খান।"

মত্ত গিরিশচন্দ্র মুখ ব্যাদন করিয়া বলিয়া উঠিলেন:

"তুমি তাহা কেমন করিয়া জানিলে?"

১ যে-পথই অনুসরণ করো, আসল কথা হইল সত্যের প্রতি তোমার তীব্র লালসা। ভগবান তোমার মনের গোপনকথা জানেন। তুমি যদি অকপটে পথ চলো, হউক তাহা ভুল পথ, তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই। তিনি নিজেই তোমাকে ঠিক পথে লইয়া যাইবেন। সবাই জানে, কোনো পথ নিখুঁত নির্ভুল নয়। প্রত্যেকেই ভাবে যে, তাহার ঘড়িটা ঠিক চলিতেছে; কিন্তু আসলে কোনো ঘড়িতেই ঠিক সময় দেয় না। কিন্তু তাহাতে লোকের কাজ আটকায় না। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ, ৬৪৭ পৃঃ)

২ মাতৃ: দেবীমাতৃকার।

৩ এই নাটকগুলির কতিপয় বাংলা হইতে ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া পরিচিত।

"মদই যদি না খাবেন, তবে এই উচ্ছৃংখল উলটপালট জগৎটা তৈয়ার করিলেন কেমন করিয়া?"

গিরিশচন্দ্র বোকা বনিয়া গিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি চলিয়া গেলে রামকৃষ্ণ তাঁহার বিস্মিত শিষ্যদের কহিলেন:

"লোকটা ভগবানের একজন বড়ো ভক্ত।[১]"

গিরিশচন্দ্রের আমন্ত্রণে রামকৃষ্ণ কলিকাতায় থিয়েটারে তাঁহার অভিনয় দেখিতে গেলেন।[২] গিরিশচন্দ্র দাম্ভিক ছিলেন, তিনি রামকৃষ্ণের নিকট প্রশংসা প্রত্যাশা করিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, তুমি আত্মাবিকৃতির রোগে ভুগিতেছ।"

গিরিশচন্দ্র ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং রামকৃষ্ণকে অপমান করিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের নিকট মার্জনা চাহিতে আসিলেন এবং রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র মদ্যপান ছাড়িতে পারিলেন না। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িতেও বলিলেন না। ফলে পরে একদা গিরিশচন্দ্র তাঁহার ঐ অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিলেন। কারণ, তিনি নিজে যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাঁহাকে ইহা অনুভব করিবার সুযোগ দিয়া রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের মানসিক বল বাড়াইয়া তুলিলেন।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট ছিল না। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, কুকার্য হইতে বিরত থাকার গুণটা অত্যন্ত নঙর্থক; তাঁহাকে ভগবানের নিকটবর্তী হইতে হইবে। গিরিশচন্দ্র দেখিলেন তাহা অসম্ভব, কারণ এ পর্যন্ত তিনি কখনো সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার বশীভূত হইতে পারেন নাই। হতাশ হইয়া গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "উপাসনা এবং ধ্যান করিবার অপেক্ষা তিনি আত্মহত্যাকেই সহজ বলিয়া গ্রহণ করিবেন।"

উত্তরে রামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি তোমার কাছে খুব বেশী কিছু দাবী করিতেছি না। কেবল খাওয়ার আগে একবার এবং শোবার আগে একবার তুমি ভগবানকে ডাকিবে। তাহাও কি তুমি পারো না?"

"না,—পারি না। বাঁধাধরা নিয়ম আমি সহিতে পারি না। উপাসনা বা ধ্যান

১ এখানে এবং পুস্তকের অন্যত্র 'ভক্ত' কথাটি ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

২ ১৮৮৪ খ্রস্টাব্দের শেষাশেষি। 'চৈতন্যলীলা' নাটকের প্রথম কয়েকটি অভিনয়ের একটিতে রামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন।

করিতেও আমি পারিব না। এমন কি, এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানের কথা আমি ভাবিতে পারি না।"

রামকৃষ্ণ জবাবে বলিলেন, "উত্তম, সত্যই যদি তোমার ভগবানকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, অথচ তাঁহার দিকে এক পা-ও অগ্রসর হইতে তুমি না চাও, তবে আমাকে তোমার প্রতিনিধি হইয়া কাজ করিতে দাও। তুমি তোমার ইচ্ছা মতো জীবন যাপন করিবে এবং আমি তোমার হইয়া প্রার্থনা করিব। তবে সাবধান; তুমি কথা দাও, এখন হইতে তুমি কেবল ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়াই থাকিবে।"

ভবিষ্যৎ ফলাফল কি তাহা না বুঝিয়াই গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের কথায় সায় দিলেন। গিরিশচন্দ্রের জীবন তাঁহার নিজের ইচ্ছার বশীভূত রহিল না, তাহা তাঁহার অন্তরতর শক্তিসমূহের অধীন হইল। তাহা যেন ঝড়ের পাতা; তাহা যেন বিড়াল-ছানা, তাহার মা তাহাকে রাজার বিছানা হইতে আঁস্তাকুড়ে যথা-ইচ্ছা-তথা বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।[১] গিরিশচন্দ্রকে বিনা প্রতিবাদে এই শর্ত গ্রহণ করিতে হইল।—এবং ইহা সহজ ছিল না। গিরিশচন্দ্র আনুগত্য সহকারে যুঝিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি একদিন বলিয়া বসিলেন:

"হ্যাঁ, আমি ইহা করিব।"

রামকৃষ্ণ কঠোর ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কি বলিতেছ? কিছু করিবার বা না করিবার ইচ্ছা তো তোমার আর নাই। মনে থাকে যেন—আমি তোমার প্রতিনিধি। তোমার অন্তরে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই তোমাকে সকল কাজ করিতে হইবে; আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু তুমি যদি তোমার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করো তবে আমার প্রার্থনায় কোনো ফল হইবে না।"

গিরিশচন্দ্র হার মানিলেন। ফলে, কিছুদিন এই সংযম ও শৃঙ্খলা অভ্যাস করিবার পর তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তার নিকট আত্মসমর্পণের অধিকারী হইলেন।

তবে গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যকার এবং অভিনেতার পেশা পরিত্যাগ করিলেন

১ 'মার্জারীর ন্যায়', ভক্তিশাস্ত্রে ইহা একটি প্রাচীন প্রচলিত উপমা। বিড়াল তাহার ছানাকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গিয়া রাখে। অথচ বিড়াল ছানা কিছুই জানিতে পারে না। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি সম্প্রদায় মোক্ষের রূপটিকে অনুরূপ ভাবেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, মোক্ষ ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। (পল ম্যাসন উর্সেন কৃত *Sketch of the History of Indian Philosophy* দ্রষ্টব্য)।

না। রামকৃষ্ণও তাহা কখনো চাহিলেন না। তৎপরিবর্তে গিরিশচন্দ্র উক্ত পেশাকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তিনি বাংলা রংগমঞ্চে সর্বপ্রথম মেয়েদের অভিনয়ের সুযোগ দিয়াছিলেন। এবার তিনি হতভাগিনী পতিতাদের উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া আনিলেন। তিনি তাহাদিগকে পরে রামকৃষ্ণের আশ্রমেও লইয়া যান। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রাণ শিষ্যে পরিণত হন। তিনি রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ সংসারী শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের যথেচ্ছ উক্তি এবং তিক্ত রসিকতা সত্ত্বেও, রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর আশ্রমবাসী শিষ্যরা তাঁহাকে সম্মান শ্রদ্ধা করিতেন।

মৃত্যুকালে গিরিশচন্দ্র বলেন:

"বস্তুর মূঢ়তা একটি ভয়ংকর আবরণ। ঐ আবরণ আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত করো, রামকৃষ্ণ!"[১]

রামকৃষ্ণের ধর্মানুভূতি ছিল তাঁহার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মতো, এবং তাহা অন্যান্য সকলের অপেক্ষা তাঁহার মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল অনেক বেশী। তাই যাত্রীদের, যাঁহাদের মধ্যে ভগবান সুপ্ত ছিলেন, যাঁহারা ভগবানের বীজ বপনের জন্য পূর্ব হইতে সুনির্দিষ্ট হইয়াছিলেন, রামকৃষ্ণের এই ধর্মানুভূতি তাঁহাদিগকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। একটি মাত্র চাহনি, একটি মাত্র দেহভংগী ওই সুপ্ত ভগবানকে জাগাইয়া তুলিতে যথেষ্ট ছিল। তাঁহার শিষ্যরা প্রায় সকলেই প্রথম সাক্ষাতেই, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, তাঁহাদের অন্তরতম সত্তার স্পন্দনগুলিকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিত। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেন। অন্যান্য লোকে তাঁহাদের নিজেদের মুক্তির সন্ধান করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের সত্যকার শিষ্য যাঁহারা, তাঁহাদিগকে নেতৃত্ব করিতে হয়, তাঁহাদিগকে অন্যান্য আত্মার দায়িত্ব লইতে হয়। এই কারণেই, আমি পূর্বেই বলিয়াছি, রামকৃষ্ণ শিষ্যরূপে কাহাকেও গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার দৈহিক[২] ও মানসিক পরীক্ষা লইতেন এবং আশ্রম প্রবেশের পর তাঁহাকে সর্বদা সস্নেহে সতর্ক সংযমের মধ্যে রাখিতেন।

১ এখানেও আমি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিবরণীর অনুসরণ করিতেছি। (দুঃখের বিষয়, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বইখানি কল্পনায় এবং তথ্যের বিকৃতিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।—ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশের মন্তব্য।—অনুঃ)

২ নিখুঁত স্বাস্থ্য সম্পর্কে রামকৃষ্ণ সর্বদা সচেতন ছিলেন। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ,

শিষ্যরা "অল্পবয়স্ক", অনেক সময় অত্যন্ত অল্পবয়স্ক কিশোর[১] এবং অবিবাহিত "বাসনা ও ঐশ্বর্যে অনাবদ্ধ, বন্ধনমুক্ত…" হইলেই তিনি অধিক পছন্দ করিতেন। শিষ্যরা ব্রহ্মানন্দের স্থায় বিবাহিত হইলে, তিনি তাঁহাদের স্ত্রীদিগকেও পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন এবং স্ত্রী তাঁহার তরুণ স্বামীর আদর্শে প্রতিবন্ধক না হইয়া সাহায্য করিবেন কি না বুঝিয়া লইতেন। এই অশিক্ষিত মানুষটির শিষ্যরা সাধারণত সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলে সংস্কৃত ছাড়া একটি বিদেশী ভাষাও জানিতেন। কিন্তু ইহা অপরিহার্য কিছুই ছিল না। লাটুর কথা উল্লেখযোগ্য। অবশ্য উহাকে বলা যাইতে পারে, নিয়মকে প্রমাণ করার ব্যতিক্রম মাত্র। বিহারী, বাংলায় প্রবাসী, অশিক্ষিত, দরিদ্র ভৃত্য লাটু, রামকৃষ্ণের একটি মাত্র চাহনিতেই চিরন্তন শাশ্বত জীবন সম্পর্কে সচেতন সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, রামকৃষ্ণের মতোই তাহার অন্তরেও নিজের অজ্ঞাতে প্রচণ্ড শক্তি বিরাজ করিতেছিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেন, "আমাদের অনেককেই ভগবানের তীরে উপনীত হইবার পূর্বে কর্দমাক্ত জল ভাঙিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কিন্তু লাটু ছিল বীর হনুমানের মতো, সে এক লাফে পার হইয়া গেল।"

রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদিগকে কি শিক্ষা দিতেন? বিশেষত, তাঁহার কালে ভারতবর্ষে তাঁহার শিক্ষাদানের ধারাটি কিরূপ মৌলিক ছিল, সে বিষয়ে বিবেকানন্দ জোর দিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার এই শিক্ষার কতিপয় মূলনীতি নূতন ইউরোপীয় শিক্ষার কয়েকটিতেও গৃহীত এবং সুব্যবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে গুরুর কথাই ছিল আইন। পিতামাতার প্রতি ছেলেরা যে-ভক্তি শ্রদ্ধা না করিত, তাহাও গুরুরা তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিতেন। রামকৃষ্ণ সেরূপ কিছুই করিলেন না। তিনি নিজেকে তাঁহার তরুণ শিষ্যদের সমপর্যায়ে নামাইয়া আনিলেন। তিনি হইয়া উঠিলেন তাঁহাদের বন্ধু, তাঁহাদের ভাই। তিনি তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতেন, আলাপের মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠত্বের কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিত না। তিনি তাঁহাদিগকে যে উপদেশ-পরামর্শ দিতেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব ছিল না। তাহা তাঁহার মুখ দিয়া মায়ের নিকট হইতে আসিত। "তাতে

তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণের দেহ মল্লযোদ্ধাসুলভ দৃঢ়, দীর্ঘ এবং বিস্তৃত ছিল। তাঁহাদের দৈহিক শক্তিও ছিল অসাধারণ। রামকৃষ্ণ গভীর ধ্যান-যোগ সাধনের অনুমতি দেওয়ার পূর্বে সতর্কতার সহিত জিহ্বা, বক্ষ এবং বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিতেন, একথা পুনরায় উল্লেখ করিতেছি।

১ তুরীয়ানন্দের বয়স তখন চৌদ্দ এবং সুবোধানন্দের বয়স সতেরো ছিল।

আমার কি ?" তাহা ছাড়া, শব্দ তো শিক্ষা নহে, তাহা শিক্ষার সহায়ক মাত্র। "যোগাযোগ সাধনের" মধ্যেই রহিয়াছে শিক্ষা, কোনো মতবাদের প্রয়োগ বা প্রচারের মধ্যে নহে।[১] কিন্তু কিসের সহিত যোগাযোগ ঘটাইতে হইবে? মানুষের আত্মার সহিত। কেবল মানুষের আত্মার সহিতই নহে, বরং তাহার অপেক্ষা অধিক কিছুর, পরমাত্মার সহিত। কিম্বা আমরা উহাকে বলিতে পারি, "আধ্যাত্মিকতা রূপ সজীব সমৃদ্ধি-স্বচ্ছলতার অন্তর্মুখী অবস্থা। সুনিপুণ মালী যেরূপে ফুল ফুটাইবার জন্য রৌদ্র ও ছায়ার ব্যবস্থা করে, এই যোগাযোগও সেই ভাবেই করিতে হইবে। তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখা ফুটন্ত কুঁড়িগুলি যাহাতে ফুটিয়া উঠিতে এবং আধ্যাত্মিকতার সুগন্ধে ভরিয়া উঠিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার অধিক কিছুই নহে। বাকীটুকু তাহাদের ভিতর হইতেই আসিবে।" ফুল যখন সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে, তখন মৌমাছিরা মধু "সংগ্রহ করিবার জন্য আসে। চরিত্র রূপ ফুলকে স্বাভাবিকভাবেই ফুটিতে দাও।"

সুতরাং ইহা হইতেই বুঝা যায়, মহাসূর্য এবং এই সকল মানব গুল্মের মধ্যবর্তী স্থানে নিজেকে আনিয়া রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের বিকাশের পথে যাহাতে প্রতিবন্ধক না হইয়া উঠেন, সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। অন্যান্য মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এবং প্রীতি এতোই গভীর ছিল যে, পাছে তাঁহাকে অধিক ভালোবাসিবার ফলে তাহারা তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়ে, সেবিষয়েও তাঁহার আশংকা ছিল। তাঁহার প্রতি তাঁহার শিষ্যদের স্নেহ-মমতা অধিক হইবার ফলে তাঁহারা যে তাঁহার নিকট বাঁধা পড়েন, তাহাও তিনি চাহিতেন না।

"মৌমাছিকে তোমার মনের মধু খাইতে দাও।" কিন্তু তাহারা যেন তোমার মনের সৌন্দর্যে বাঁধা না পড়ে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিও।

শিষ্যদের উপর তাঁহার নিজের ভাব ও আদর্শ চাপাইয়া দিবার কথা তো আরো কম আসে। কোনো প্রতিষ্ঠিত মতবাদ থাকিতেই পাইবে না। এ বিষয়ে আমি ইতিপূর্বেই তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়াছি।

১ "মতবাদ লইয়া মাথা ঘামাইও না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সত্তার যে সারবস্তু রহিয়াছে, তাহাকেই ধরিতে হইবে ; উহাই আধ্যাত্মিকতা। উহাকে অবশ্যই লাভ করিতে হইবে।"

বিবেকানন্দের মতে, রামকৃষ্ণের শিক্ষার মূলনীতি ছিল : "প্রথমে চরিত্র গঠন করো, মানসিক বল অর্জন করো, পরে ফল আপনা হইতেই মিলিবে।" '*My Master*' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

"মাগো, আমার মুখে কোনো ধর্মমতের ব্যাখ্যা দিও না। অনুষ্ঠানের কথা আরো কম দিও।"

"অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার দ্বারা ভগবানকে জয় করা যায় না।" করিতে হইবে কেবল ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার দ্বারা।

অধিবিদ্যা এবং ধর্মশাস্ত্রের নিষ্ফল আলোচনারও সুযোগ ছিল না।

"আমি তর্ক ভালোবাসি না। ভগবান যুক্তির উর্ধ্বে। আমি দেখি, যাহাই রহিয়াছে, তাহাই ভগবান।...তবে যুক্তিতর্কে লাভ কি? লোকে বাগানে যায়, আম খায়, তারপর আবার চলিয়া আসে! বাগানে গিয়া তো আম গাছের পাতা গণে না। তবে? অবতার, পৌত্তলিকতা, এই সব বিবাদবচসা লইয়া সময় নষ্ট করা কেন?"[১]

তবে প্রয়োজন কিসের? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার। প্রথমে পরীক্ষা, তারপর ভগবানে বিশ্বাস। ভাবগত অভিজ্ঞতা লাভের পরে বিশ্বাস, আগে নহে। যদি আগে আসে, তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

অবশ্য, ভগবান যে সমস্ত কিছুতে রহিয়াছেন, তিনি যে সমস্ত কিছু, সুতরাং চোখ মেলিয়া চারিদিকে তাকাইলেই তাঁহার সে দর্শন মিলে, নিজস্ব এই বিশ্বাস রামকৃষ্ণ আগেই পাইয়াছিলেন। ভগবানের সহিত মিলনের এই ব্যাপারটি তাঁহার বেলায় এমন একটি অবিরাম অবিচ্ছিন্ন সুগভীর[২] বাস্তবতা ছিল যে, উহাকে প্রমাণ করিবার কোনো প্রয়োজনীয়তাই তিনি অনুভব করেন নাই। এবং ইহাকে যে কখনো অন্যের উপর চাপানো হইতে পারে, তাহাও তিনি স্বপ্নে কল্পনা করেন

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের বহু স্থলে।

২ ইহা এমন কি দৃষ্টিভ্রমের স্তরে গিয়াও পৌঁছে।

"জানো আমি কি দেখি? আমি সর্বঘটে তাঁহাকেই বিরাজিত দেখি, মানুষ ও অন্যান্য সকল জীবকে আমার কাছে মাংসের পোশাক-পরা ছোটে-ছোটো পুতুল বলিয়া মনে হয়। ভগবান তাহাদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের হাত-পা ও মাথাকে চালিত করেন। একবার আমি ভাবাবেশে দেখিয়াছিলাম, কেবল একটি মাত্র জিনিসই বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর, সকল জীবের, রূপ গ্রহণ করিয়াছে,—একটি মোমের বাড়ি, মোমের বাগান, মোমের মানুষ, গোরু, সবই মোমের—কেবল মোমের।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড।)

"একদিন আমার কাছে প্রকট হইল যে, সকল কিছুই বিশুদ্ধ আত্মা মাত্র। কোশাকুশি, দেবী, মানুষ, জীবজন্তু—সকল কিছুই বিশুদ্ধ আত্মা! আমি পাগলের মতো সকল কিছুর উপরই পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলাম। যাহাই দেখিলাম, তাহারই পূজা করিলাম।..."

নাই। যে কোনো প্রকৃতিস্থ অকপট সন্ধানীই যে আপনা হইতে, এবং কেবল আপনার মধ্য দিয়াই, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে, সে বিষয়ে তিনি অতি বেশী নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ভগবানে পরিপূর্ণ এমনি একটি সত্তার প্রভাব যে কি, তাহাকে পরিমাপ করিতে পারে? স্পষ্টই দেখা যায়, শরৎকালের মধুতে যেমন পাইনের গন্ধ ভরিয়া থাকে, তেমনি তাঁহার প্রশান্ত বিরামহীন দিব্য দৃষ্টির মধ্যেও তাঁহার রক্তমাংস মিশিয়া থাকিত। এবং এইরূপে তাঁহার তরুণ ক্ষুধিত শিষ্যরা, যাঁহারা তাঁহার প্রতিটি অংগভংগী, চালচলন আগ্রহভরে পান করিতেন, তাঁহাদের জিহ্বা হইতে উহা চুয়াইয়া পড়িত। কিন্তু একথা তিনি বিন্দুমাত্রও জানিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা মুক্ত, তাঁহারা স্বাধীন। তিনি বিশ্বাস কারতেন, তাঁহার মধ্য দিয়া কেবল ভগবান তাঁহার সুবাস বিলাইতেছেন। বাতাস বহিলে ফুল যখন আপনার গন্ধ বিলায়, ফুল তখন কাহারও বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কণামাত্র চেষ্টা করে না; কেবল তাহার তাজা গন্ধের ঘ্রাণ লইতে হয়, এই মাত্র।

সুতরাং রামকৃষ্ণের শিক্ষার ইহাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানুষের দেহ, অনুভূতি এবং মানসিক শক্তিকে সততাপূর্ণ, শুদ্ধ, নিষ্কলংক, অক্ষুণ্ণ এবং আদিম মানব আদমের ন্যায় তারুণ্যপূর্ণ রাখিতে হইবে। এবং উহার জন্য সর্বপ্রথমে ব্রহ্মচর্যের নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে।

পাশ্চাত্যের গির্জা-বিরোধীরা সরল অজ্ঞতার সহিত এই নিয়মকে রোমান চার্চের একচেটিয়া বলিয়া দাবী করেন এবং এই নিয়মের বিরুদ্ধে তাঁহারা তাঁহাদের আক্রমণের পুরাতন ভোঁতা তীরগুলি বর্ষণ করিয়া কখনো ক্লান্ত হন না। অথচ এই নিয়ম পৃথিবীর আদিম কাল হইতেই রহিয়াছে। (অবশ্য, সমগ্র পৃথিবী যদি এই নীতিকে কঠোরভাবে গ্রহণ করিত, তবে তাহার অস্তিত্ব অধিক দিন থাকিত না।)

সকল শ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয়বাদী বা শ্রেষ্ঠ ভাববাদীদের অধিকাংশ, বিরাট বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির স্রষ্টার দল, সকলেই স্বতই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দৈহিক ও মানসিক ভাবে যৌন-শক্তির ক্ষয়-নিরোধের ফলেই আত্মার সংহত শক্তির, পুঞ্জীভূত সৃজনী শক্তির, উৎপত্তি সম্ভব হয়। এমন কি, বীঠোফেন, ব্যালজাক এবং ফ্লবেরের[১] মতো যুক্তিবাদী ও দৈহিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও ইহা অনুভব করিয়াছিলেন।

বীঠোফেন একদা দৈহিক বাসনার তাড়নাকে প্রতিরোধ করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, উচ্চতর উদ্দেশ্যের জন্য (ভগবান ও সৃজনশীল শিল্পের জন্য) আমাকে উহা রাখিতে দাও। ভগবানের বাসনায় উন্মত্ত যাঁহারা, তাঁহারা আরো ন্যায্যতর কারণে নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে চান না। তাঁহারা জানেন, গৃহ যদি বাসনায় পূর্ণ এবং পংকিল হইয়া থাকে, তবে তাহাতে ভগবান আসিতে রাজী হইবেন না। (কেবল যৌন-প্রক্রিয়াকেই নহে, যৌন-চিন্তাকেও নিন্দা করা হইয়াছে। যদি যৌনক্ষুধা অন্তরে গোপন থাকে, তবে কেবল যৌন-সংযম অভ্যাসই যথেষ্ট নহে। কারণ, তাহা তো স্বাধীনতা হইবে না। তাহা হইবে দুর্বলতা এবং দৌর্বল্য হইল একটি পাপ)। হিন্দু সন্ন্যাসীদের পক্ষে সংযমের এই নীতি অত্যন্ত কঠোর। রামকৃষ্ণের ন্যায় কোমল, প্রশান্ত, প্রায় নারীসুলভ ব্যক্তি হইতে পুরুষ-কঠিন, উৎসাহী, উদগ্র, নির্বাত-নিষ্কম্প বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকরাই এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখান নাই।

"ভগবানকে পাইতে হইলে পরিপূর্ণ সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। কোনো মানুষ যদি বারো বৎসর কাল সম্পূর্ণরূপে সংযম পালন করে, সে অতিমানবিক শক্তির অধিকারী হয়। তাহার মধ্যে একটি নূতন ইন্দ্রিয় গড়িয়া উঠে, তাহার নাম 'বুদ্ধির ইন্দ্রিয়'। সে সমস্তই জানে, তাহার সমস্তই স্মরণ থাকে। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ অবশ্য প্রয়োজন।[২]

দারিদ্র্য, কৌমার্য, সেন্ট-ফ্রান্সিস-প্রবর্তিত অতীন্দ্রিয় বিবাহ, সকল প্রকার গির্জা এবং শাস্ত্রাদির বিধিনিষেধ নিতান্তই অবান্তর; কারণ, পূর্ব এবং পশ্চিম দেশের সমভাবাপন্ন সকল ব্যক্তিই একই সিদ্ধান্তে ও সাফল্যে উপনীত হইয়াছেন। সাধারণত, মানুষ যখন নিজেকে অন্তরতর জীবনের নিকট উৎসর্গীকৃত করে (ইহার নাম যাহাই হউক, খৃস্ট, শিব, কৃষ্ণ, শিল্প বা দর্শনের বিশুদ্ধ ভাব), তখন "তাহার ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তারের প্রয়োজন ঘটে।"[৩]

১ ফ্লবের বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক।—অনুঃ।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ এবং ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য। রামকৃষ্ণ এই বিষয় লইয়া সরলভাবে আলাপ করিয়াছেন। কোনো মিথ্যা সুরুচির বালাই রাখেন নাই।

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। যাঁহারা (ইঁহাদের সংখ্যাই অধিক) সংসারে থাকেন, এবং সেখানে কাজ করেন, তাঁহাদের নিজেদের কাজ এবং ঐ কাজের পশ্চাতে যে আগ্রহশীল বিচারবুদ্ধি থাকে, তাহার উপরও ঐ একই 'অধিকার' বিস্তার করিতে হইবে। কোনো কাজের নিকট, সে কাজ যতোই মহৎ হউক না কেন, যাহাতে তাঁহারা আত্মবিক্রয় না করেন, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।[১]

"তুমি কাজ এড়াইতে পারো না। কারণ, প্রকৃতি তোমাকে কাজ করিতে বাধ্য করিবে। যদি তাহাই হয়, তবে যেমন ভাবে করা উচিত, সেই ভাবেই সকল কাজ করা উচিত। যদি অনাসক্ত হইয়া কাজ করা যায়, তবে তাহা ভগবানে পৌঁছাইয়া দেয়, সে কাজ ভগবানে পৌঁছিবার পথে পরিণত হয়—যে পথের লক্ষ্য হন ভগবান।"

'অনাসক্তি' অর্থে বিবেকহীনতা, উৎসাহহীনতা বা সৎকর্মের প্রতি প্রীতিহীনতা বোঝায় না। উহা কেবল আসক্তিহীনতা মাত্র।

"অনাসক্ত ভাবে কাজ করা হইল ইহলোকে বা পরলোকে পুরস্কারের আশা বা শাস্তির আশংকা ত্যাগ করিয়া কাজ করা।..."

কিন্তু রামকৃষ্ণের মধ্যে মানসিকতা এতোই প্রবল ছিল যে, দুর্বল মানুষ যে এই আদর্শে ক্বচিৎ কদাচিৎ উপনীত হইতে পারে, তাহাও তিনি জানিতেন।

"অনাসক্ত হইয়া কাজ করা, বিশেষত আজকালকার দিনে, অত্যন্ত কঠিন। তাহা মাত্র বাছাই করা দুই একজন লোকেই পারে।..."

তবে অন্তত:পক্ষে এইরূপ অনাসক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করা সকলেরই কর্তব্য। উৎসাহপূর্ণ উপাসনা এবং বাস্তবিক বদান্যতাই এ বিষয়ে মানুষকে সাহায্য করে।

কিন্তু থামুন। বদান্যতা কথাটি তো দ্ব্যর্থক। বদান্যতা এবং মানবিকতা প্রায়ই একার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। আশ্চর্য যে, রামকৃষ্ণ মানবিকতা সম্পর্কে

১ এমন কি সংশয়বাদী অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কর্মের প্রতি এই অনাসক্তি পাশ্চাত্যের কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং দাম্ভিক খৃস্টান পণ্ডিতদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। হ্যাণ্ডেলের ও গ্লাকের মতো দাম্ভিক মানুষের মধ্যে এবং হাশ এবং মোৎসার্টের মতো অনুভূতিশীল মানবিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে আমি এই অনাসক্তির প্রশংসা করি। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের রচনার ভাগ্য সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এবং র‍্যাসিনের মতো তাঁহারা সৃজনী শক্তির পূর্ণ প্রাবল্যের মধ্যেই তাঁহাদের রচনাগুলিকে বিনষ্ট হইতে দেন। আমি বলিতে পারি, যিনি এইরূপ ঊর্ধ্বলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, তিনি কখনও শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিতে পারেন নাই।

একটি অদ্ভুত অবিশ্বাস পোষণ করিতেন। ডিকেন্স বা মিরাবোর ন্যায় পাশ্চাত্য ব্যংগ-রসিকরাও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। রামকৃষ্ণ উপহাস ও বিদ্রূপের দ্বারা কোনো কোনো 'মানবপ্রেমিকের' ভণ্ডামির মুখোস খুলিয়া ধরেন। অবশ্য উহাতে বহু সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করার আশংকাও ছিল। রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদিগকে একাধিক বার চটকদার মানবপ্রেমের বিরুদ্ধে সাবধান হইতে বলিয়াছেন। মানুষের মনের গোপন গতিবিধি সম্পর্কে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান হইতে তিনি আবিষ্কার করেন, মানব-প্রেমের মতবাদ সংক্রান্ত কার্যকলাপ এবং কথাবার্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মম্ভরিতা, দম্ভ, খ্যাতির লোভ এবং নিছক নিষ্ফল অস্থিরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ব্যস্ততার দ্বারা মানুষ তাহার জীবনের বৈচিত্র্যহীনতাকে বিনষ্ট করিতে চায়। মানুষ যখন গরীবকে একটা পয়সা ছুঁড়িয়া দেয়, তখন সে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রকে সাহায্য করে না, সে কেবল নিজের দুশ্চিন্তার, দুঃস্বপ্নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

মল্লিক মহাশয় যখন রামকৃষ্ণকে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং গরীব-দুঃখীকে সাহায্য-দানের কথা বলিলেন, তাহার জবাবে রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন :

"হাঁা, তবে একটি শর্তে। তোমাকে লোকের ভালো করিবার কাজে নিশ্চয়ই অনাসক্ত (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ) থাকিতে হইবে।"

তিনি যখন ঔপন্যাসিক বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা ('হিন্দু পেট্রিঅট') খবরের কাগজের ম্যানেজার প্রভৃতির মতো সংসারী লোকের সহিত আলাপ করিতেন, তখন তিনি প্রায়ই অভিভূত হইয়া পড়িতেন। যাহাদের মুখ কেবল সৎ কাজের—রাস্তা-নির্মাণ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির তালিকায় ভরিয়া থাকে, তাহাদের ইচ্ছা, তাহাদের আত্মার গভীরতা এবং, সর্বোপরি, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে রামকৃষ্ণের বিন্দুমাত্রও উচ্চ ধারণা ছিল না। সুতরাং সর্বপ্রথমে মানুষকে 'অহম' ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। তাহা না হইলে তাহারা জগতের মংগলের জন্য কোনো কাজই করিতে পারিবে না।

এ বিষয়ে রামকৃষ্ণের মনোভাব স্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য আমি রামকৃষ্ণের জীবিত শিষ্যগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য স্বামী শিবানন্দ এবং রামকৃষ্ণের মতবাদ ও আদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক স্বামী অশোকানন্দকে বহু প্রশ্ন করিয়াছি। তাঁহারাও অতীব সযত্নে সেগুলির উত্তর দিয়াছেন। রামকৃষ্ণের বলিষ্ঠ মানবপ্রেমের প্রমাণের সপক্ষে পূর্বোক্ত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত ছাড়া, কাজের দ্বারা মংগল করা যায়, এই ভাবটি রামকৃষ্ণের বাণীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল,

এমন প্রমাণ তাঁহারা দিতে পারেন নাই। প্রথমত, রামকৃষ্ণ স্বার্থপর মানবপ্রেমের মতোই ব্যক্তিগত মোক্ষের অহংকারকে নিন্দিত করিয়াছিলেন এবং, দ্বিতীয়ত, তিনি প্রত্যেক মানুষের হৃদয়েই করুণার প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আমরা এই কথাগুলি যদি মনে রাখি, তবে (পরিপূর্ণ আনুগত্যের সহিতই বলিতে চাই) পশ্চিম-দেশীয় দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণের মতবাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকিয়া যায়। কারণ, পশ্চিম-দেশীয়রা উদ্দেশ্যের অপেক্ষা কার্যের উপর, এবং ব্যক্তিগত মোক্ষের অপেক্ষা অপরের মংগলের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

তবে আত্মপ্রেমের[১] সহিত বদান্যতার পার্থক্য কি? আমাদের মধ্য হইতে বিনির্গত প্রেমেই হইল বদান্যতা। উহার প্রয়োগ আপনার মধ্যে বা পরিবার, সম্প্রদায় এবং দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। কিন্তু আত্মপ্রেম হইল নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সম্প্রদায়ের প্রতি এবং দেশের প্রতি আসক্তি। সুতরাং, যে-বদান্যতা মানুষকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়,[২] তাহারই সাধনা ও অভ্যাস করিতে হইবে।

রামকৃষ্ণের নিকট বদান্যতা সকল মানুষের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ভালোবাসার অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও কম নহে। কারণ, ভগবান মানুষের রূপেই আবির্ভূত হন।[৩] মানুষের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকে যদি কেহ ভালো না বাসে, তবে সে মানুষকে প্রকৃত ভালোবাসিতে পারে না, সুতরাং তাহাকে সাহায্যও করিতে পারে না। সেই সংগে একথাও সত্য যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ না করিলে কেহ কখনো ভগবানকেও প্রকৃত জানিতে পারে না।[৪]

১ বলাই বাহুল্য, 'আত্মপ্রেম' কথাটি নিজের প্রতি ভালোবাসা এই পুরাতন প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ।

৩ "তুমি ভগবানকে খুঁজিতেছ? বেশ তো, মানুষের মধ্যে তাঁহার সন্ধান করো। ভগবান নিজেকে মানুষের মধ্যে যেমন প্রকট করিয়াছেন, তেমনটি আর কিছুর মধ্যে করেন নাই। ভগবান সর্বভূতে আছেন সত্য। তবে তাঁহার শক্তি অন্যান্য বস্তুতে কম-বেশী প্রকট হইয়াছে। ভগবান মানুষের মধ্যে রূপলাভ করিয়া রক্তমাংসে আপনার শক্তিকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষ ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ।

৪ "মানুষের মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে লাভ করা।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ২য় খণ্ড।

বর্তমানে রামকৃষ্ণের সত্য আদর্শ প্রচারের কাজ যিনি করিতেছেন, সেই রামকৃষ্ণ মঠের প্রধান অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ একটি চিঠিতে আমাকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখেন[১]—যাঁহারা প্যাস্‌ক্যালের[২] রচনা পড়িয়াছেন, কথাগুলির অধ্যাত্মিক অর্থ তাঁহাদের নিকট পরিচিত লাগিবে :

"মানুষের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকে উপলব্ধি করা এবং তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী দুঃখ বেদনা সম্পর্কে চেতনাবোধ থাকা, এই দুই-এর মধ্যে আপনি একটি পার্থক্য কল্পনা করিয়াছেন, মনে হয়। আমার মনে হয়, উহা একই মানসিক অবস্থার দুইটি দিক মাত্র, দুইটি বিভিন্ন মানসিক অবস্থা নহে। মানুষের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, কেবল তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াই মানুষের দুঃখ-বেদনার গভীরতাকে সম্যক্ উপলব্ধি করা সম্ভব। কারণ, তাহা না হইলে মানুষের মানসিক দাসত্বের অবস্থা, তাহার অপূর্ণতার এবং স্বর্গীয় আনন্দের অভাবের অবস্থা, আমাদের বিবেকের নিকট স্পর্শগোচর রূপে কখনো প্রতিভাত হয় না। মানুষের বর্তমান অজ্ঞতা, ও সেই একই অজ্ঞাতজাত দুঃখ-বেদনার মর্মান্তিক পার্থক্যই মানুষের সেবার জন্য আমাদিগকে প্ররোচিত করে। মানুষ নিজের এবং অপরের মধ্যে এই দেবত্বকে উপলব্ধি না করিলে সত্যকার দরদ, সত্যকার প্রেম, সত্যকার সেবা অসম্ভব। এই কারণেই রামকৃষ্ণ চাহিতেন যে, তাঁহার শিষ্যরা আত্মোপলব্ধি করুন। তাহা না হইলে তাঁহারা মানবের সেবায় কখনো আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন না।[৩]

কিন্তু ইতিমধ্যে মানবসমাজ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, পরিত্যক্ত হইয়া মরিতেছে। উহাকে কি বিনা সাহায্যে ফেলিয়া রাখিতে হইবে? নিশ্চয় না। কারণ, রামকৃষ্ণ যাহা করিতে পারেন নাই, বস্তুতপক্ষে যাহা তিনি নিজের কর্মের

---

১ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৭

২ প্যাস্‌কাল—বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক।—অনু:

৩ স্বামী অশোকানন্দ পরে লেখেন: "সাধারণ স্তরের প্রেম ও দরদ হইতেই সেবার জন্ম। কিন্তু ·· আমরা যখন বেদনাপীড়িত মানবসমাজকে বিভিন্নরূপে ভগবান বলিয়া দেখিতে শিখি তখন আমারা দেখি, মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব রহিয়াছে, তাহার চেতনা-বোধই মানুষকে সেবায় নিয়োগ করে এবং এইরূপ সেবাই ভগবানকে উপলব্ধি করিবার বলিষ্ঠ উপায় হইয়া উঠে।" ('প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮) আমি বলিতে চাই, আমার বিশ্বাস, মানুষের দেবত্বের কথা বাদ দিয়া, মানুষ যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কেবল সেই কারণেই মানুষের সেবা করা সুন্দরতর, শুদ্ধতর এবং উচ্চতর। সম্ভবত দেবত্বের কথা সর্বদা চিন্তা করার অপেক্ষা দেবত্বের কথা ভুলিয়া থাকিলেই সহজে দেবতার নিকটবর্তী হওয়া যায়। কারণ, উহার মধ্যে "আসক্তির"—রামকৃষ্ণ যে অর্থে বলিয়াছিলেন—কোনো প্রকার চিহ্ন-ও থাকিবার সুযোগ থাকে না।

সীমার মধ্যে, নিজের জীবনের পরিধির মধ্যে (যে জীবন শেষ হইতে চলিয়াছিল) কখনো করিতে পারিতেন না, তাহা তিনি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য, তাঁহার বাণীর উত্তরাধিকারী বিবেকানন্দের উপর ন্যস্ত করিয়া যান। মানুষের নিষ্কৃতির জন্য মানুষের মধ্য হইতেই এই বিবেকানন্দকে ডাকিয়া আনা রামকৃষ্ণের জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। যেন কতকটা নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উপর সংসারে কাজ করিবার এবং "দুঃখকষ্ট দূর করিবার" ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন।[১]

এবং বিবেকানন্দ এই কাজের মধ্যে একটি সর্বগ্রাসী আবেগ, উৎসাহ ও কর্মশক্তি নিয়োগ করেন। কারণ, তাঁহার প্রকৃতি তাঁহার গুরুদেবের প্রকৃতি হইতে ভিন্নতর ছাঁচে প্রস্তুত ছিল; তিনি দীনদুঃখীর সেবা না করিয়া একটি দিন, একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করিতে পারিতেন না। তিনি রক্তমাংসের মধ্যে যে করুণা অনুভব করিতেন, তাহা দুঃস্বপ্নের মতো কেবলই তাঁহাকে ব্যস্ত করিত। উহা তাঁহাকে কাতর হতাশ করিয়া তুলিত। রামকৃষ্ণের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রশান্তি ছিল, বিবেকানন্দের মধ্যে তাহা ছিল না। শেষ কয়েক বৎসর একটি প্রশান্তির মধ্যে রামকৃষ্ণের আত্মা ভাসিয়া বেড়াইত, সে বৈদেহী আত্মা, ভালোমন্দের অতীতে, পরপারের নির্ভীক লোকে প্রবেশ করিয়াছিল:

পরমাত্মা ভালো এবং মন্দ উভয় সম্পর্কেই সমানভাবে নির্বিকার। উহা প্রদীপের আলোকের ন্যায়। ঐ একই আলোকে তুমি শাস্ত্রপাঠও করিতে পারো, আবার দলিল জালও করিতে পারো। আমরা পৃথিবীতে যে-কোনো পাপ, অমংগল বা দুঃখ-দারিদ্র্য দেখি না কেন, সেগুলি কেবল আমাদের দিক হইতেই পাপ, অমংগল এবং দুঃখ-দারিদ্র্য। পরম-পুরুষ উহার অতীতে, উহার ঊর্ধ্বে রহিয়াছেন। তিনি সূর্যের ন্যায় ভালো এবং মন্দ উভয়কেই আলোকিত করেন।[২] পৃথিবীর বস্তুগুলি যেমন, সেগুলিকে সেই ভাবেই লইতে হইবে। ভগবানের লীলাকে স্পষ্টভাবে বুঝিবার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয় নাই।[৩] বলি, যূপকাষ্ঠ এবং জহ্লাদ, এই

১ ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের সুন্দর কাহিনীটি পরে আছে। ঐ কাহিনীটি প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী শিবানন্দ আমাকে বলিয়াছেন।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ।

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ

তিনটিই যে একই বস্তু, আমি তাহা উপলব্ধি করিয়াছি, দেখিয়াছি।...আহা, কী অপূর্ব সে দেখা।[১]

হ্যাঁ, এই দিব্য দর্শন ছিল সকরুণ সমারোহে পরিপূর্ণ সমুদ্রের মতো। এই সমুদ্রে যে সমস্ত সৃজনশীল সত্তাই মাঝে মাঝে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া নিজেকে সজীব সবল করিয়া লন, তাহা ভালোই। রামকৃষ্ণ তাঁহার স্নেহময় হৃদয়ের তলদেশে যে এই সর্বশক্তিমান সমুদ্রগর্জন এবং লবণাক্ত আস্বাদকে সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, তাহাও ভালো। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে উহা সম্ভব নহে। তাহারা আতংকে উন্মত্ত ও জড়সড় হইয়া পড়ে। তাহাদের দুর্বলতা পরমাত্মার সহিত আত্মার সংগতি ঘটাইবার উপযোগী নহে। তাহাদের জীবন-স্ফুলিংগ যাহাতে নির্বাপিত হইতে না পারে, সেজন্য সচ্চিদানন্দের সমুদ্রের উপর নিয়োজিত অহমের জাদুদণ্ডকে সংরক্ষিত করিয়া রাখিতে হইবে। উহা জলের উপর চিহ্নিত একটি রেখার অধিক না হইতে পারে, কিন্তু উহাকে সরাইয়া লইলে এক নিরবিচ্ছিন্ন মহাসমুদ্র ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।”[২] সুতরাং স্রোতাবর্তের বিরুদ্ধে আশ্রয়রূপে উহাকে রাখিতেই হইবে। ভগবান তাঁহার সন্তানগণের দুর্বল পদক্ষেপে সাহায্যের জন্য উহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাই হউক, উহা ভগবানেরই। যাঁহারা রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, প্রভু, যাঁহারা ‘আমি সেই’ এই ঐক্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন আপনি তাঁহাদের কথাই কহিলেন, কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ঐক্যবিধান করিতে পারেন নাই, যাঁহারা বলিয়াছেন, ‘তুমি আমি নহে, তবু আমি তোমাকে বলিতেছি’ তাঁহাদের কি হইবে, তাঁহাদের জবাবে রামকৃষ্ণ মৃদু হাস্যে বলেন, “তুমি ভগবানকে ‘তুমিই’ বলো কিম্বা ‘আমিই’ বলো তাহাতে কিছুই পার্থক্য ঘটে না। ‘তোমার’ কথাটির মধ্য দিয়া যাঁহারা ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছেন, ভগবানের সহিত তাঁহাদের একটি অতীব সুন্দর সম্পর্ক রহিয়াছে। সে যেন পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত প্রভুর সম্পর্ক। তাঁহাদের উভয়ের বয়স যতোই বাড়ে, মনিব ততোই তাঁহার সংগী ভৃত্যের উপর অধিক নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। কোনো কাজ করিতে হইলে মনিব প্রতি পদেই গুরুতর বিষয়ে ভৃত্যের পরামর্শ লন। তারপর একদিন...মনিব ভৃত্যকে হাত ধরিয়া তাঁহার গদীতে আনিয়া বসাইয়া দেন। ভৃত্য তখন বিব্রত হইয়া পড়ে, বলে, ‘এ আপনি কি করিতেছেন?’ তাহাকে আসনে বসাইয়া রাখিয়া মনিব বলেন, “তুমি এবং আমি এক, বৎস।”[৩]

---

১ রামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ। ২ রামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ।

৩ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৬১ পৃঃ

রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের স্ব স্ব দৃষ্টির দূরত্বের অনুপাতেই তাঁহার চিন্তাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেন। তিনি তো মানবিক সত্তার ভংগুর ভারসাম্যকে বিনা করিতেনই না, বরং সেই ভারসাম্যের উপাদানগুলিকে পরিমাণমতো বাড়াইয় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেন। বিভিন্ন মানুষের মানসিক গঠন অনুসারে তিনি তাঁহার রীতিকে এতো দ্রুত পরিবর্তন করিতেন যে, তাঁহার মতামত অনেক সময় স্বতবিরোধী মনে হইত। তিনি যোগানন্দকে শক্তিবৃদ্ধির উপদেশ দেন :

"ভক্তেরা বোকা হইলে চলিবে না।"

কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহা না জানার জন্য রামকৃষ্ণ তাঁহাকে তীব্র ভৎসনা করেন। কিন্তু আবার নিরঞ্জনানন্দ ছিলেন আক্রমণশীল; তিনি সর্বদাই শত্রুকে বা অপমানকারীকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত থাকিতেন; রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বিনয় এবং তিতিক্ষা অভ্যাস করিতে উপদেশ দেন। অবশ্য 'বীর শ্রেণীর' শিষ্যদিগের মধ্যে কোনো কোনো দুর্বলতাকে তিনি সহ্য করিতেন। কিন্তু ঐ সকল দুর্বলতাকে তিনি কখনো দুর্বলতর শিষ্যদের মধ্যে বরদাস্ত করিতেন না। কারণ, পূর্বোক্ত শ্রেণীর শিষ্যদের পক্ষে দুর্বলতা সকল সময় থাকে না। কি নির্ভুল কৌশলে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়াশীল শক্তিকে গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন।

যে আদর্শে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহিত হয়, তাহার বাহিরে যিনি পরম পুরুষের সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকেন, তাঁহার পক্ষে দৈনন্দিন কার্যাবলীর হাজারো সূক্ষ্ম কলাকৌশলকে বোঝা বা পরিচালনা করা সম্ভব নহে, এমনই আশা করা যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তাঁহার বিপরীতই ছিল সত্য। মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করায় প্রথমেই কুসংস্কার, অত্যুৎসাহ এবং হৃদয় ও মস্তিষ্কের সংকীর্ণতা, যাহা মানুষের দৃষ্টিকে ধাঁধাইয়া দেয়, সেগুলি তিরোহিত হইয়াছিল। এবং তাঁহার স্বাধীন ও অকপট চিন্তার পথে কোনোরূপ প্রতিবন্ধক না থাকায়, তিনি সহজ সরল বুদ্ধির সহিত সকল বস্তুকে, সকল মানুষকে বিচার করিতে পারিতেন। সক্রেতিসীয় ভংগীতে তিনি সকল আলোচনা করিতেন। সেগুলির এক একটি আধুনিক শ্রোতাদের চমকাইয়া দিবে। সেগুলি গ্যালিলিবাসী মানুষটির অপেক্ষা মঁতেনের এবং এরাসমাসের সহিত অধিক সহধর্মী। সেগুলির সানন্দ রসিকতা এবং তির্যক শ্লেষ মানুষকে সজীবতা আনিয়া দিত। বাংলার উষ্ণ আবহাওয়া তরুণদের কাছে সেগুলির আবেদনকে দ্বিগুণ বাড়াইয়া তুলিত, যে-তরুণরা অভিভূত হইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। এখানে আমি সেগুলির

দুইটি দৃষ্টান্ত দিব। হস্তীর গল্প এবং সর্পের গল্প। হস্তীর কাহিনীতে রামকৃষ্ণ হৃদয়গ্রাহী বিদ্রূপের সহিত তাঁহার শিষ্যদিগকে হিংসা এবং সম্পূর্ণ অপ্রতিরোধের দুইটি চরমপন্থা সম্পর্কেই সতর্ক করিয়া দিতেছেন। সর্পের কাহিনীতে তিনি যেন শ্লেষের সহিত নিজের বিবরণী দিয়াছেন। তিনি নীতির প্রতি নির্লিপ্তির এবং কর্মের প্রতি ঔদাসীন্যের বিপদ অনুভব করিয়াছিলেন। ঐ নির্লিপ্তি এবং ঔদাসীন্যের ফলে তাঁহাদের তরুণ মস্তিষ্কে সর্বব্যাপী বিধাতার স্পর্শের সর্দিগর্মী লাগিতে পারে, এমন ভয়ও তাঁহার ছিল। তাই রামকৃষ্ণ বিদ্রূপের সহিত আমাদের মধ্যে এবং আমাদের চতুর্দিকে ভগবানের অস্তিত্বের এবং তাঁহার বিভিন্ন রূপের ও নিয়মের বিভিন্ন স্তরের পরিমাপ করেন।

"একটা গল্প শোন—কোন এক বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, একটি মেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলো। এমন সময়ে একটা রব উঠলো: 'কে কোথায় আছ, পালাও—একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে।' সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু শিষ্যটি পালালো না। সে জানে যে, হাতীও যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব; এই ব'লে দাঁড়িয়ে রইলো। নমস্কার ক'রে স্তবস্তুতি করতে লাগলো। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে, পালাও, পালাও। শিষ্যটি তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটি শুঁড়ে ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে এক ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে রইলো।

এই সংবাদ পেয়ে গুরু এবং অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি হাতী আসছে শুনেও কেন চলে গেলে না?' সে বল্লে, 'গুরুদেব আমায় ব'লে দিছলেন যে নারায়ণই মানুষ জীবজন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সরে যাই নাই।' গুরু তখন বল্লেন, 'বাবা, হাতী নারায়ণ আসছিলেন, তা সত্য; কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করছিলেন। যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।..."

নিম্নে ঠাকুরের সংগে তরুণ বিবেকানন্দের একটি আলাপের সারমর্ম দেওয়া গেল:

সর্প

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কতো কথা বলে! কিন্তু ছাখ, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জীবজন্তু চীৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

নরেন্দ্র—আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(সহাস্যে) না রে অত দূর নয়। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভালো লোকের সংগে মাখামাখি চলে। মন্দ লোকের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন; তা বলে বাঘকে আলিংগন করা চলে না। (সকলের হাস্য) যদি বল বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাব। তার উত্তর—যারা বলছে, পালিয়ে এসো, তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি?"

নরেন্দ্র[১]—মহাশয় যদি দুষ্ট লোকে অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তাহলে কি চুপ ক'রে থাকা উচিত?

শ্রীরামকৃষ্ণ—"এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাতো। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। একদিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালরা, দৌড়ে এসে বল্লে, ঠাকুর মহাশয়! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বললে, বাবা, তা হোক; আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি। এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সংগে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে না আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটি মন্ত্র পড়লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইলো। ব্রহ্মচারী বললে, ওরে! তুই কেন পরের অনিষ্ট ক'রে বেড়াস, আয় তোকে মন্ত্র দেব। এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে। ভগবান লাভ হবে, আর হিংসা-প্রবৃত্তি থাকবে না। এই ব'লে সে সাপকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে আর জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর কি ক'রে সাধনা করবো বলুন। গুরু বললেন, এই মন্ত্র জপ কর, আর কারও হিংসা করিস না। ব্রহ্মচারী যাবার সময় বললে, আমি আবার আসব।"

এই রকম কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে সাপটা আর কামড়াতে আসে না, যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আছে "একজন ভক্ত"—১ম ভাগ, ৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য—অনুঃ

ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে ফেলে দিলে ! সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল আর সে অচেতন হয়ে পড়লো। নড়ে না চড়ে না। রাখালরা মনে করল যে সাপটা মরে গেছে। এই মনে ক'রে তারা সব চলে গেল। অনেক রাতে সাপের চেতনা হল। সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ—নড়বার শক্তি নেই। অনেক দিন পরে যখন অস্থিচর্মসার, তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রাত্রে ও এক একবার চরতে আসত ; ভয়ে দিনের বেলা আসতো না, মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণ ধারণ করতো।

প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথ দিয়ে আবার এলো। এসেই সাপের সন্ধান করলে। রাখালেরা বল্লে ; সে সাপটা মরে গেছে। ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও-কথা বিশ্বাস হোলো না। সে জানে, যে মন্ত্র নিয়েছে তা সাধন না হলে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তার দেওয়া নাম ধরে ডাকতে লাগলো। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলে, তুই কেমন আছিস্ ? সে বললে, আজ্ঞে ভাল আছি। ব্রহ্মচারী বললে, তবে তুই অত রোগা হয়ে গেছিস কেন ? সাপ বললে, ঠাকুর, আপনি আদেশ করেছেন, কারু হিংসা করিস না। তাই পাতাটা ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হয়ে গেছি ! ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কিনা, তাই কারু ওপর রাগ নেই। সে ভুলেই গিছলো যে রাখালেরা মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল ! ব্রহ্মচারী বলল, শুধু না খাওয়ার দরুণ এরূপ অবস্থা হয় না। অবশ্য আরো কারণ আছে, ভেবে ত্থাখ। সাপটার মনে পড়লো যে রাখালেরা আছাড় মেরেছিল। তখন সে বললে, ঠাকুর, মনে পড়েছে বটে ; রাখালরা একদিন আছাড় মেরেছিল, তারা অজ্ঞান, জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা ; আমি যে কাউকে কামড়াবো না, বা কারো কোনরূপ অনিষ্ট করবো না, তারা কেমন ক'রে জানবে ? ব্রহ্মচারী বললে, ছি ! তুই এতো বোকা, আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না ? আমি কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে বারণ করি নাই। ফোঁস ক'রে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন ?

দুষ্টু লোকের কাছে ফোঁস্ করতে হয়। ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই।"[১]

---

১ এই 'হস্তী' এবং 'সর্প' সংক্রান্ত নীতিকথা দুটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ঈষৎ অন্যভাবে সাজানো আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ৩২ পৃষ্ঠা হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।—অনুঃ।

শেষ ব্যবস্থাটির মধ্যে *"Si vis pacem, parabellum"*[১]-এর গন্ধ পাওয়া যাইতেছে বলা চলে। ঐ যুক্তির মধ্যে যে ভুল রহিয়াছে, তাহা বর্তমান কালের মানুষ নিজেদের মূল্যে উদ্‌ঘাটিত করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং ঐ ব্যবস্থাটির নৈতিক বা ব্যবহারিক উৎকর্ষ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিব না। কিন্তু এই কাহিনীকারের বিদ্রূপের মৃদু হাসিটিকে আমি সযত্নে স্মরণ রাখিব। উহা আমাকে লা ফঁতেনের[২] কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিভিন্নমুখী ঝঞ্ঝাবর্তের বেগে তীর হইতে অন্য তীরে বিতাড়িত, ভয়ংকর ভাবে দোলায়মান কর্মের পোতের মধ্যে দুই চরমপন্থার মাঝখানে সহজ বুদ্ধিকে স্থাপিত করিয়া ভারসাম্য বিধানের জন্য রামকৃষ্ণ যে নীতি অবলম্বন করেন তাহাও অবশ্য বিচার্য।

সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, রামকৃষ্ণ গান্ধীজির মতোই কার্যে ও বাক্যে অহিংসাপন্থী ছিলেন। তিনি কেবল মানুষের সম্বন্ধে নহে, সমস্ত জীবের সম্বন্ধেই অহিংসার বাণী বিশেষভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।[৩]

১ যদি শান্তি চাও, তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

২ সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী নীতিগল্পরচয়িতা।

৩ এখানে কয়েকটি কাহিনীর আর একটি সুন্দর গুচ্ছ দেওয়া গেল:

সর্বপ্রথমে সুন্দর নীতিগল্প: 'সর্বভূতে ভগবান' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ।)

"এক মঠের সন্ন্যাসী রোজ ভিখ করতে যেতেন। একদিন এক সন্ন্যাসী ভিখ করতে গিয়ে দেখলেন, এক জমিদার এক গরীব বেচারীকে বেদম প্রহার দিচ্ছে।...তা দেখে সন্ন্যাসী বাধা দিলেন।...জমিদার ভয়ানক রেগে শেষে সন্ন্যাসীর উপরে গিয়েই পড়লো। সন্ন্যাসী মারের চোটে অচৈতন্য হয়ে গেলেন। তারপর আশ্রমবাসী অন্যান্য সন্ন্যাসীরা খবর পেয়ে তাঁকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে এলেন এবং বিছানায় শুইয়ে সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কেউ বাতাস করলেন, কেউ বা মুখে একটু দুধ দিলেন। সন্ন্যাসীর যখন চেতনা হোলো, তখন তিনি চোখ মেলে চারিদিকে একবার তাকালেন। সন্ন্যাসী তাঁর গুরুভাইদের চিনতে পারছেন কিনা জানার জন্য একজন তাঁর কানে চীৎকার করে প্রশ্ন করলেন, কে তোমার মুখে দুধ দিচ্ছে বলো তো? অস্পষ্ট গলায় সন্ন্যাসী জবাব দিলেন, তিনি, যিনি আমাকে প্রহার করেছিলেন, তিনিই আমার মুখে দুধ দিচ্ছেন।"...আর একটি ক্ষুদ্র কাহিনী (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ দ্রষ্টব্য)।

"কালী ছোঁড়া মাছ ধরিতে যাইত। প্রভু তাহাকে প্রশ্ন করিলেন: 'তুই এতো নিষ্ঠুর কেন?' কালী জবাব দিল: 'আমি কিছু অন্যায় করিতেছি না। আমরা সবাই জানি, আত্মা অমর, তাই আমি মাছগুলোকে সত্যি সত্যি হত্যা করি না।' প্রভু বলিলেন, 'বাছা, তুমি নিজেকে ঠকাইতেছ। যে মানুষ নিজের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছে, সে কখনো অন্যের প্রতি নিষ্ঠুর হইতে পারে না। ইহা অসম্ভব, সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে নিষ্ঠুর হইবার কথা ভাবিতেও পারে না।...'" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসংগ, ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, ২০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—রামকৃষ্ণ নিজে এমন একটি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন তিনি পূজার জন্য ফুল তুলিতেও চাহিতেন না।)

কিন্তু রামকৃষ্ণ গান্ধীর অপেক্ষা অধিক রসিক। গান্ধীজির অপেক্ষা তাঁহার প্রতিভাও ছিল অধিক সর্বতোমুখী। রামকৃষ্ণ কখনো কোনো নিয়ম বাঁধিয়া দিতে চাহিতেন না; তিনি এক নিমিষেই যে-কোনো বস্তুর উভয় দিক দেখিয়া লইতেন। ফলে, এই "মায়ার" জগতে এই পরমাত্মার আকুল প্রেমিকটি সকল প্রশ্ন সমাধানের একটি সুচারু বুদ্ধির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি মার মতোই শূন্য গর্ভে আত্মার ঘুড়িগুলিকে ছুঁড়িয়া দিলেও ঠিক সময় না হইলে তিনি সর্বদাই সেগুলিকে সহজ বুদ্ধির সুতা ধরিয়া মাটিতে টানিয়া নামাইতেন।

তাহারা যাহাতে পৃথিবীকে শিক্ষা দিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতেই রাখিতেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহাদের নিজেদের শিক্ষালাভের প্রয়োজন ছিল। তাঁহাদের নিজেদের স্বভাব সম্পর্কে, তাঁহাদের পরিপার্শ্বের সকলের স্বভাব সম্পর্কে এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যস্থিত দিব্য সারবস্তুর সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভের প্রয়োজন ছিল। তাঁহাদের অধিকাংশই ক্রমাগত ও দীর্ঘ পরিশ্রমের দ্বারাই এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; কারণ, এই জ্ঞান তাঁহাদিগকে স্ব স্ব চেষ্টায় অর্জন করিতে হইত। অবশ্য, প্রয়োজন হইলে গুরুর সাহায্যও তাঁহারা লইতে পারিতেন; কিন্তু নিজেদের ইচ্ছার স্থলে গুরুর ইচ্ছাকে কখনো স্থাপন করা চলিত না। গুরু কেবল তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব পন্থা আবিষ্কারের কাজে সাহায্য করিতেন মাত্র।

প্রাথমিক স্তরগুলিতে শিষ্যরা তাঁহাদের স্ব স্ব পরিণতি নিজেরাই গড়িয়া তুলিতেন। ঐ সময় দুই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্ন রামকৃষ্ণ তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তিকে

অবশেষে, নিম্নলিখিত হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যটি,—স্বামী সারদানন্দ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন: "একদিন (১৮৮৪ সালে) রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছিলেন। সর্বজীবে দয়া ঐ মূলতত্ত্বগুলির অন্যতম। 'এই সমগ্র বিশ্বই কৃষ্ণের। একথা তোমরা গভীরভাবে আত্মা দিয়া অনুভব করো এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি সদয় হও।' 'সমস্ত প্রাণীর প্রতি', রামকৃষ্ণ কথাগুলি পুনরায় উচ্চারণ করিলেন এবং সমাধিস্থ হইলেন। পরে আত্মস্থ হইয়া অস্ফুট-কণ্ঠে বলিলেন: "সর্বজীবে দয়া।...তোদের কি লজ্জা নাই রে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট? ভগবানের জীবকে দয়া দেখাইবি কেমন করিয়া! দয়া দেখাইতে তুইই বা কে? না! না! দয়া অসম্ভব। তাহারা যেন শিব, এইভাবে তাহাদের সেবা কর।"

"অতঃপর নরেন (বিবেকানন্দ) অন্যান্য শিষ্যদের সহিত বাহিরে যাইবার সময় এই কথাগুলির গভীর অর্থ কি তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলেন। এ পর্যন্ত তাঁহারা কথাগুলি আবছা বুঝিয়াছিলেন মাত্র। নরেন সেবার মতবাদের দৃষ্টিতে এই কথাগুলির ব্যাখ্যা করেন। সেবার মধ্যেই মংগল কার্যের সহিত ভগবানের উর্ধ্বতর প্রেমের মিলন হইয়াছে।"

পরিবর্তন বা সংশোধন করিবার জন্য হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিতেন।[১] তিনি তাঁহার অন্তরতর সূর্যালোকে তাঁহাদিগকে কেবল পুষ্ট করিয়া তুলিতেন মাত্র। এবং এইরূপে তাঁহাদের শক্তিকে দশগুণ বৃদ্ধি করিতেন। সাধারণত, শিষ্যরা যখন

১ সর্বদা না হইলেও সাধারণত তিনি এরূপ করিতে অস্বীকার করিতেন। (তিনি বিবেকানন্দকে কিভাবে জয় করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে পাঠ করিব। অবশ্য ঐ সময় ঐ রাজসিক শিকারটিকে করায়ত্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কেবল তাহাই নহে, আমরা পরে দেখিব, বিবেকানন্দ প্রতিরোধও করিতেছিলেন।) কিন্তু যখন রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিতেছিলেন, তখন তিনি কি তাহাতে সর্বদা সফল হইতে পারিতেছিলেন? রামকৃষ্ণ অদ্ভুত অসাধারণ যৌগিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তবে তিনি যৌগিক শক্তির ব্যবহার যথাসাধ্য অল্পই করিতেন। কারণ, অতিপ্রাকৃত কোনো উপায় ব্যবহার করিতে তাঁহার ভালো লাগিত না, এবং অলৌকিক ঘটনারও তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। অলৌকিক ঘটনা অসম্ভব, তিনি একথা ভাবিতেন না। তিনি ভাবিতেন, সেগুলি নিষ্ফল, এমন কি ক্ষতিকরও। খৃস্টের মতো তিনিও আলৌকিক ঘটনার প্রতি বিরূপ ছিলেন। মানসিক পূর্ণতালাভ স্বাভাবিক ভাবেই হওয়া উচিত; সুতরাং তথাকথিত অতিপ্রাকৃত শক্তিকে তিনি মানসিক পরিপূর্ণতা লাভের পথে অন্তরায় ভাবিতেন। কিন্তু সকল সময়ে এই শক্তিকে ব্যবহার না করিবার মতো কি ঐ শক্তির উপর তাঁহার যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল?—তুলসীর (নির্মলানন্দ) সহিত তখনো তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তুলসী দাবায় বসিয়া রামকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, দেখিলেন, একটি লোক টলিতে টলিতে তন্ময় ভাবে চলিয়া গেলেন। এবং তিনি (ইনিই রামকৃষ্ণ) যাইবার সময় তুলসীর দিকে একবার তাকাইয়া গেলেন। তুলসী অনুভব করিলেন, যেন একটি অনুভূতি তাঁহার সর্বাঙ্গে খেলিয়া গেল। তিনি কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো বসিয়া রহিলেন।—তারকের (শিবানন্দ) যখন রামকৃষ্ণের সহিত দেখা হয়, তখন রামকৃষ্ণ ছিলেন নীরব, নিশ্চল। প্রভুর দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার সর্বাংগ কাঁপিতে লাগিল। প্রথম সাক্ষাতের কালে কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) রামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেন এবং তাঁহার সর্বাংগে মুহূর্তেই একটি শক্তির তরংগ খেলিয়া যায়।

অন্যান্য অনেক সময়ে প্রভু ইচ্ছা করিয়াই শিষ্যদের মধ্যে তাঁহাদের অন্তরতর শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতেন মনে হয়। শিষ্যরা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে চেষ্টা করিতেছেন দেখিলে তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তাই তিনি যখন দেখিলেন যে, লাটু (অদ্ভুতানন্দ) ভক্তির প্রাবল্যে নিজেকে নিঃশেষিত করিতেছেন, তখন তাঁহাকে ভক্তির ফল দান করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মার নিকট প্রার্থনা করেন এবং কয়েক দিন বাদে লাটু ধ্যান করিবার সময় সমাধিস্থ হন।—যখন সুবোধ (সুবোধানন্দ) দ্বিতীয়বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি তাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলেন, "জাগো মা, জাগো!" এবং অংগুলি দিয়া তাঁহার জিহ্বার উপর লিখিয়া দেন। সুবোধ অনুভব করেন, যেন একটি জ্যোতির তরংগ তাঁহার অন্তরতম সত্তা হইতে মস্তিষ্কের দিকে উত্থিত হইল। দেব-দেবীদের মূর্তি বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হইয়া অসীমে গিয়া বিলীন হইল; তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় আর রহিল না। কিন্তু পরমুহূর্তেই রামকৃষ্ণ তাঁহাকে জাগাইয়া দিলেন এবং এই আকস্মিক প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখিয়া রামকৃষ্ণ নিজেও বিস্মিত হইলেন।—ঠাকুর গঙ্গাধরের (অখণ্ডানন্দ) হাত ধরিয়া কালীর মন্দিরে লইয়া যান এবং তাঁহাকে বলেন: "জীবন্ত শিব দ্যাখ।" গঙ্গাধর শিব দেখেন।

তাঁহাদের ঊর্ধ্বলোকে উত্তরণের শেষ স্তরগুলিতে গিয়া পৌঁছিতেন, যখন তাঁহারা নিজেদের চেষ্টায় সাহসের সহিত আনন্দলোকের শিখরদেশে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেন, কেবল তখনই রামকৃষ্ণ তাঁহাদের উপর শেষ আলোকপাত করিতে রাজী হইতেন। একটিমাত্র কথা, একটিমাত্র দৃষ্টি, একটিমাত্র স্পর্শ, এইরূপ সামান্যতম কিছুই ছিল

কিন্তু পাঠক যাহাতে কোনো ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন, সে জন্য তাঁহার সাবধান হওয়া প্রয়োজন। শিষ্যদের মধ্যে যে সকল চিন্তা বা কল্পনা পুর্ব হইতে নাই, এমন কোনো চিন্তা বা কল্পনাকে তিনি কখনো তাঁহাদের উপর চাপাইয়া দেন নাই। তিনি সেগুলিকে কেবল জাগাইয়া দিতেন মাত্র। যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল, তাঁহাদিগকে দিব্যদৃষ্টি লাভের চেষ্টায় বিরত থাকিতে তিনি নিজেই প্রথমে উপদেশ দিতেন। বাবুরামকে (প্রেমানন্দ) তিনি খুব ভালোবাসিতেন। তাঁহাকে সমাধি শিখাইবার জন্য প্রেমানন্দ রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মা রামকৃষ্ণকে নিষেধ করিয়া দেন যে, বাবুরাম 'জ্ঞানের' জন্য জন্মিয়াছে, 'ভাব' তাহার জন্য নহে। শরৎচন্দ্র (সারদানন্দ), যিনি একদা রামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিষ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখনো বালক। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি ভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চাও? তুমি যখন ধ্যান করো, তখন কি দৃশ্য দেখ?" শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন, "দৃশ্য দেখিবার জন্য আমার কোনো আগ্রহ নাই। আমি ধ্যান করিবার সময় ভগবানের কোনো বিশেষ মূর্তিকে কল্পনা করি না। আমি কল্পনা করি, তিনি পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে প্রকট রহিয়াছেন।" রামকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু সে তো আধ্যাত্মিকতার শেষ কথা। তুমি প্রথমেই তাহা লাভ করিতে পারো না।" শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন, "আমি তাহার অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও কম লাভ করিতে চাহি না।"

এমন কি অত্যন্ত অনুভূতিশীল ব্যক্তিদের পক্ষেও দৃষ্টিগত উপলব্ধি একটি স্তরমাত্র ছিল, এই স্তর অতিক্রম করিতে হইত। অভেদানন্দ ধ্যানস্থ অবস্থায় দেবদেবীদিগকে দেখিবার পর একদিন সমস্ত মূর্তিগুলিকে একটি জ্যোতির্ময় মূর্তিতে বিলীন হইয়া যাইতে দেখিলেন। তখন রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলেন তিনি আর কখনো ঐ সকল দিব্য দৃশ্য দেখিবেন না, তিনি ঐ স্তর পার হইয়া গিয়াছেন। এবং সত্য সত্য ঐ দিন হইতে অভেদানন্দের এক অসীমের বৈদেহী চেতনা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এবং ঐ চেতনার মধ্য দিয়াই তিনি অবশেষে নিরাকার ব্রহ্মে উপনীত হইয়াছিলেন।—একদা রামকৃষ্ণ শুনিলেন, অপর একব্যক্তি বাবুরামকে প্রভুর নিকট হইতে বিশেষ ক্ষমতাগুলি চাহিয়া লইতে প্ররোচিত করিতেছে। তখন তিনি বাবুরামকে নিকটে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন: "তুই আমার কাছে আর কি চাস্? আমার যা আছে, তা কি তোর নয়? আমি উপলব্ধির দ্বারা যাহা পাইয়াছি, তাহার সবটুকুই যে তোদের! এই নে চাবি, খোল, খুলে সব নে।"

কিন্তু বৈদান্তিক হরিনাথকে (তুরীয়ানন্দ) তিনি বলিয়াছিলেন: "যদি তুমি ভাবো যে, আমার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া ভালোভাবে ভগবানকে পাইবে, তবে যাও। আমার একমাত্র ইচ্ছা যে তুমি এই পার্থিব দুঃখযন্ত্রণা হইতে নিজেকে উপরে উত্থিত করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করো।"

এবং এমনিভাবে রামকৃষ্ণ হাজারো উপায়ে তাঁহার তরুণ শিষ্যদিগকে সত্য ধর্মানুভূতির পথে চালিত করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে সত্যতম, উচ্চতম ব্যক্তির বিকাশের জন্য নিজের প্রভাব প্রয়োগ করিতেন। তাঁহাদিগকে বশীভূত বা দলভুক্ত করিবার কথা তিনি কখনো স্বপ্নেও ভাবেন নাই। "আমার নিকট

যথেষ্ট। তাহাই করুণার বিদ্যুৎধারার ন্যায় কাজ করিত। কিন্তু যে সকল ...
ইতিপূর্বেই উর্ধ্বলোক লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপরে ভিন্ন এই কথা, দৃষ্টি বা স্পর্শ কখনো পতিত হইত না।

কোনো নূতন জ্ঞান উদ্‌ঘাটিত হইত না[১]; তবে যাহা তাঁহারা পূর্বেই

তোমার আত্মসমর্পণ করা উচিত"—একথা তিনি কখনো কাহাকেও বলেন নাই বা নিজের মনেও ভাবেন নাই। এখানেই রামকৃষ্ণের পথপ্রদর্শনের সহিত খৃস্টের পথপ্রদর্শনের একটি প্রধান পার্থক্য রহিয়াছে।

(উপরোক্ত প্রসংগের জন্য "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ" গ্রন্থের বিভিন্নস্থল দ্রষ্টব্য।)

রামকৃষ্ণ তাঁহার পরিপার্শ্বস্থ সকলের উপর কিভাবে ব্যক্তিগত ধর্মের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার অত্যাশ্চর্য দিকটির উপর পশ্চিমদেশীয় পাঠকগণের জন্য আমি জোর দিয়াছি। অবশ্য প্রাচ্যদেশে উহার যে গুরুত্ব রহিয়াছে তাহা আরোপ করি নাই। এ বিষয়ে আমি শরৎচন্দ্রের (সারদানন্দের) মতেরই অনুসারী। "আমাদের আরো চাই: অল্পে আমরা তুষ্ট হইব না। মনে যাহা প্রকট হয়, তাহার তুলনায় চোখে যাহা ধরা পড়ে, তাহা সামান্য মাত্র।"

১ যে সকল শিষ্য এই সকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন—তাঁহাদের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষী এখনো জীবিত আছেন। তাঁহারা বলেন যে, সম্মোহন (hypnotic) শক্তি বাহিরের চেতনা হইতে ইচ্ছাশক্তির উপর কতকগুলি শর্ত আরোপ করিয়া ইচ্ছাশক্তির উপর অত্যাচার করে। এই সম্মোহন শক্তির স্বল্পমাত্র আভাসও উহাতে ছিল না। বরং উহা শক্তিবর্ধক উত্তেজক ঔষধের ন্যায় ছিল। উহার তাড়নায় মানুষ তাহাদের নিজ নিজ আদর্শকে স্পষ্টতর ভাবে দেখিতে পাইত। বর্তমান মঠাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ আমাকে লিখেন যে:

"রামকৃষ্ণ তাঁহার নিজের মানসিক শক্তিকে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাদিগকে উর্ধ্বতম চেতনায় উন্নীত করিতে পারিতেন। তিনি উহা হয় তাঁহার চিন্তা নয় তাঁহার স্পর্শ দিয়া সম্পন্ন করিতেন। আমাদের অনেকেই আমাদের স্ব স্ব ক্ষমতা অনুসারে আধ্যাত্মিক চেতনায় উর্ধ্বতর স্তরে নীত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। উহা যেমন সম্মোহিত অবস্থা ছিল না, তেমনি উহা গভীর নিদ্রাও ছিল না। আমি নিজে তাঁহার স্পর্শ এবং ইচ্ছার সাহায্যে তিনবার এই উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করিবার জন্য এখনো জীবিত আছি।"

ইউরোপের পণ্ডিতরা, যাঁহারা অতীন্দ্রিয় মনঃসমীক্ষার সমস্যা লইয়া ব্যস্ত আছেন, তাঁহাদের এখনো সময় থাকিতে এই সকল জীবিত প্রত্যক্ষদর্শীর সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। আমি পুনরায় বলিতেছি, এই সকল ঘটনা সম্পর্কে আমার কোনো কৌতূহল নাই। তবে এগুলির ব্যক্তিগত সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ না থাকায় আমি এগুলির বিবরণী দেওয়া কর্তব্য মনে করি। বিশ্লেষণবুদ্ধি এবং সাধু বিশ্বাসের যথাসম্ভব প্রতিশ্রুতির প্রাচীর দিয়াই সেগুলি রক্ষিত রহিয়াছে। অনুভূতিজাত শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞান সম্পর্কেই আমার কৌতূহল অধিক। 'যাহা হইয়াছে', তাহার অপেক্ষা 'যাহা হইতেছে', এবং যাহাতে মাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সুযোগ সামর্থ্য রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা যাহা সকলের মধ্যে সর্বদা থাকিতে পারে, তাহাতেই আমি অধিক কৌতূহল অনুভব করি।

জানিয়াছেন, যে জ্ঞানের ভাণ্ডার তাঁহারা ধীরে ধীরে ইতিপূর্বে পূর্ণ করিয়াছেন, কেবল তাহাই চকিতে স্পর্শগোচর এবং জীবন্ত সত্যে পরিণত হইয়া উঠিত। "ঐ সময় তুমি উপলব্ধি করিতে পারো যে, তোমার নিজের আত্মার মতোই সকল কিছুই ভগবানের মধ্যেই বাঁচিয়া আছে। যাহা কিছুই রহিয়াছে, তুমি তাহারই ইচ্ছাশক্তিতে এবং বিবেকবুদ্ধিতে পরিণত হও। তোমার ইচ্ছাশক্তিই বিশ্বের ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হউক।"[১]

এই উপলব্ধি শেষের স্তর। কারণ, এই সাময়িক প্রকাশের পারেই রহিয়াছে চূড়ান্ত উপলব্ধি, পরমাত্মার সহিত পরিপূর্ণ একাত্ম্য, যাহা নির্বিকল্প সমাধিতে লাভ করা যায়। তবে যাঁহারা জীবনে তাঁহাদের স্ব স্ব আদর্শে সফল হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের জন্যই এই অবস্থাটি নির্দিষ্ট ও রক্ষিত থাকে। উহা সর্বশেষ এবং নিষিদ্ধ আনন্দ। কারণ, রামকৃষ্ণের ন্যায় দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্ন এই অবস্থা হইতে আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় না। শিষ্যদের বহু উপরোধ-অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁহাদিগকে এই অবস্থার আস্বাদ দিতে চাহিতেন না। সে অধিকার তাঁহারা এখনো অর্জন করেন নাই। তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন যে, এই সকল "লুণের ছবি" সমুদ্রের প্রথম তরংগের স্পর্শে আসার সংগে সংগে সমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইবে। যিনি অদ্বিতীয় সত্যের সহিত একান্বিত হইতে চান, ফিরিয়া আসিবার টিকিটটি তিনি একান্ত অলৌকিক ভাবেই পাইতে পারেন।

সুতরাং চূড়ান্ত স্তরে যেখানে সমস্ত বাস্তবতার সহিত একান্বিত হওয়া যায়, সেখানে উপনীত হইবার পূর্বের স্তরটিতেই তাঁহার শিষ্যদিগকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।[২] ঠিক বলিতে গেলে, উহা হইল আলোক লাভের স্তর : এই স্তরে উপনীত হইবার উচ্চাশা সকলেই করিতে পারেন। এই স্তরে আমরা স্ব স্ব শক্তিতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, এবং অপরকেও এই স্তরে পৌছিবার জন্য আমরা পথ দেখাইতে পারি।

---

১ ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, ইহার অর্থ হইল আমরা বিশ্বের ইচ্ছাশক্তিকে সস্নেহে মানিয়া চলিব, উহার উপর আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে আরোপ করিব না।

২ "লোকে যেমন গ্রাম হইতে শহরে কাজ করিবার জন্য কলিকাতায় আসে, মানুষও তেমনি কাজ করিবার জন্য পৃথিবীতে আসে।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ।

(প্রভুর জীবদ্দশাতেই স্বামী বিবেকানন্দ নির্বিকল্প 'সমাধিলাভ করেন। এবং তাঁহার অন্যান্য শিষ্যরাও যে করেন নাই, এ কথা বলা যায় না।—ইংরেজী সংস্করণের প্রকাশকের মন্তব্য।)

আমরা, পাশ্চাত্যের মুক্ত মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা, যাহারা যুক্তি এবং ভালোবাসার মধ্য দিয়া প্রাণিজগতের ঐক্য উপলব্ধি করিয়াছি, আমরা ইহা অপেক্ষা আর কি করিয়াছি? আমাদের সকল চেষ্টার অবিরাম উদ্দেশ্য কি উহাই নহে? উহাই কি আমাদের সেই আবেগময় অনুভূতি নহে, যাহা আমাদিগকে অনুপ্রেরণা দেয়? এই গভীর বিশ্বাসের জোরেই কি আমরা বাঁচিয়া থাকি না? ইহার জোরেই কি মানুষে মানুষে যে ঘৃণা ও হিংসার রক্তস্রোত বহিতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র পা না ডুবাইয়াও আমরা চলিতেছি না? ইহাই কি আমাদের একমাত্র কামনা এবং একমাত্র দৃঢ় ধারণা নহে যে, কখনো না কখনো সেই অবস্থা আসিবে, যখন সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির এবং সমস্ত ধর্মের মিলন ঘটিবে? এ দিক হইতে কি আমরা, যদিও অজ্ঞাতে, সকলেই রামকৃষ্ণের শিষ্য নহি?

১০

প্রিয় শিষ্য নরেন

এই, উপরতলাকার ভারতীয় শিষ্যরা সকলেই যে পরবর্তীকালে বিশ্বাস এবং কর্মের দ্বারাই বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা আমি শীঘ্রই দেখাইব। তবে তাঁহাদের মধ্যে একটি মাত্র বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন এবং রামকৃষ্ণ ঐ বিশেষ ব্যক্তিটির বেলায় একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐ যুবক রামকৃষ্ণকে বুঝিবার পূর্বেই রামকৃষ্ণ তাঁহাকে এক নিমিষেই বুঝিয়া ফেলিলেন; তিনি কি এবং কি হইতে পারেন জানিয়া তাঁহাকে মানব জাতির আধ্যাত্মিক নেতা নির্বাচিত করিলেন: এই যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিবেকানন্দ।

রামকৃষ্ণের প্রতিভা অনুভূতি চেতনার দ্বারাই সকল আত্মাকে বুঝিতে পারিত। তাঁহার কাছে সময়ের কোনো ব্যবধান ছিল না। তিনি পলকে ভবিষ্যতের সমগ্র ধারাকে বুঝিতে পারিতেন। তাই তিনি বিবেকানন্দকে চর্মচক্ষে দেখিবার পূর্বেই বিশ্বাস করিলেন যে, ঐ মানুষটির মধ্যে রক্তমাংসে তাঁহার একজন বিরাট শিষ্যের তিনি সন্ধান পাইয়াছেন।

আমি এখানে তাঁহার সুন্দর একটি দিব্য দর্শনের বিবরণ দিব। সাধারণ রীতিতে বা আমাদের মনস্তাত্ত্বিকদের রীতিতে আমি উহার ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিতে যে পারি না, এমন নহে। তবে সে ব্যাখ্যায় বড়ো কিছু একটা আসে যায় না। আমরা জানি, এই প্রবল দিব্য দর্শনগুলি যাহা দেখে, তাহারা সেগুলি গড়িয়া তোলে, সৃষ্টি করে। গভীরতর অর্থে বলা চলে, যাহা এখনো জন্মে নাই, অথচ জন্মের সীমান্তে আসিয়া স্পন্দিত হইতেছে, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারাই তাহার সত্যিকার স্রষ্টা। যে প্রচণ্ড স্রোতধারা বিবেকানন্দের লক্ষণীয় ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, রামকৃষ্ণের দৃষ্টি যদি কঠিন কুঠারের মতো তাহার গতিরোধকারী প্রস্তরকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সরাইয়া তাঁহার আত্মার নদীকে প্রবাহিত হইবার জন্য পথ না দিত, তবে তাহা ভূগর্ভেই হারাইয়া যাইত।

"একদিন সমাধিতে দেখিলাম, আমার মন একটা আলোকিত পথ ধরিয়া কেবলই উপরে চলিতেছে। উহা সত্বর গ্রহনক্ষত্রের জগৎ পার হইয়া ভাবের দুর্বোধ্য জগতে গিয়া প্রবেশ করিল। উহা যতোই ঊর্ধ্ব হইতে আরো ঊর্ধ্বে উঠিতেছিল, আমি কেবলই আমার পথের দুইদিকে ক্রমাগত দেবদেবীর অনুপম মূর্তি দেখিতে পাইতেছিলাম। তারপর মন ঐ স্থানের বহির্দেশে আসিয়া পৌছিল। এখানে

একটি জ্যোতির্মণ্ডল 'পরম' অস্তিত্বের লোক হইতে পারস্পরিক অস্তিত্বের লোককে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ঐ জ্যোতির্মণ্ডল পার হইয়া মন এক অপরূপের দেশে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে দেহগত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। এমন কি দেবদেবীরাও এই প্রশান্ত গম্ভীর লোকে উঁকি দিতে সাহস করেন না, তাঁহারা বহু নিচে স্ব স্ব আসনে বসিয়া থাকেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই আমি দেখিলাম, সেখানে সাতটি ঋষি সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন। হঠাৎ আমার মনে হইল, এই ঋষিরা জ্ঞানে ও শুদ্ধিতে, ত্যাগে ও প্রেমে কেবলমাত্র মানুষকে ছাড়াইয়া যান নাই দেবতাদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাদের শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের মহত্ত্বের কথা ভাবিতেছিলাম, দেখিলাম, ঐ অপৃথকীকৃত আলোকিত স্থানের একটি অংশ ঘনীভূত হইয়া একটি দেবশিশুতে পরিণত হইল। তারপর শিশুটি একজন ঋষির নিকটে গেল এবং তাহার সুন্দর দুই বাহু দিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ আবেষ্টন করিয়া মৃদু কণ্ঠে তাঁহার সহিত কথা কহিয়া সমাধির অবস্থা হইতে তাঁহার মনকে টানিয়া নামাইতে চাহিল। শীঘ্রই ঐ জাদু স্পর্শ ঋষিকে তাঁহার অবচেতন অবস্থা হইতে জাগাইয়া তুলিল। ঋষি তাঁহার অর্ধনিমীলিত চোখের দৃষ্টি এই অপূর্ব শিশুর উপর ন্যস্ত করিলেন। তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল হইতে বোঝা গেল, এই শিশু তাঁহার অতি আদরের। মহানন্দে শিশু তাঁহাকে বলিল: আমি নিচে যাইতেছি, তোমাকেও যাইতে হইবে।" ঋষি নীরব রহিলেন। তবে তাঁহার দৃষ্টির কোমলতা দেখিয়া বোঝা গেল, তিনি সম্মত আছেন। তিনি শিশুর প্রতি চাহিয়া থাকিয়াই পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন। আমি বিস্মিত হইলাম, দেখিলাম, তাঁহার দেহ ও মনের একখণ্ড একটি উজ্জ্বল আলোর আকারে পৃথিবীর দিকে নামিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র আমি চিনিলাম, ইনি সেই ঋষি।"[১]

ঐ শিশু কে ছিলেন রামকৃষ্ণ না বলিলেও আমরা অনুমান করিতে পারি। বস্তুতপক্ষে, তিনি শিষ্যদের কাছে বলিয়াও ছিলেন, ঐ শিশু তিনি নিজেই।[২] রামকৃষ্ণ তাঁহার সমগ্র জীবনে যে 'বাম্বিনো'[৩] ছিলেন, তাঁহার ওষ্ঠাধর যে কেবলই মাতৃস্তন পান করিত, এবং তিনি যে নিজের নিয়তিকে—তাঁহার নিজের সূত্র অনুসারে, ঐ নিয়তি ছিল মানব জাতি পরিচালনায় সৈনাপত্য করিবার জন্য তাঁহার নিজের

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ।

২ সারদানন্দ।

৩ ইতালীয় নবজাগৃতির যুগে মেরী-মাতার বক্ষে শিশুর ছবিগুলিকে 'বাম্বিনো' নামে অভিহিত করা হইত।

অপেক্ষা একটি যোগ্যতর ব্যক্তিকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা—পূর্ণ করিবার জন্য কেবল মুহূর্তের জন্য 'মাতার' বাহুবন্ধনের বাহিরে আসিয়াছিলেন, তাহাও একান্ত সত্য।

তাঁহার বিচারে ত্রুটি ছিল না। একটি সবল দেহ, পৃথিবীকে কর্ষণ করিবার মতো দুইটি বলিষ্ঠ বাহু, পৃথিবী পর্যটনের জন্য দুইটি বলিষ্ঠ পদ, দেহরক্ষী বহু কর্মীর একটি দল, সেই কর্মীর দলকে পরিচালনা কবিবার মতো একটি মস্তিষ্ক এবং সেই সংগে সংগে সমগ্র পৃথিবীর প্রেমে পরিপূর্ণ একটি বিরাট হৃদয়ের প্রয়োজন ছিল। রামকৃষ্ণের বহ্নিমান বিশ্বাস যে-মৃত্তিকা হইতে একদা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহার ভবিষ্যৎদৃষ্টি এবং বাসনার তীব্র শক্তিকেই সপ্রমাণ করে না, সেই সংগে ইহাও প্রমাণ করে যে, বাংলার মৃত্তিকাও প্রস্তুত হইয়া অধীর আগ্রহে তাঁহার আহ্বানেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রকৃতির প্রসব-বেদনাই বিবেকানন্দকে ঐ "শতাব্দীর" বক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। মানস-শক্তি মূর্তি পরিগ্রহ করিবার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

একগুঁয়ে, অশান্ত, ঝঞ্ঝা-বিতাড়িত, বাড়ন্তবয়সী এই কিশোরের মধ্যে রামকৃষ্ণ অবিলম্বে ভবিষ্যৎ নেতা এবং তাঁহার বহু-প্রত্যাশিত প্রচারদূতকে দেখিতে পাইলেন। ইহাও রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎগুলির বিবরণ সম্পূর্ণরূপে দেওয়া উচিত। যে দুর্নিবার আকর্ষণ নরেন নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুভব করিয়াছিলেন এবং যে আকর্ষণের ফলে নিজের শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি একদা ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এই বিবরণ হইতে পাঠক তাহা নিজে অনুভব করিতে পারিবেন।

তবে, যখন এই দুরন্ত জ্যোতিষ্ক রামকৃষ্ণের কক্ষে গিয়া বিলীন হইলেন সেই সময়কার এই তরুণ প্রতিভার একটি চিত্র আমরা প্রথমে দিব।[১]

বিবেকানন্দ একটি বিখ্যাত অভিজাত ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

১ বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিষ্যরা হিমালয়স্থ অদ্বৈত আশ্রম হইতে চারি খণ্ডে 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন' নামে যে বৃহৎ জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, আমি বর্তমান বিবরণী প্রসংগে তাহাই ব্যবহার করিতেছি।

সারদানন্দ তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীতে যে সকল বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন, সেগুলি হইতে এবং বিবেকানন্দের মার্কিণ শিষ্যা ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথা হইতে আমি এখানে কিছু কিছু যোগ করিয়াছি। ভগিনী ক্রিস্টিন তাঁহার অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা আমাকে ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন।

তাঁহার সমগ্র জীবনেই এই যুদ্ধপরায়ণ ক্ষত্রিয় জাতির চিহ্ন পাওয়া যায়। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতা অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিতা এবং মহিমান্বিতা নারী ছিলেন। তিনি (বিবেকানন্দের মা) শ্রেষ্ঠ হিন্দু মহাকাব্যগুলির বলিষ্ঠ মানসিকতায় পরিপুষ্ট হন।[১] বিবেকানন্দের পিতা বিলাস-বৈভবের মধ্যে অস্থির জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার স্বাধীন মনোভাব-প্রকৃতির দিক হইতে কতকটা অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী বাবুদের সহধর্মী —কতকটা ভল্‌তেরের অনুরূপ ছিল। তাঁহার ছিল মানুষ সম্পর্কে উদার মনোভাব এবং নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে মৃদু হাস্যময় চেতনা। এই উভয় কারণেই তিনি জাতি-বিচারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। বিবেকানন্দের পিতামহ ছিলেন ধনী এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন; তিনি মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সেই স্ত্রীপুত্রকন্যা, ঐশ্বর্য এবং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া 'অরণ্যবাসী' সন্ন্যাসী হন। সংসারত্যাগের পর তাঁহাকে আর কেহ কখনো দেখে নাই।…

১ বিবেকানন্দের উপর এই মহিলাটির প্রভাব অবিস্মরণীয়। বিবেকানন্দ শৈশবে দুরন্ত ছিলেন. তাঁহাকে মানুষ করা কঠিন। তিনি মাকে অনেক কষ্ট দেন। তাহা হইলেও মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বিবেকানন্দ তাঁহার মার প্রতি একটি সুকোমল শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের শেষাশেষি আমেরিকায় প্রকাশ্যভাবে তিনি তাঁহার মাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। বিবেকানন্দ তাঁহার ভারতীয় নারীজাতি সংক্রান্ত বক্তৃতায় প্রায়ই তাঁহার মার উল্লেখ করিতেন এবং তাঁহার আত্মসংযম, ধর্মভীরুতা, চরিত্রবল প্রভৃতির প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনা দিতেন। বিবেকানন্দ বলেন, "আমার মা আমার জীবন ও কর্মের অবিরাম প্রেরণা ছিলেন।"

ভগিনী ক্রিস্টিনের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা হইতে আমরা বিবেকানন্দের পিতামাতার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য জানিতে পারি। ভগিনী ক্রিস্টিন সেগুলি আমেরিকায় বিবেকানন্দের সহিত ব্যক্তিগত আলাপের সময় সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ তাঁহার মাতার নিকট হইতে তাঁহার রাজসিক ভাবভঙ্গী, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি, তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং তাঁহার নৈতিক বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতার নিকট হইতে তিনি তাঁহার বিচারবুদ্ধি, তাঁহার শিল্পচেতনা এবং তাঁহার করুণার দিকগুলি লাভ করেন। বিবেকানন্দের পিতা ছিলেন সেই যুগের মানুষ, যখন ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদের (positivism) বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল। ফলে, তিনি ধর্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন। তিনি ধর্মকে কুসংস্কার মাত্ররূপে দেখেন। হাফিজের কবিতা এবং বাইবেলকে শিল্প হিসাবে তিনি প্রশংসা করিতেন। তিনি বিবেকানন্দকে নিউ টেস্টামেণ্ট এবং ওল্ড টেস্টামেণ্ট দেখাইয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিয়াছিলেন, "যদি কোথাও কোনো ধর্ম থাকে, তবে তাহা এখানেই রহিয়াছে।" কিন্তু তিনি আত্মার বা পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহার উদারতা ও দানশীলতা প্রায় অমিতাচারিতার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল। তিনি একটি সহাস্য ইহলৌকিক সংশয়বাদেই অভ্যস্ত ছিলেন।

নবজাগৃতির যুগের[১] শিল্পী রাজপুত্রদের মতোই বিবেকানন্দের শৈশব এবং কৈশোর কাটিয়াছিল। তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন এবং সেই গুণগুলিকে তিনি অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা বর্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহে সিংহের সৌন্দর্য এবং মৃগের চাঞ্চল্য ছিল। তাঁহার দেহের গঠন ছিল মল্লযোদ্ধার মতো। সাহসেরও অভাব ছিল না। দৈহিক ব্যায়ামে তাঁহার তুলনা মেলা ভার ছিল। তিনি মুষ্টিযুদ্ধ করিতে, সাঁতার কাটিতে, এবং বাইচ খেলিতে জানিতেন। ঘোড়ায় চড়ারও তাঁহার দুরন্ত সখ ছিল। তিনি তরুণদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি হাল ফ্যাসানের রুচির বিচার করিতেন। সংকীর্তনে সুন্দর নাচিতে পারিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল মধুর; এই কণ্ঠস্বর পরে একদা রামকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বহু বিখ্যাত হিন্দু এবং মুসলমান ওস্তাদের নিকট তিনি কণ্ঠ এবং যন্ত্রসংগীত চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া শিখিয়াছিলেন। তিনি স্বরলিপি রচনা করিতেন; ভারতীয় সংগীতের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে একটি প্রামাণিক প্রবন্ধও প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, বিবেকানন্দ সর্বত্র সংগীতের প্রমাণ্য বিচারক হিসাবে পরিগণিত হইতেন। তাঁহার নিকট সর্বদা সংগীত ছিল মন্দির-প্রবেশের[২] তোরণ, এবং 'উর্ধ্ব-তমের' প্রাসাদে প্রবেশের পথ। কলেজে তিনি তাঁহার বিস্ময়কর বুদ্ধিবৃত্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কি বিজ্ঞান, কি জ্যোতির্বিদ্যা, কি অংকশাস্ত্র, কি দর্শন, কি ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য ভাষা, সর্ববিষয়েই তাঁহার উৎসাহ ছিল সমান। তিনি সংস্কৃত এবং ইংরেজি ভাষায় বহু কাব্য পাঠ করেন। গ্রীন এবং গিবনের ঐতিহাসিক রচনাগুলি তিনি আগ্রহভরে গ্রাস করেন। ফরাসী বিপ্লব এবং নাপলেঁওর কাহিনী তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। অন্যান্য বহু ভারতীয় শিশুর ন্যায় তিনি ধ্যান করাও অভ্যাস করেন। তিনি রাত্রি জাগিয়া 'ইমিটেশন অব জিসাস ক্রাইস্ট' পুস্তকখানি এবং বেদান্ত পাঠ করেন। যুক্তিতর্ক, সমালোচনা এবং 'বিচার-বিভেদ' করিবার একটি নেশা তাঁহার ছিল। এই কারণেই পরবর্তীকালে তিনি বিবেকানন্দ নাম অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি গ্রীক সৌন্দর্যের সহিত ভারত-জার্মান চিন্তার একটি সামগ্রিক সংগতিপূর্ণ মিলন ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্ববাদ সকল প্রকার জীবনের উপরই আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য বিস্তারের দিক হইতে

১ অর্থাৎ ইতালীয় নবজাগৃতির যুগে।

দেবী সরস্বতীর মন্দির।

লেওনার্দো[১] এবং আলবের্টির[২] স্তরে গিয়া পৌছিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, ঐ বিশ্ববাদের উপর ধর্মভীরু আত্মা এবং পূর্ণ বিশুদ্ধির একটি মুকুটও পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই তরুণ, জীবনের সকল প্রকার লোভনীয় বস্তু এবং আমোদ-প্রমোদের সুযোগ পাইয়াও, তাঁহার স্বাধীনতা এবং আবেগময়তা সত্ত্বেও, নিজের উপর কঠোর কৌমার্যের ব্রত আরোপ করেন। কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ে যোগদান না করিয়াও, কোনো ধর্মমতে বিশ্বাসী না হইয়াও তিনি অনুভব করিতেন যে, (কেন অনুভব করিতেন, তাহার গভীর যুক্তিগুলি আমি পরে দেখাইব), দেহের এবং আত্মার বিশুদ্ধি একপ্রকার আধ্যাত্মিক শক্তি—যে আধ্যাত্মিক শক্তির বহ্নি জীবনের সকল দিকে প্রবিষ্ট হয়, এবং স্বল্পমাত্র অশুদ্ধিতেই নির্বাপিত হইয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, একটি সুবৃহৎ নিয়তির ছায়াও তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য তিনি জানিতেন না কি এই নিয়তি, কি তাহার লক্ষ্য। তথাপি তিনি সেই নিয়তির উপযুক্ত হইতে, তাহাকে উপলব্ধি করিতে, কার্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

তিনি বহু শক্তির অধিকারী হওয়ায়, তাঁহার মধ্যে কোনো স্থায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত বহু বৎসর তাঁহার মধ্যস্থিত বিরুদ্ধ বাসনাগুলি তাঁহার আত্মাকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। সতের বৎসর হইতে একুশ বৎসর বয়স (১৮৮০ হইতে ১৮৮৪র শেষ) পর্যন্ত বিবেকানন্দ পর পর কয়েকটি মানসিক সংকটের সম্মুখীন হন। একটি ধর্মগত সুনিশ্চয়তা এই সংকটগুলির অবসান না ঘটানো পর্যন্ত সেগুলি ক্রমশই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে।

তিনি স্টুয়ার্ট মিল রচিত 'এসেজ্ অন রিলিজন' (Essays on Religion) গ্রন্থ পাঠ করেন। তাহাব ফলে তিনি ফ্যাশনের ব্রাহ্মসমাজী মহলে যে ভাসাভাসা ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রকৃতির মধ্যে অশুভকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন। [আলব্রেখ্ত ডিউরের-এর[৩] মতো] তিনি ক্রমাগত একঘেয়ে আশাভংগ এবং পুরাতন বিষণ্ণতার[৪] আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন।

১ লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)—ইতালির বিখ্যাত চিত্রকর ও ভাস্কর।—অনু:

২ লেঅন বাত্তিস্তা আলবের্টি—(১৪০৪-১৪৭২) ইতালির বিখ্যাত স্থপতি, চিত্রকর, কবি, দার্শনিক এবং সাংগীতিক।—অনু:

৩ আলব্রেখ্ত্ ডিউরের—জার্মান চিত্রকর ও খোদাইকর (১৪৭১-১৫২৮)।—অনু:

৪ আলব্রেখ্ত্ ডিউরের-রচিত একটি খোদাইচিত্র 'বিষণ্ণতা'র কথা বলা হইতেছে; এই ছবিতে

হাবার্ট স্পেন্সারের সহিত তাঁহার পত্রালাপ চলিত। হাবার্ট স্পেন্সারের থিওরি-গুলিকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি ব্যর্থ হইলেন।[১] তিনি তাঁহার কলেজের প্রবীণ ছাত্রদিগকে, বিশেষত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে, এবিষয়ে প্রশ্ন করিতেন।[২] তাঁহার এই সকল সংশয়ের কথা তিনি ব্রজেন্দ্রনাথকে বলিলেন এবং সত্যের সন্ধানে প্রকৃত পথের নিশানা চাহিলেন। বিবেকানন্দ যে শেলীর রচনা পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বহ্নিমান আত্মাকে শেলীর প্রকৃতি-বহির্ভূত-নিরীশ্বরবাদের (Pantheism) দিব্য তরংগে স্নাত করাইয়াছিলেন, সেজন্য তিনি এই ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নিকটই ঋণী ছিলেন।[৩] অতঃপর বিবেকানন্দের ঐ তরুণ উপদেষ্টা তাঁহাকে 'যুক্তির ভগবানের'—পরব্রহ্মের—সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করেন। পরব্রহ্মের এই ধারণাটি ব্রজেন্দ্রনাথের নিজস্ব ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের যুক্তিবাদের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। উহা দাবী করে, উহার মধ্যে বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ,

একটি আশাহত দেবদূত বিজ্ঞানের বিশৃংখলতার মধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহার বিষণ্ণতার ভাবটি কিন্তু অসাধারণ; তাহার মধ্যে ব্যর্থ আধ্যাত্মিক সন্ধানে ক্লান্ত, বিরক্ত, বিষণ্ণ একটি আত্মার ইংগিত রহিয়াছে।

১ এরূপ কথিত আছে, বিবেকানন্দের দুঃসাহসিক সমালোচনা পাঠ করিয়া স্পেন্সার বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বিবেকানন্দের মধ্যে দার্শনিক বুদ্ধিবৃত্তির এই অকালবিকাশের প্রশংসা করেন। সারদানন্দের মতে, নরেন ১৮৮১ খৃস্টাব্দে তাঁহার প্রথম পরীক্ষার সময় হইতে ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে পরীক্ষার সময় পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করেন। ঐ পরীক্ষাটি আমাদের 'লাইসেন্সিয়এট' ডিগ্রীর অনুরূপ। ঐ সময়ে বিবেকানন্দ, দেকার্তে, হিউম, কাণ্ট, ফিট্‌কে, স্পিনোৎসা, হেগেল, শোপেনহাউএর, অগিউস্ত কোঁৎ ও ডারউইন পাঠ করেন। তবে আমার মনে হয়, তিনি ঐ সকল লেখককে তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিত সাধারণ প্রবন্ধে অগভীরভাবে পাঠ করেন, তাঁহাদের আসল লেখাগুলি পাঠ করেন নাই। বিবেকানন্দ কিছুদিন চিকিৎসাশাস্ত্রও পাঠ করেন। ঐ সময় তিনি মস্তিষ্কের আংগিক গঠন এবং স্নায়ুমণ্ডলী সম্পর্কে পড়াশুনা করেন। "পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণী এবং বৈজ্ঞানিক রীতি তাঁহাকে জয় করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই তিনি ঐ রীতিকে হিন্দুধর্মের চিন্তাগুলিকে পাঠ করিবার কালেও সেগুলিতে প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন।" (সারদানন্দ)

২ এই বিখ্যাত মনীষী বর্তমানে [এই গ্রন্থরচনার সময়—অনুঃ] মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও শাস্ত্রবেত্তা। তিনি ১৯০৭ সালে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় লিখিত একটি প্রবন্ধে তরুণ বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁহার স্মৃতি হইতে বহু বিবরণ দিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধটি পরে 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন' (The life of the Swami Vivekananda) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৭২-১৭৭ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত হইয়াছে। কলেজে তিনি বিবেকানন্দের অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীতে পড়িলেও বিবেকানন্দ তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বড়ো ছিলেন।

৩ তিনি ওআর্ডস্বার্থ-ও পাঠ করেন। সমস্ত ইংরেজ কবিদের মধ্যে ওআর্ডস্বার্থকেই সুদূর প্রাচ্যের কবিদের সহধর্মী মনে হয়।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক পর ভাব, এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর ত্রিবাণী সংমিশ্রিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন যে, ব্যষ্টিবাদের নীতি 'অশুভ' এবং বিশ্বব্যাপী যুক্তিই 'শুভ'। সুতরাং ইহা একান্ত আবশ্যক যে, বিশুদ্ধ যুক্তিকে প্রকাশ করিতে হইবে। ইহা আধুনিক কালের একটি বৃহৎ সমস্যা। ব্রজেন্দ্রনাথ বিপ্লবের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক অনিবার্য যুক্তিবাদ বিবেকানন্দের উদ্ধত প্রকৃতির কয়েকটি দিককে অভিভূত করিয়াছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্বকে ঐ সংকীর্ণতার মধ্যে রুদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল না। বুদ্ধির দিক হইতে বিবেকানন্দ নিশ্চয় বিশ্বগত যুক্তির কর্তৃত্বকে গ্রহণ করিতে (অথবা ন্যস্ত করিতে) এবং ব্যষ্টিবাদের অপরিহার্য অস্বীকারকে সকল নীতির ভিত্তিতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ তাহাতে সাড়া দিল না। পৃথিবীর সৌন্দর্যে এবং তাহার আবেগময়তায় বিবেকানন্দ অতি বেশী মত্ত ছিলেন। উহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা ছিল যেন কোনো হিংস্র প্রাণীকে নিরামিশাষী বানাইয়া দেওয়া। বিবেকানন্দের বেদনা এবং বিষণ্ণতা দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। তাঁহাকে সর্বব্যাপী যুক্তিকে, একটি রক্তহীন বিধাতাকে, খাদ্যরূপে দিতে চাওয়া পরিহাস ভিন্ন আর কি! বিবেকানন্দ ছিলেন সত্যকার হিন্দু; সুতরাং তাঁহার নিকট প্রাণ, সত্যের সারবস্তু না হইলেও, সত্যের প্রধান গুণ ছিল। তাই বিবেকানন্দের প্রয়োজন ছিল ভগবানের একটি জীবন্ত প্রকাশে, বিধাতা-নির্মিত একটি মানুষে, গুরুতে,—যিনি বলিতে পারিবেন, আমি ভগবানকে দেখিয়াছি, আমি ভগবানকে স্পর্শ করিয়াছি, আমি ভগবানের সহিত একান্বিত হইয়াছি। তথাপি বিবেকানন্দের বুদ্ধিবৃত্তি পাশ্চাত্য চিন্তায় পরিপুষ্ট হইবার ফলে এবং একটি সমালোচনী মনোভাব পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার ফলে, তিনি তাঁহার হৃদয় এবং অনুভূতির দাবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন। এই বিদ্রোহ আমরা রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে লক্ষ্য করিব।

তাঁহার সমসাময়িক সকল তরুণ মনীষীদের মতোই তিনিও কেশবচন্দ্রের অনাবিল আলোকের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের দর্শন তখন সর্বোচ্চে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। নরেন উহাকে ঈর্ষা করিতেন। নরেন কেশবচন্দ্র হইবার উচ্চাশা পোষণ করিতেও পারিতেন। কেশবচন্দ্রের নববিধানের প্রতি তরুণ বিবেকানন্দের সহানুভূতি থাকাই ছিল স্বাভাবিক, তাই তিনি নববিধানে

যোগদান করিলেন। নূতন ব্রাহ্মসমাজের সদস্যের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিল।[১] রামকৃষ্ণ মিশন বলিয়া আসিতেছেন যে, সনাতনী হিন্দুধর্মের এমন কি সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় সংস্কারগুলির পরিপন্থী যে সকল চূড়ান্ত সংস্কার ব্রাহ্মসমাজ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেগুলির সহিত বিবেকানন্দের মনের যোগ সম্পূর্ণ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে চাই না। তরুণ নরেনের দায়িত্বহীন চরিত্র সামগ্রিক ধ্বংসের মধ্যে একটি আনন্দের সন্ধান পাইতে পারিত। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্বংসের জন্য তাঁহার নূতন বন্ধুদিগকে তিরস্কার করিবার মতো লোক তখন তিনি ছিলেন না। কেবল পরবর্তীকালে, বহু পরিমাণে রামকৃষ্ণের প্রভাবের ফলেই, তিনি হিন্দুধর্মের প্রাচীন বিশ্বাস এবং আচার-ব্যবহারকে, সেগুলি দীর্ঘ ঐতিহ্যের অনুসারী এবং জাতীয় জীবনের গভীরে বদ্ধমূল হইলে, শ্রদ্ধা করিতে এবং সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।[২] কিন্তু আমার বিশ্বাস, উহা বিনা সংগ্রামে ঘটে নাই। গোড়ার দিকে বুদ্ধিবাদী বিবেকানন্দ যে রামকৃষ্ণের নিকট হইতে পিছাইয়া গিয়াছিলেন, উহাই সেজন্য অংশত দায়ী। যাহাই হউক, জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষা ও সংহতির জন্য বাংলাদেশে তরুণ ব্রাহ্মরা যে আন্দোলন করিতেছিলেন, বিবেকানন্দ তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃস্টান মিশনারিদের অপেক্ষা অধিক তিক্তভাবে সনাতনী হিন্দুদিগকে আক্রমণ করেন। এই সকল অত্যুৎসাহী মূঢ় সমালোচকদের নির্বোধ সংকীর্ণতাকে বিবেকানন্দের স্বাধীন ও সজীব বুদ্ধি যে সত্বর উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং তাঁহার মানসিক শক্তি ও সেই সংগে জাতি দর্প যে তাহাতে আহত অপমানিত বোধ করিবে, ইহাই ছিল শেষ পরিণতি। পশ্চিমী জ্ঞানের বদ্‌হজমের কাছে

১ তিনি বিবেকানন্দ আখ্যা পাইবার বহুকাল পর পর্যন্তও তাঁহার নাম ঐ তালিকাভুক্ত ছিল। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বলেন, ঐ নাম তিনি কখনো তালিকা হইতে প্রত্যাহার করেন নাই। পরবর্তী কালে যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়: "আপনি কি ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিতেছেন?" তাহার জবাবে তিনি বলেন, "মোটেই না।" তিনি ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুধর্মের উন্নত রূপ বলিয়া মনে করিতেন। (স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, প্রথম খণ্ড, ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে লিখিত ৩৮তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

২ তাঁহার শক্তি পরিপক্ক হইবার পর তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তাঁহার নিজের বাণী সত্যকার হিন্দু চিন্তার অস্বীকার নহে,—তাহার পূর্ণতা। তিনি চূড়ান্ত সংস্কারের পক্ষে ছিলেন। তবে তিনি চাহিতেন যে, সেই সংস্কারগুলি রক্ষণশীল রীতিতেই হউক। (পূর্বোক্ত পুস্তক দ্রষ্টব্য।)

এগুলি বস্তুত কেশবচন্দ্রেরই কথা: "হিন্দু রক্ষণশীলতাকে উদার মনোভাবের মধ্য দিয়া প্রচার করা।" (ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, ১৮৮৪ দ্রষ্টব্য।)

ভারতীয় বিদ্যাবুদ্ধির এই আত্মসমর্পণে সাহায্য করিতে বিবেকানন্দ রাজী হইলেন না।[১] অবশ্য তাহা সত্ত্বেও, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভা-সমিতিগুলিতে যোগ দিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার মন অশান্ত হইয়া উঠে।

অতঃপর বিবকানন্দ নিজের উপর একটি কৃচ্ছ্র জীবন আরোপ করেন। তিনি অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরে বাস করিতে থাকেন। মেঝেতে মেলা বিছানার উপর সর্বত্র বইপত্র ছড়ানো থাকে। মাঝে মাঝে তিনি মেঝেতে চা করিয়া খান; দিবারাত্রি পড়েন, আর চিন্তা করেন। তাঁহার মাথায় দংশনের ন্যায় তীব্র যন্ত্রণা হইতে থাকে। তথাপি তিনি তাঁহার স্বভাবস্থ বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে কোনোপ্রকার মীমাংসা ঘটাইতে পারেন না। তাঁহার এই সংগ্রাম এমন কি তাঁহার নিদ্রাতেও চলিতে থাকে।

"তিনি বলেন, আমার যৌবন হইতে প্রতি রাত্রেই আমি ঘুমাইলে দুটি স্বপ্ন আকার ধারণ করে। একটিতে আমি নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান, সম্পদ, শক্তি ও গৌরবের অধিকারীদের অংশভাগী দেখি; তখন আমি অনুভব করি, এ সমস্তই লাভ করিবার শক্তি আমার মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমি দেখি, আমি সংসারের সব কিছুই ত্যাগ করিতেছি; পরিধানে আমার জীর্ণ কন্থা, হস্তে ভিক্ষাপাত্র; বৃক্ষতলে আমার শয়ন; আমি ভাবিতেছি, প্রাচীনকালের ঋষিদের মতো এই জীবন যাপন করিতে আমি সমর্থ। এই দুইটি চিত্রের দ্বিতীয়টিই জয়ী হইত। আমি অনুভব করিতাম, কেবল ঐরূপেই মানুষ পরম আনন্দ লাভ করিতে পারে। ...এবং এই পরমানন্দের পূর্বাস্বাদের মধ্যেই আমি ঘুমাইয়া পড়িতাম।...এবং আমি প্রতি রাত্রেই এই স্বপ্ন নূতন করিয়া দেখিতাম।..."[২]

যিনি তাঁহার পরবর্তী সমগ্র জীবনে অধিনায়ক হইয়াছিলেন, সেই রামকৃষ্ণের সহিত বিবেকানন্দ যখন সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন তাঁহার অবস্থা এইরূপ ছিল। যে মহানগরীতে ভারত ও ইউরোপের মিলন ঘটিয়াছিল, সেখানে তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম-মনীষীদের সহিত একে একে সাক্ষাৎ করেন।[৩] কিন্তু সর্বত্র তিনি অতৃপ্তভাবে ফিরিয়া

১ ইহা হইতে বোঝা যায়, ব্রাহ্মসমাজ যে চূড়ান্ত সংস্কারের মতবাদ পোষণ করিতেছিলেন, তাহার প্রতি বিবেকানন্দের পূর্ণ সমর্থন ছিল না।—ইংরেজী সংস্করণের প্রকাশকের টীকা।

২ সারদানন্দ লিখিত রামকৃষ্ণের জীবনীর (দিব্য ভাব) শেষ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৩ কথিত আছে, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিতই শেষ চেষ্টা করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বিপুল শক্তিকে স্বীকার করিয়াছিলেন।

আসেন। তিনি ব্যর্থসন্ধান করিতে থাকেন, আস্বাদ করেন, পরিত্যাগ করেন। দিশাহারা বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান।…

*

তাঁহার বয়স তখন আঠারো; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ১৮৮০ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার অন্যতম বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে (সুরেন্দ্রনাথ একজন ধনী মদ্যবিক্রেতা; তিনি ভারতীয় খৃস্টানধর্মে দীক্ষিত হন) একটি ছোটখাটো উৎসবে বিবেকানন্দ একটি সুন্দর কীর্তন গান। এখানেই সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণের 'শ্যেনদৃষ্টি' বিবেকানন্দের অতৃপ্ত আত্মার গভীরতাকে ভেদ করিয়া দেখে এবং তাহার উপর আপনাকে নিবদ্ধ করে।[১] যুবক বিবেকানন্দ একদল বখাটে বন্ধুর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে কি ঘটিতেছিল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ বা কর্ণপাত না করিয়াই তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজের চিন্তায় তন্ময় ছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এবার তাঁহাকে গান গাহিতে বলা হইলে তিনি গান গাহিলেন। গানটির মধ্যে এমন একটি করুণ সুর ছিল যে গানের উৎসাহী ভক্ত রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইলেন। এবার আমি নরেনকে নিজের কথা বলিবার সুযোগ দিব :

"আমার গান শেষ হইলে অকস্মাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমার হাত ধরিয়া আমাকে উত্তরের বারান্দায় লইয়া গেলেন, আমাদের পেছনে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমাদের নিকট আর তৃতীয় ব্যক্তি কেহ রহিল না।…আমাদিগকে কেহ দেখিতেও পাইতেছিল না।…আমি বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া কাঁদিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া, আমার সহিত যেন তাঁহার কতো কালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে এমনি ভাবে, গভীর স্নেহের সহিত বলিলেন, 'আঃ! তুই এতো দেরী ক'রে এলি! তুই এতো নির্দয় হ'য়ে আমাকে এতোদিন বসিয়ে রাখ্‌লি কেন? এদের সমস্ত আজেবাজে কথা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হ'য়ে গেলো। ওরে! আমার মনের কথা আর কারো, কোনো যোগ্য লোকের, বুকে ঢেলে দেওয়ার জন্যে যে আমি আকুল হ'য়ে আছি!…' 'ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি কথাগুলি বলিতে লাগিলেন। তারপর আমার

১ রামকৃষ্ণ পরে বলেন : "আমি তাহার মধ্যে দেহের প্রতি কোনো প্রকার মনোযোগিতা কোনো দম্ভ বা বহির্বস্তুর প্রতি কোনো আকর্ষণ দেখি নাই। আর তাহার চোখ দুটি! মনে হয়, যেন কোন শক্তি তাহার অন্তরাত্মাকে বশ করিয়াছে।…আমি ভাবিলাম : এই লোক কেমন করিয়া কলিকাতায় বাস করিয়া আছে?…"

সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, 'প্রভু! আমি জানি, তুমি সেই নারায়ণের অবতার প্রাচীন ঋষি নর, মানুষের দুঃখ ঘুচাতে আবার পৃথিবীতে এসেছ।'[১] আমি বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, এ আমি কী দেখিতে আসিয়াছি! আমি কি উন্মাদ! আমি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে! কি দুঃসাহস এই লোকটার, যে আমাকে এইভাবে কথা বলে? কিন্তু বাহিরে আমি কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলাম না, তাঁহাকে কথা বলিতে দিলাম। তিনি আবার আমার হাত হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন: "কথা দে, তুই আবার আমায় দেখতে আসবি, একলা, শিগ্‌গীর…।"

এই অদ্ভুত আতিথ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নরেন কথা দিলেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন, তিনি কখনো আর এমুখো হইবেন না। অতঃপর তাঁহারা বসিবার ঘরে আসিলেন। সেখানে সকলের সংগে দেখা হইল। নরেন ফাঁকে গিয়া বসিলেন ও দূর হইতে রামকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার কথা বা কাজের মধ্যে অদ্ভুত কিছু দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, কেবল একটি অন্তরতম যুক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই যুক্তি নরেন অনুভব করিলেন। উহা পরিপূর্ণ ত্যাগ এবং বিস্ময়কর সারল্যে ভরা একটি প্রগাঢ় জীবনের ফসল মাত্র। বিবেকানন্দ শুনিলেন, রামকৃষ্ণ বলিতেছেন (কথাগুলি বিবেকানন্দের নৈশ সংগ্রামের জবাব মাত্র):

"ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। আমি যেমন তোমাদের দেখছি, তোমাদের সংগে কথা কইছি, তেমনি ভগবানকেও দেখা যায়, তেমনি ভগবানের সংগেও কথা কওয়া যায়। কিন্তু তা করতে কে বা কষ্ট ক'রে বলো? মানুষ স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বিষয়-সম্পত্তির জন্যে কাঁদবে। কিন্তু ভগবানকে ভালোবেসে কাঁদে কে বলো? কিন্তু কেউ যদি সত্যি 'তাঁর' জন্যে কাঁদে তবে তিনি তাকে দেখা দেবেনই।"[২]

---

১ সুতরাং এই প্রলাপের প্রথম কথাগুলিতেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জন্য সমাজ সেবার কর্তব্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন—যে সেবায় বিবেকানন্দ তাঁহার জীবন উৎসর্গ করেন এবং অন্যান্য ভারতীয় ঋষিগণ হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া তুলেন।

২ বিবেকানন্দ তাঁহার 'আমার গুরুদেব' (My Master) শীর্ষক বক্তৃতায় ('স্বামী বিবেকানন্দের জীবন' প্রথম খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য) যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বিবেকানন্দই নিজে রামকৃষ্ণের সহিত কথা বলেন এবং তিনি যে-প্রশ্ন বিভিন্ন সাধকদের একে একে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা রামকৃষ্ণকেও জিজ্ঞাসা করেন: "আপনি কি ভগবানকে দেখিয়াছেন?" জবাবে রামকৃষ্ণ বলেন, "হ্যাঁ, বাছা, দেখেছি। এই যেমন তোমায় দেখছি, ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁকে দেখেছি। তবে সে দেখায় মধ্যে অনেক বেশী তীব্রতা ছিল। তাঁকে আমি তোমাকেও দেখাতে পারি।"

সম্ভবতঃ এই সংলাপটি পরে, তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরে ঘটিয়াছিল।

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল, যিনি এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তাঁহার নিকট সেগুলি অর্থহীন প্রলাপমাত্র ছিল না। সেগুলির সত্যকে তিনি নিজে সপ্রমাণ করিয়া দেখিয়াছেন। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে নরেন যাহা দেখিয়াছেন, তাহার সহিত তিনি তাঁহার সম্মুখস্থ এই সরল প্রশান্ত ঋষির চিত্রটিকে যেন খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন: "লোকটি পাগল, কিন্তু সাধারণ লোক নন। পাগল হলেও, শ্রদ্ধার যোগ্য।" বিবেকানন্দ বিভ্রান্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিলেন। ঐ সময় কেহ যদি তাঁহাকে প্রশ্ন করিত, রামকৃষ্ণের সহিত সম্পর্ক কিরূপ হইবে, তাহা হইলে তখন তিনি নিঃসন্দেহে জবাব দিতেন, যথাপূর্ব।

কিন্তু এই 'দৃশ্যটি' তাঁহার উপর কাজ করিতে লাগিল।

এক মাস বাদে তিনি পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

"আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি একটি ছোট বিছানায় একাকী বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া বিছানার এক পাশে বসাইলেন। কিন্তু এক মুহূর্ত বাদে দেখিলাম, তিনি আবেগে কম্পিত হইতেছেন। তাঁহার দুই চোখ আমার উপর নিবদ্ধ। তিনি নিরুদ্ধ নিশ্বাসে অস্ফুট কণ্ঠে কথা কহিতে কহিতে আমার আরো কাছে সরিয়া আসিলেন। ভাবিলাম, আগের বারের মতোই পাগলামিপূর্ণ কোনো মন্তব্য করিবেন বুঝি। কিন্তু আমি কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি আমার দেহের উপর তাঁহার ডান পা রাখিয়া দিলেন। কী ভয়ংকর সে স্পর্শ! আমি চক্ষু চাহিয়াই দেখিলাম, ঘরের দেওয়াল এবং মধ্যকার সমস্ত বস্তু আবর্তিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে শূন্যে মিলাইয়া গেল।...সেই সংগে সমস্ত বিশ্ব এবং আমার ব্যক্তিত্ব, সব কিছু এক নামহীন শূন্যতায় প্রায় নিঃশেষে হারাইয়া গেল। ঐ শূন্যতা যেন, যাহা কিছুরই অস্তিত্ব আছে, সে সব কিছুকেই গ্রাস করিতেছে। আমি ভীত হইলাম, মনে হইল, আমি মৃত্যুর মুখামুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। চীৎকার করিয়া উঠিলাম: 'আপনি কি করছেন? বাড়ীতে আমার বাপমা আছেন যে!...' এবার তিনি হাসিয়া উঠিয়া আমার বুকে হাত রাখিয়া বলিলেন: 'ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্ত থাক। ও আসবে, ঠিক সময় মতো আসবে।' তিনি এই কথা বলার সংগে সংগে অদ্ভুত দৃশ্যটি যেন মুহূর্তে সরিয়া গেল। আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। আমার ভিতর ও বাহিরের সমস্ত বস্তু পূর্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইল।"

অনর্থক মন্তব্যে সময় নষ্ট না করিয়া আমি এই বিস্ময়কর বিবরণ লিপিবদ্ধ

করিয়াছি। পশ্চিমদেশীয় পাঠকরা যাহাই ভাবুন, তাঁহারা শেক্‌স্‌পীয়রের আবেগময় স্বপ্নদ্রষ্টাদের কথা স্মরণ করিয়া এই সকল ভারতীয় আত্মার সম্মোহন শক্তিতে অভিভূত না হইয়া পারিবেন না। অবশ্য, এই প্রসংগে একথাও উল্লেখ-যোগ্য যে, এখানে যে দিব্যদ্রষ্টার বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি বিশ্বাসপরায়ণ, দুর্বল বা সমালোচনা শক্তিতে অসমর্থ ছিলেন না। তিনি তাঁহার এই স্বকীয় দিব্যদর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বিপদের অভ্যাস পাইয়া সকল প্রকার সম্মোহন ক্রিয়ার ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠে। তিনি কোনো প্রকার মেস্‌মেরিজমের কবলে পড়িয়াছেন কিনা, নরেন সর্বপ্রথমে নিজেকে এই প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে সেরূপ কোনো লক্ষণ ছিল না। তাঁহার উপর দিয়া যে ঝঞ্ঝাবর্ত বহিয়া গিয়াছিল, তাহার আঘাতে এখনো তিনি কাঁপিতেছিলেন। এবার তিনি সতর্ক হইয়া উঠিলেন। এই প্রচণ্ড বিস্ময়কর ঘটনাটি ছাড়া বাকী সমস্ত সাক্ষাৎকারটুকু স্বাভাবিক ভাবেই কাটিল। রামকৃষ্ণ নরেনের সহিত এমন সরল ও সস্নেহ ঘনিষ্ঠতার সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যেন কিছু ঘটে নাই।

সম্ভবত সপ্তাহখানেক বাদে নরেন যখন তৃতীয়বার সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার সমস্ত বিচারশক্তিকে সজাগ করিয়া তোলেন। ঐদিন রামকৃষ্ণ তাঁহাকে একটি পার্শ্ববর্তী বাগানে লইয়া গেলেন। খানিকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইবার পর তাঁহারা একটি দাবায় গিয়া বসিলেন। অবিলম্বে রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইলেন। নরেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন ; অকস্মাৎ রামকৃষ্ণ তাঁহাকে স্পর্শ করায়, সংগে সংগে বিবেকানন্দের সমস্ত বহিশ্চেতনা বিলুপ্ত হইল। খানিকক্ষণ বাদে যখন তাঁহার সম্বিৎ ফিরিল, তিনি দেখিলেন, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছেন এবং তাঁহার বুকে ধীরে ধীরে আঘাত করিতেছেন।

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলেন :

নরেন যখন ঐ অবস্থায় ছিল, তখন তাহাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে আগে কি ছিল, এখন তাহার কি অবস্থা, পৃথিবীতে ইহজীবনে তাহার কি উদ্দেশ্য, তাহাকে এই সব প্রশ্ন করিলাম। সে গভীরে নিমগ্ন হইল এবং আমার প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিল। আমি যাহা দেখিয়াছি, যাহা ভাবিয়াছি, এই জবাবগুলি তাহারই সমর্থন করিল। কথাগুলি গোপনীয়। কিন্তু আমি জানিতে পারিয়াছি যে, সে একজন সিদ্ধ ঋষি, ধ্যানস্থ হইবার শক্তি তাহার

অসাধারণ। যেদিন সে তাহার সত্যিকার প্রকৃতিকে বুঝিতে পারিবে, সেদিন সে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিবে।[১]

কিন্তু ঐ সময় রামকৃষ্ণ নরেনকে কিছুই বলিলেন না। তবে তিনি তাঁহার এই বিশেষ জ্ঞান অনুসারেই তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে নরেনের একটি বিশেষ স্থান হইল।

কিন্তু নরেন এখনো 'শিষ্য' নাম গ্রহণ করিলেন না। তিনি কাহারও শিষ্য হইতে চান না। তিনি রামকৃষ্ণের দুর্বোধ্য শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি এই শক্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি নিজেও অত্যন্ত কঠোর ধাতুতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার যুক্তি শাসন মানিতে চায় না। কিছুদিন পূর্বে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত তাঁহার সম্পর্কের সময়ে তাঁহার হৃদয় যেমন তাঁহার মস্তিষ্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তেমনি এবার তাঁহার মস্তিষ্ক তাঁহার হৃদয়কে সন্দিগ্ধভাবে দেখিতে লাগিল। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে, এবং তাঁহার নিজের যুক্তির দ্বারা কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত নহে এমন কিছুই রামকৃষ্ণের নিকট হইতে গ্রহণ না করিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন। অন্যান্য সকলে যখন অবিচারে গ্রহণ ও বিশ্বাস করিতেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার ঘৃণা হইত।

এখন এই নবীন শিষ্য এবং প্রবীণ গুরুর মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হইল, তাহার অপেক্ষা অদ্ভুত কোনো সম্পর্ক আর কল্পনা করা যায় না।[২] কান্না বা অন্য যে কোনো মেয়েলি ভাবপ্রবণ ভক্তির রূপকেই নরেন ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। নরেন প্রত্যেকটি জিনিসকে বিচার করিয়া লইতেন। একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি যুক্তিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে দেন নাই। তিনিই একাকী রামকৃষ্ণের কথাগুলিকে যাচাই করিয়া ওজন করিয়া লইতেন। তিনিই একাকী সেগুলিকে সন্দেহ করিতেন। ইহাতে রামকৃষ্ণ কখনো বিস্মিত বা বিরক্ত হইতেন না। বরং সেজন্য তিনি নরেনকে আরো বেশী ভালবাসিতেন। নরেনের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে রামকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিতে শোনা যাইত:

"মাগো, আমি যা দেখেছি, তাকে সন্দেহ করার মতো কাউকে পাঠিয়ে দে, মা।"

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ, ৪৩৯ পৃষ্ঠা এবং পরে।

২ নরেন রামকৃষ্ণের সহিত পাঁচ বৎসর বাস করেন। ঐ সময় কলিকাতাতেও তাঁহার নিজের একটি বাসা ছিল। তিনি সপ্তাহে দুই একবার দক্ষিণেশ্বর যাইতেন এবং মাঝে মাঝে একসংগে চার পাঁচ দিন শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত থাকিতেন। কোনো সপ্তাহে তিনি না আসিলে রামকৃষ্ণ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন।

মা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। নরেন যেমন হিন্দু দেবদেবীকে অস্বীকার করিলেন, তেমনি তিনি অদ্বৈতবাদকেও বাতিল করিয়া দিলেন। অদ্বৈতবাদকে তিনি নাম দিলেন নিরীশ্বরবাদ।[১] তিনি হিন্দুশাস্ত্রের আদেশগুলিকে প্রকাশ্যেই বিদ্রূপ করিলেন। রামকৃষ্ণকে বলিলেন:

"যদি কোটি কোটি লোক আপনাকে ভগবান বলে, আর আমি যদি নিজে তাহার প্রমাণ না পাই, তবে আমি কখনো তাহা বলিব না।"

রামকৃষ্ণ সহাস্যে নরেনকে সমর্থন করিলেন এবং শিষ্যদিগকে বলিলেন, "নিজেরা সব কিছুকে পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

নরেনের তীক্ষ্ম বিচার এবং যুক্তিতর্কে তাঁহার উৎসাহ রামকৃষ্ণকে আনন্দে পূর্ণ করিত। নরেনের উজ্জ্বল অকপট বিচারবুদ্ধি এবং তাঁহার অক্লান্ত সত্য-সন্ধানের প্রতি তিনি একটি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন এবং উহাকে তিনি শৈব শক্তির প্রকাশ বলিয়া ভাবিতেন। বলিতেন, এই শক্তিই অবশেষে সমস্ত মায়াকে পরাভূত করিবে। তিনি বলিতেন:

"দেখ, দেখ, কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ও দৃষ্টি আগুন; ও সমস্ত কিছুরই মালিন্য পুড়িয়ে বিশুদ্ধ ক'রে তুলবে। মহামায়া নিজেও ওর কাছে দশ ফুটের মধ্যে ঘেঁষতে পারবেন না। তিনি ওকে যে মহিমা দিয়েছেন, তার শক্তিই তাঁকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবে।"

নরেনের জ্ঞান দেখিয়া রামকৃষ্ণের আনন্দ এমন তীব্র হইত যে, তিনি মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন।

তবে অনেক সময়ে নরেনের তীক্ষ্ম সমালোচনা যখন অন্যের কথা বিবেচনা না করিয়া কঠোরভাবে প্রযুক্ত হইত, তখন বৃদ্ধ রামকৃষ্ণ আহত হইতেন। নরেন রামকৃষ্ণের মুখের উপরেই বলিতেন:

"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, আপনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা আপনার অসুস্থ মস্তিষ্কের সৃষ্টি, কেবল দৃষ্টিভ্রম, মাত্র নয়?"

রামকৃষ্ণ আহত হইয়া উঠিয়া গিয়া মার কাছে নতজানু হইয়া সান্ত্বনা চাহিলেন। মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

"অপেক্ষা কর্! শীঘ্রই নরেনের চোখ খুলবে।"

১ ব্রাহ্মসমাজ এই মনোভাব পোষণ করিতেন।

নরেন এবং রামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে যখন আলোচনা আর শেষ হইত না, তখন রামকৃষ্ণ ক্লান্ত বিরক্ত হইয়া[১] মার কাছে প্রার্থনা করিতেন :

"নরেনকে তোর মায়া একটু দে মা! তাতে তার বুদ্ধি বিকার কিছুটা কমতে পারবে, তার মন ভগবানকে স্পর্শ করবে।"

কিন্তু বিবেকানন্দের যন্ত্রণাকাতর আত্মা আর্তনাদ করিতে লাগিল।

"আমি তো ভগবান চাই না। আমি চাই শান্তি। অর্থাৎ, পরম সত্যের পরম জ্ঞান, পরম অসীম।"

অবশ্য তিনি লক্ষ্য করিতেন না যে, এইরূপ চাওয়া যুক্তির সীমাকে অতিক্রম করিয়া যায়, হৃদয়ের অযৌক্তিক দাবীকেই প্রকাশ করে। ভগবান সংক্রান্ত প্রমাণ দিয়া তাঁহার মনকে শান্ত করা অসম্ভব ছিল। ভারতীয়দের মতোই তিনিও বলিতেন, "যদি ভগবান সত্য হন, তবে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব হইবে।"

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন যে, যাঁহারা সমাধির সাধনা করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ের তাড়নায় চালিত হন। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে আবিষ্কার করিলেন, বুদ্ধির জগতে তিনি নিজে যতোটুকু অধিকার অর্জন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ইঁহারা অনেক বেশী অধিকার অর্জন করিয়াছেন। তিনি পরে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেন :

"বাহিরে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ ভক্ত। কিন্তু ভিতরে পরিপূর্ণ জ্ঞানী।...আর আমি তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

কিন্তু এই কথা স্বীকার করিবার এবং রামকৃষ্ণের হাতে তাঁহার স্বাধীন বুদ্ধির সদম্ভ স্বাতন্ত্র্যকে তুলিয়া দিবার আগে পর্যন্ত তিনি বারে বারে রামকৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া আসিতেন, আবার বারে বারে তাঁহার নিকট হইতে দূরে ছুটিয়া পলাইতেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটি আবেগময় আকর্ষণ এবং প্রচ্ছন্ন সংগ্রামের খেলা চলিতেছিল। নরেনের নিষ্ঠুর অকাপট্য, যাহা তিনি অবিশ্বাস করিতেন, তাহার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতির অভাব, সকল প্রকার হাতুড়ে বিদ্যার বিরুদ্ধে তাঁহার অক্লান্ত সংগ্রাম, অন্যান্য ব্যক্তির মতামতের প্রতি সদম্ভ

১ রামকৃষ্ণ এই সকল আলোচনা সম্পর্কে বলেন : "শূন্য পাত্রে জল ভরলে ভকভক শব্দ করে। কিন্তু পাত্র পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ শোনা যায় না। ভগবানের যে সন্ধান পায় নি, সে কেবলই সত্তা এবং ভগবানের ইচ্ছা নিয়ে অনর্থক তর্ক করে। কিন্তু ভগবানকে যে দেখেছে, সে নীরবে দিব্য আনন্দ ভোগ করে যায়।"

নির্লিপ্তি, সকল কিছুই তাঁহার শত্রুসংখ্যা এবং দুর্নাম ক্রমেই বাড়াইয়া তুলিল অবশ্য, বিবেকানন্দ তাঁহার অতিরিক্ত দম্ভের ফলে সেগুলির প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য দিলেন না।[১]

রামকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে কখনো নরেনের নিন্দা হইতে দিতেন না। কারণ, নরেন সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। তিনি বলেন, এই ছোকরা নিকষ সোনা দিয়া তৈয়ারী, পৃথিবীর কোন ময়লাই তাহাকে নোংরা করিতে পারিবে না।[২] পাছে এই প্রশংসনীয় বিচারবুদ্ধি বিপথগামী হয়, পাছে তাঁহার মধ্যস্থিত অসংখ্য সংগ্রামশীল শক্তি ঐক্যসাধনের শুভব্রতে নিযুক্ত না হইয়া কোনো দল বা সম্প্রদায় গঠনের মন্দ কাজে ব্যবহৃত হয়, এই ছিল রামকৃষ্ণের একমাত্র ভয়। নরেনকে রামকৃষ্ণ অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। নরেন দীর্ঘকাল তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিলেই রামকৃষ্ণের মধ্যে যে সস্নেহ উদ্বেগ প্রকাশ পাইত, তাহা নরেনকে যেমন বিব্রত, তেমনি বিরক্ত করিয়া তুলিত। রামকৃষ্ণ তাহাতে লজ্জিত হইতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়াও পারিতেন না। প্রকাশ্য জনসভায় যখন রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের সুপ্রতিষ্ঠিত খ্যাতির ঊর্ধ্বে তখনো-কীর্তিহীন তরুণ নরেনের ভাবী খ্যাতির সম্ভাবনাকে তুলিয়া ধরিতেন, তখন নরেনের রাগের সীমা থাকিত না। রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে কলিকাতার রাস্তায় ঘাটে নরেনকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন; এমন কি,

১ পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের অন্যতম বন্ধু এবং একান্ত অনুগত অনুচর, রামকৃষ্ণের সহিত বিবেকানন্দের সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ বর্ণনাকার, সারদানন্দ স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের উভয়ের এক বন্ধুর বাড়িতে তাঁহাদের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বিবেকানন্দকে ভালো চোখে দেখিতে পারেন নাই। সাজিয়া গুজিয়া, উন্নাসিক একটা ভাব লইয়া নরেন আসিলেন এবং অন্যান্য সকলের প্রতি লক্ষ্য না দিয়াই নিজের মনে গুনগুন করিয়া একটা হিন্দী গান গাহিতে গাহিতে ধূমপান করিতে লাগিলেন এবং পরে সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা উঠিলে তাহাতে যোগ দিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার রামকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি এবং সুরুচি ও নৈতিক বুদ্ধির প্রাচুর্য প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, রামকৃষ্ণই একমাত্র মানুষ, যাঁহাকে তিনি ইহজীবনে অন্তরতর আদর্শকে বিনা আপোষে বাস্তবে পরিণত করিতে দেখিয়াছেন। (সারদানন্দ রচিত রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ জীবনীর 'দিব্য ভাব' নামক শেষ খণ্ডে 'বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

২ নরেনের আত্মবিশ্বাস তো তিনি ভাঙিতেনই না, বরং তাহাতে উৎসাহ দিতেন। তিনি তাঁহাকে অন্যান্য শিষ্যদের অপেক্ষা বেশী সুযোগসুবিধা দিয়াছিলেন। যথা নরেনকে তিনি সর্বপ্রকার অশুদ্ধ খাদ্য খাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, নরেনের মতো লোকের পক্ষে, ওগুলি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরেও গিয়া হাজির হইতেন।[১] একবার তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময়ে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফলে অনেক দুর্নাম এবং উন্নাসিক সমালোচনার উদ্ভব হইয়াছিল। নরেন কষ্টও পাইতেন, বিরক্তও হইতেন। তিনি এই পশ্চাদ্ধাবনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য রামকৃষ্ণকে কঠোর বাক্যও বলিতেন। তিনি রামকৃষ্ণকে একবার বলেন, একজনের জন্য অপরের এইরূপ পাগল হওয়া অন্যায় এবং রামকৃষ্ণ যদি তাঁহাকে অত্যধিক ভালোবাসেন তবে তিনি (রামকৃষ্ণ) তাঁহার অসাধারণ অধ্যাত্মিক শক্তি হারাইয়া তাঁহার (নরেনের) স্তরে নামিয়া আসিবেন। সহজ সরল রামকৃষ্ণ সভয়ে নরেনের কথা শুনিতেন এবং ফিরিয়া গিয়া মার পরামর্শ লইতেন। কিন্তু সান্ত্বনা পাইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেন।

নরেনকে বলিতেন "ওরে হতভাগ্য! আমি তোর কথা শুনব না। মা বলেছে, আমি তোকে ভালোবাসি, কারণ, আমি তোর ভেতর ভগবানকে দেখেছি। এমন যদি সময় আসে, যখন ভগবানকে আমি আর দেখতে পাবো না, তখন তোকে দেখাও আমার অসহ্য হ'য়ে উঠবে।"

শীঘ্র তাঁহাদের ভূমিকায় পরিবর্তন দেখা গেল! এমন একটি সময় আসিল, যখন নরেনের উপস্থিতিকে রামকৃষ্ণ পূর্ণ নির্লিপ্তির সহিত দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন নরেনকে দেখেন নাই, এমনি ভাবেই অন্যান্যদের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। এই ভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিল। নরেন কিন্তু ধৈর্যের সহিত সর্বদা ফিরিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রামকৃষ্ণ একদিন নরেনকে প্রশ্ন করিলেন, তিনি এখন কথা বলেন না কেন। নরেন বলিলেন, "আমি আপনার কথা তো শুনতে আসি না। আমি আপনাকে ভালোবাসি, তাই দেখার দরকার হয়, দেখতে আসি।"

গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমেই বিদ্রোহী শিষ্যকে বশীভূত করিতেছিল। নরেন বৃথাই রামকৃষ্ণের বিশ্বাসগুলিতে—বিশেষত, তাঁহার পৌত্তলিকতা এবং পরম ঐক্যের দুই চূড়ান্ত বিপরীতগামী বিশ্বাসকে—বিদ্রূপ করিতেছিলেন। ভগবানের আকর্ষণ ধীরে ধীরে নরেনের উপর কাজ করিতেছিল।

১ ব্রাহ্মসমাজের এই শাখাটিই কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের দিক হইতে এই দলটি ছিল সর্বাপেক্ষা কঠিন ও মীমাংসাবিরোধী। এবং ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, নরেন ঐ সময় এই শাখার সভ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ অসাবধানে এই শাখার সভ্যদের মধ্যে বহু শত্রু গড়িয়া তোলেন। কেশবচন্দ্রের উপর তাঁহার প্রভাবই তাঁহাদের এই বিদ্বেষের কারণ।

রামকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই যদি আমার মাকে মানতে না চাস তবে এখানে আসিস কেন?"

নরেন উত্তর দিলেন : "এলেই কি তাকে মানতে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, আর কয়েকদিন যাক, কেবল তুই তাকে মানবি না, তার নাম শুনলেই আকুল হয়ে কাঁদবি।"[১]

১ কুসংস্কার ও পৌত্তলিকার ঘোরতর বিরোধী এবং বিগ্রহবিধ্বংসী নরেন্দ্রকে কালী এবং কালীর পুরোহিতের সম্মুখে নতজানু হইতে দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যে বিস্মিত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, একথা তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ নিজে কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া দক্ষিণেশ্বর না যাওয়া পর্যন্ত তিনি নরেন্দ্রকে তীব্রভাবে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অতঃপর দক্ষিণেশ্বরে একটি অপরাহ্ণ কাটাইয়া আসিয়া নৈতিক এবং দৈহিক, উভয় দিক হইতেই তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত ধারণাই টলমল করিতে লাগিল। তিনি না বুঝিয়াও দক্ষিণেশ্বরের আবহাওয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। মনে হইল, ঐ সমগ্র আবহাওয়া যেন রামকৃষ্ণের দেহ হইতেই উৎসারিত হইতেছে। এই বিখ্যাত যুক্তিবাদী মনীষী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পদস্থ ব্যক্তি, যিনি এ পর্যন্ত তাঁহার বিচারবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার উপর যে অপূর্বভাবিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক :

"আমার চোখের সম্মুখে যে রূপান্তর ঘটিতেছিল, আমি তাহা তীব্র কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কালীপূজা এবং সমাধি-সাধনার প্রতি আমার মতো একজন তরুণ ঘোরতর বেদান্তবাদী হেগেলবাদী এবং বিপ্লববাদীর মনোভাব কি হইতে পারে, তাহা সহজেই আন্দাজ করা যায়। বিবেকানন্দ ছিলেন জন্ম হইতেই পৌত্তলিকতার বিরোধী, স্বাধীন চিন্তার পূজারী, দুর্নিবার সৃজনী শক্তির অধিকারী এবং অন্যান্য মানুষকে বশীভূত করিতে সুপটু। তিনিও যে এই অদ্ভুত অতিপ্রকৃত অতীন্দ্রিয়বাদের জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন, এই দৃশ্যটি ঐ সময় আমার বিশুদ্ধ যুক্তি-দর্শনের নিকট দুর্বোধ্য মনে হইল।...

"(রুগ্‌ণ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া) আমি বিবেকানন্দের গুরুকে দেখিতে এবং তাঁহার কথা শুনিতে দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। সেখানে মন্দির-প্রাংগণস্থ উদ্যানের নির্জন প্রশান্ত বৃক্ষচ্ছায়ায় দীর্ঘ গ্রীষ্ম দিনের অধিকাংশটুকুই কাটাইয়া যখন ফিরিলাম, তখন ভয়ংকর ঘনঘোর বর্ষা, ঝড় ও বজ্রপাতের মধ্যে সূর্য অস্ত গেল। নৈতিক এবং দৈহিক একটা বিভ্রান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। আপাতদৃষ্টিতে উচ্ছৃংখল এবং অদ্ভুত মনে হইলেও সর্বত্রই যে নিয়মের একটি প্রচ্ছন্ন শাসন ও সংহতি রহিয়াছে, তাহা অনুভব করিলাম। অনুভব করিলাম, অনুভবশক্তি তাহার ভুলভ্রান্তির মধ্যেও যুক্তিরই প্রাথমিক স্তর এবং বস্তুবহির্ভূত একটি 'ব্রহ্মাশক্তিতে' বিশ্বাসী আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ক্রিয়ার কেবল অস্পষ্ট প্রতিফলন মাত্র। বিবেকানন্দের পরবর্তী জীবনে ইহারই সার্থক সমর্থন দেখা যায়। কারণ, বিবেকানন্দ যে দৃঢ় নিশ্চয়তার সন্ধান করিতে-ছিলেন, তিনি তাহা তাঁহার গুরুর আশীর্বাদ এবং শক্তির মধ্যে লাভ করিয়া একদা বিশ্বমানবীয় এবং 'আত্মার' অবিচ্ছেদ্য চূড়ান্ত কর্তৃত্বের প্রচারে বহির্গত হন।" (১৯০৭ খৃস্টাব্দের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রচিত প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন" গ্রন্থের প্রথম ভাগ, ১৭৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।)

রামকৃষ্ণ যখন নরেনের নিকট পরমের সহিত ঐক্য সম্পর্কে অদ্বৈত বেদান্তের দ্বার মুক্ত করিতে চাহিলেন, তখনো ঠিক অনুরূপ অবস্থা ঘটিল। নরেন উহাকে ধর্মের অপমান এবং উন্মত্ততা বলিয়া বাতিল করিয়া দিলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি অদ্বৈত বেদান্তবাদকে ঠাট্টাপরিহাস করিতে লাগিলেন। একদিন নরেন এবং অন্য একজন শিষ্য এই বিষয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়া হো হো করিয়া হাসিতেছিলেন, বলিতেছিলেন: "এই গাড়ু ভগবান।...এই মাছি ভগবান!..." রামকৃষ্ণ পাশের ঘরে ছিলেন, এই ধেড়ে ছেলেদের হাসির হর্‌রা তাঁহার কানে গেল। তিনি অর্ধ-চেতন অবস্থায় নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া নরেনকে স্পর্শ করিলেন।[১] অবিলম্বে পুনরায় নরেনের উপর দিয়া একটি প্রচণ্ড মানসিক ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল। মুহূর্তে তাঁহার চক্ষে সকল কিছুই পরিবর্তিত হইল: তিনি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তিনি নিজের বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। যাহা দেখিলেন, স্পর্শ করিলেন, আহার করিলেন, সব কিছুই ভগবান। এই সর্বব্যাপী শক্তির উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া তিনি সকল কর্ম হইতে বিরত রহিলেন। তাঁহার পিতামাতা চিন্তিত হইলেন, ভাবিলেন, তিনি বুঝি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। অনুরূপ অবস্থায় তাঁহার কয়েকদিন কাটিল। অতঃপর এই স্বপ্নঘোর কাটিয়া গেল। তবে অদ্বৈত অবস্থার পূর্বাস্বাদরূপে ইহার স্মৃতি তাঁহার মনে বিরাজ করিতে লাগিল। এবং ইহার পর তিনি কখনো আর উহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নাই।

অতঃপর তিনি কতিপয় অতীন্দ্রিয় ঝটিকাবর্ত অতিক্রম করিলেন। পাগলের ন্যায় বারে বারে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন: "শিব! শিব!" রামকৃষ্ণ তাঁহাকে সস্নেহে সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন:

"হ্যাঁ রে, আমিও বারো বছর ধরে ঠিক ঐ অবস্থাতেই ছিলাম।"

বিবেকানন্দের স্বভাব ছিল সিংহের মতো, তাহা পরিহাসপূর্ণ অস্বীকৃতি হইতে এক লম্ফে গিয়া উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু ভিতর হইতে না হইয়া কেবল যদি বাহির হইতে আক্রান্ত হইত, তবে তাঁহার স্বভাবের দুর্গ কখনো এইরূপ দীর্ঘ-

১ যে সকল বৈজ্ঞানিক মানসিক-দৈহিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা লক্ষণীয় যে রামকৃষ্ণ যে, স্পর্শগুলির দ্বারা অন্য ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তিত পরিপার্শ্বের অভিজ্ঞতা আনয়ন করিতেন, সেগুলি (যদি সর্বদা না হয়) প্রায় সর্বদা তিনি যখন অর্ধ-চেতন বা পূর্ণ অচেতন অবস্থায় থাকিতেন, তখনই ঘটিত। সুতরাং যে সকল শক্তি ইচ্ছার অধীন, সেগুলি হইতে স্বতন্ত্রভাবে ইচ্ছার পূর্বপরিকল্পিত কোনো ক্রিয়ার সহিত উহার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। যে-গহ্বরে তিনি প্রথমে অবতরণ করিয়াছেন, তাহাতে বলপ্রয়োগে অন্য কাহাকেও নামাইয়া দেওয়ার সহিত উহার অনেকখানি তুলনা চলিতে পারে।

স্থায়ী রূপান্তর লাভ করিত না। বেদনার তীব্র কশাঘাত তাঁহাকে তাঁহার সংসার-স্বাচ্ছন্দ্য এবং বুদ্ধিবাদিতার বিলাস হইতে জাগাইয়া দিল। বুদ্ধিবাদীর দর্প তাঁহার তিরোহিত হইল। তিনি অমংগল এবং অস্তিত্বের করুণ সমস্যার সম্মুখীন হইলেন।

১৮৮৪ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া তাঁহার অসাবধানী অমিতব্যয়ী পিতার মৃত্যু ঘটিল এবং সমগ্র পরিবারটি ধ্বংসের মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইল। উঠিল ছয় সাতটি মুখে অন্ন দিবার প্রশ্ন। পাওনাদারের পংগপাল দেখা দিল। ঐ সময় হইতেই নরেন দারিদ্র্যের আস্বাদ পাইলেন। চাকরির ব্যর্থ সন্ধান এবং বন্ধুদের বিমুখতা যে কি বস্তু, তাহা বুঝিলেন। বিবেকানন্দ এই দুঃখের কাহিনী পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা তাঁহার স্বীকৃতিগুলির মধ্যে তিক্ততম :[১]

"ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়া নগ্নপদে অফিস হইতে অফিসে গিয়া সর্বত্রই ব্যর্থ হইয়াছি। মানুষের করুণার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। ইহাই জীবনের বাস্তবতার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। আমি আবিষ্কার করিয়াছি, দুর্বলের জন্য, দরিদ্রের জন্য, পরিত্যক্তের জন্য এখানে কোনো স্থান নাই। যাহারা কয়েকদিন পূর্বেও আমাকে সাহায্য করিতে গর্ব বোধ করিত, তাহাদের সাহায্যের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া গেল। আমার মনে হইল, পৃথিবীটা শয়তানের সৃষ্টি। একদিন প্রখর রৌদ্রে যখন পা পুড়িয়া যাইতেছিল, আমি মনুমেণ্টের তলায় গিয়া ছায়ায় বসিলাম। সেখানে কয়েকজন বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ভগবানের অপার করুণার গান গাহিলেন। গান নয়, কে যেন ইচ্ছা করিয়াই আমার মাথায় একটা ঘুশি বসাইয়া দিল। আমার মা ও ভাইদের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম : 'এই গান বন্ধ করো; যাহারা ধনীর দুলাল হইয়া জন্মিয়াছে, যাহাদের পিতামাতা ঘরে অনাহারে মরিতেছে না, তাহাদের কানে এই গান সুধা বর্ষণ করিতে পারে। হ্যাঁ, একদিন ছিল যখন এই গান আমারও ভালো লাগিত। কিন্তু আজ যখন আমি জীবনের নিষ্ঠুরতার মুখামুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তখন এই গান আমার কাছে বিদ্রূপের মতো লাগিতেছে।' আমার বন্ধু আহত হইলেন। তিনি আমার ভয়ংকর দুঃখের কথা ভাবিলেনও না। একাধিক বার যখন দেখিয়াছি, বাড়িতে খাবার নাই, তখনই মাকে বলিয়াছি, বাহিরে আমার

---

১ 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ' গ্রন্থের ৪২৮ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি হইতে এই বিবরণী সংগৃহীত হইয়াছে।

নিমন্ত্রণ আছে, এবং বাড়ি হইতে বাহিরে গিয়া অনাহারে রহিয়াছি। আমার ধনী বন্ধুরা অনেক সময় তাঁহাদের বাড়িতে গান গাহিবার জন্য আমাকে যাইতে বলিতেন, কিন্তু তাঁহারা কেহ কখনও আমার দুরবস্থা সম্পর্কে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেন নাই। আমার এই দুরবস্থার কথা আমিও কাহাকেও জানাইতাম না।…"

এই সময়ে নরেন প্রতিদিন প্রত্যুষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। একদিন তাঁহার মা তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে শুনিলেন। কঠিন দুর্ভাগ্যে মার ভক্তি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি নরেনকে বলিলেন :

"চুপ কর, বোকা! তুই তো আবাল্য ভগবানকে ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেল্‌লি। কিন্তু ভগবান তোর জন্যে কি করল?…"

এবার নরেনও ভগবানের প্রতি বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। কেন ভগবান তাঁহার আর্ত প্রার্থনায় সাড়া দেন না? কেন? কেনই বা তিনি পৃথিবীতে এতো দুঃখবেদনা ঘটিতে দেন? ঐ সময় বিদ্যাসাগরের তিক্ত কথাগুলি তাঁহার মনে পড়িল :

"ভগবান যদি এতোই ভালো, এতোই করুণাময়, তবে এক গ্রাস অন্নের অভাবে আজ লক্ষ লক্ষ লোক মরে কেন?"[১]

এই প্রচণ্ড বিদ্রোহ স্বর্গের বিরুদ্ধে মাথা তুলিল, ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

বিবেকানন্দ তাঁহার চিন্তাকে কখনো গোপন করিতেন না। এবার তিনি প্রকাশ্যেই ভগবানের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন যে, হয় ভগবান নাই, নয় তিনি মন্দ। নিরীশ্বরবাদীরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং সচরাচর ধর্মভীরু ব্যক্তিরা যেমন করেন, তেমনিভাবে নরেনের এই

১ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর (ঈশ্বরচন্দ্র, ১৮২০-১৮৯১) একজন সমাজসংস্কারক ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পরিচালক ছিলেন। রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিকে তাঁহার বিদ্যার অপেক্ষা মানুষের প্রতি তাঁহার ভালোবাসার জন্যই লোকে অধিক শ্রদ্ধা করে। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে এক লক্ষের অধিক লোক মারা যায়। তিনি অসহায় ভাবে ঐ দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষ করেন এবং মানুষের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে কাশ্মীর যাত্রার সময় বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সতর্ক শ্রদ্ধার সহিত কথা বলেন। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে তাঁহাকে শোনা যায় নাই। ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার আলাপের বিবরণীতে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। (স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কয়েকটি পর্যটনের কড়চা কলিকাতা উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

অবিশ্বাসকে অকথ্য, অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং তাঁহার কার্যাবলীগুলিকে বিদ্বেষ প্রসূত বলিয়া তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই অসাধুতা বিবেকানন্দকে আরো কঠিন করিয়া তুলিল। তিনি প্রকাশ্যে গর্ব করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাঁহার মতো যাঁহারা এই হীন অধঃপতিত পৃথিবীতে দুর্ভাগ্যের কবলে পড়িয়াছেন, যে কোন উপায়ে মুহূর্তের জন্যও আনন্দের সন্ধান করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। এবং এই কথা বলিয়াও তিনি একপ্রকার অদ্ভুত আনন্দ পাইতে লাগিলেন। তিনি একথাও বলিতে লাগিলেন যে, যদি কোনো উপায়কে তিনি আনন্দ লাভের উপযোগী বলিয়া ভাবেন, তবে নিশ্চয় কাহারও ভয়ে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বিরত থাকিবেন না। রামকৃষ্ণের কতিপয় শিষ্য তাঁহাকে ধর্মের ভয় দেখাইলেন, তিনি জবাবে বলিলেন, কেবল কাপুরুষরাই ভগবানকে বিশ্বাস করে, এবং এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। কিন্তু সেই সংগে অন্যান্য সকলের মত রামকৃষ্ণও যে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে পারেন, এই কথাটা তাঁহাকে চিন্তিত করিল। "কিন্তু তাহাতেই বা কি আসে যায়? কাহারও সুনাম যদি এতো সূক্ষ্ম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সুনাম আমি চাহি না। সে সুনামে আমি পদাঘাত করি।..."

রামকৃষ্ণ ছাড়া দক্ষিণেশ্বর আশ্রমের আর সবাই তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ নরেন সম্পর্কে বিশ্বাস হারাইলেন না।[১] তিনি কেবল একটি চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, নরেনের মোক্ষ কেবল তাঁহার মধ্য হইতেই আসিতে পারে।

গ্রীষ্ম কাটিয়া গেল। নরেন তাঁহার জীবিকার সন্ধান চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি অনাহারে অবসন্ন দেহে ভিজিতে ভিজিতে একটি বাড়ির সম্মুখে আসিয়া রাস্তায় লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহে জ্বরবিকার দেখা দিল। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, তাঁহার আত্মাকে যাহা আবৃত করিয়াছিল, তাহা যেন অকস্মাৎ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং সেখানে আলোক উদ্ভাসিত হইল।[২]

১ পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ বলেন, "রামকৃষ্ণই একমাত্র ব্যক্তি, আমার প্রতি যাঁহার বিশ্বাস অটল ছিল। এমন কি আমার মা এবং ভাইরাও এইরূপ বিশ্বাসে অসমর্থ ছিলেন। রামকৃষ্ণের অটল বিশ্বাসই আমাকে তাঁহার সহিত চিরদিনের জন্য যুক্ত করিয়াছিল। তিনি একাই ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ বুঝিতেন।

২ জীবনীশক্তি যখন একটি সীমায় আসিয়া পৌঁছে এবং সংগ্রামের শেষ শক্তিটুকুও বিনষ্ট হয়, তখনই, সেই মুহূর্তে, একই যান্ত্রিক উপায়ে এই দৈবী উদ্ঘাটন ঘটে।

তাঁহার অতীতের সমস্ত সংশয় আপনা হইতে তিরোহিত হইল। তিনি যেন সত্যই বলিতে পারিলেন :

"আমি দেখেছি, জেনেছি। আমি বিশ্বাস করি। আমার ভুল ভেঙেছে।..."

তাঁহার দেহ এবং মন শান্তি পাইল। তিনি বাড়ির ভিতরে গিয়া সারারাত্রি ধ্যানস্থ হইয়া কাটাইলেন। সকালে তাঁহার মতি স্থির হইল। তিনি স্থির করিলেন, তাঁহার পিতামহের মতো তিনিও সংসার ত্যাগ করিবেন। কবে করিবেন, তাহাও স্থির হইয়া গেল।

কিন্তু সেদিনই রামকৃষ্ণ এসব ব্যাপার কিছু না জানিয়াই কলিকাতা আসিলেন এবং নরেনকে ঐদিন রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। নরেন তাঁহাকে এড়াইতে চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, রামকৃষ্ণের সংগে যাইতে বাধ্য হইলেন। ঐদিন বাড়িতে রুদ্ধদ্বার একটি গৃহে নরেনের সহিত বসিয়া রামকৃষ্ণ গান গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার অপূর্ব কণ্ঠস্বর তরুণ নরেনের চোখে জল আনিয়া দিল। নরেন বুঝিলেন, গুরুদেব তাঁহার মতলব বুঝিতে পারিয়াছেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন :

"আমি জানি, তুই সংসারে থাকতে পারবি না। তবে আমি যতো দিন বেঁচে আছি, আমার জন্যে তুই থাক।"

নরেন বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। তিনি একটি তর্জমার অফিসে এবং একটি এটর্নির অফিসে চাকরি পাইলেন। কিন্তু কোথাও স্থায়ী চাকরি জুটিল না। ফলে, তাঁহার পরিবারের ভাগ্য নিতান্তই অনিশ্চিত রহিয়া গেল। তিনি রামকৃষ্ণকে তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

কিন্তু রামকৃষ্ণ বলিলেন, "বাছা, আমি তোর হ'য়ে তো চাইতে পারি না। মাকে তুই নিজেই চেয়ে নে না।"

নরেন 'মা'র মন্দিরে গেলেন। তিনি নিজেকে অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করিলেন। প্রেম ও বিশ্বাসের একটি বন্যা যেন তাঁহার মধ্য দিয়া বহিয়া গেল। নরেন ফিরিয়া আসিলেন। তিনি কিছু চাহিয়াছেন কিনা, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তাঁহার মনে পড়িল, তিনি তাঁহার দুঃখদুর্দশা দূর করিবার কথা জানাইতে সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ আবার তাঁহাকে যাইতে বলিলেন। তিনি গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মন্দিরে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার যাইবার উদ্দেশ্য তাঁহার চোখের সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইল। তৃতীয় বারের বেলায়, তিনি কি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে

পড়িলেও, তাহা তিনি লজ্জায় বলিতে পারিলেন না। "এই সামান্য ভিক্ষা! এজন্য কি মাকে বিরক্ত করা যায়?"

তাই তিনি প্রার্থনা করিলেন, "মাগো! আমি কেবল জানতে চাই, আর বিশ্বাস করতে চাই। আর কিছুই চাই না।"

ঐ দিন হইতে তাঁহার এক নূতন জীবন আরম্ভ হইল। তিনি জানিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস গ্যেটের সেই বৃদ্ধ বীণাবাদকের মতো[১] বেদনার মধ্যেই জন্মলাভ করিল। তাই তাহা কখনো অশ্রুসিক্ত অন্নের কথা ভুলিল না, ভুলিল না সেই অন্নের অংশভাগী দুঃস্থ ভাইদের কথা। তাই তাঁহার গুরুগম্ভীর উদাত্ত একটি আর্তনাদ তাঁহার বিশ্বাসকে বিশ্বের নিকট ঘোষণা করিয়া দিল।

"যে একমাত্র ভগবানে আমি বিশ্বাস করি, তাহা হইল বিশ্বের সমস্ত আত্মার সমষ্টি। এবং, সর্বোপরি আমি বিশ্বাস করি, সকল দেশের সকল জাতির পাপী ভগবানে, পতিত ভগবানে, দুঃস্থ-দরিদ্র ভগবানে।..."

গ্যালিলীর লোকটারই (যীশুর) জয় হইল।[২] বাংলার যীশু তাঁহার ভক্তের দম্ভের প্রতিরোধকে চূর্ণ করিলেন। ইহার পর রামকৃষ্ণ তাঁহার এই ক্ষত্রিয় সন্তানের অপেক্ষা আর কাহাকেও এমন অনুগত করিয়া পাইলেন না। তাঁহাদের মধ্যে মিলন এমন পরিপূর্ণরূপে ঘটিল যে, মাঝে মাঝে মনে হইল, তাঁহারা বুঝি এক, অভিন্ন। বিবেকানন্দের উল্লসিত আত্মা বুঝিত না যে, ধীরে ধীরে কোন পথে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই উহার উগ্রতাকে কমাইবার জন্য উহার উপর রামকৃষ্ণের প্রভাবের প্রয়োজন ছিল। রামকৃষ্ণ জানিতেন, উহার কি বিপদ ঘটিতে পারে। উহার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ গতি যুক্তির সকল সীমা ছাড়াইয়া জ্ঞান হইতে প্রেমে, চিন্তার পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা হইতে কর্মের পূর্ণ প্রয়োজনে লাফাইয়া চলিল। উহা অবিলম্বে সকল কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাহিল। রামকৃষ্ণের জীবনের শেষ দিনগুলিতে আমরা দেখিব, বিবেকানন্দ তাঁহাকে নির্বিকল্প সমাধির সুযোগ দিবার জন্য তাঁহার গুরুদেবকে কেবলই অনুরোধ করিতেছেন। নির্বিকল্প সমাধিতে

১ উইলহেল্‌ম মাইস্টার-এ গ্যেটের সর্বাপেক্ষা সুন্দর গানটির কথা বলা হইতেছে। সুবের, হিউগো উল্‌ফ প্রভৃতি সকল শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় সাংগীতিকরাই এই গানে সুর দিয়াছেন।

২ খৃস্টের বিরুদ্ধে বৃথা যুদ্ধ করিবার পর মৃত্যুশয্যায় সম্রাট জুলিয়ান এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন।

ঊর্দ্ধতম অতিচেতন দিব্য প্রকাশ ঘটে। এই সমাধি হইতে আর ফিরিয়া আসা যায় না। কিন্তু রামকৃষ্ণ তাহাতে কোনো মতেই রাজী হইতেছেন না।

শিবানন্দ আমাকে জানান, একদিন কলিকাতার নিকটবর্তী কাশীপুরের বাগানে যখন বিবেকানন্দ উক্ত সমাধি লাভ করেন, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। "তিনি অচেতন হইলেন। তাঁহার দেহ শবের ন্যায় শীতল হইল। তাহা দেখিয়া আমরা গুরুদেবের নিকট ছুটিয়া এই ঘটনার সংবাদ দিলাম। গুরুদেব কোনো প্রকার উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন না। কেবল মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, "বেশ তো!" তারপর নীরব হইয়া গেলেন। নরেনের সংজ্ঞা হইলে তিনি প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। প্রভু বলিলেন, 'বেশ তো! এবার বুঝলে তো? ওটাকে (ঐ উচ্চতম উপলব্ধিকে) এবার কিন্তু চাবিতালা দিয়ে রেখো। তোমাকে মার কাজ করতে হবে। কাজ শেষ হ'লে তিনি নিজেই আবার চাবি খুলে দেবেন।'[১] জবাবে নরেন বলিলেন, 'প্রভু, আমি সমাধিতে অত্যন্ত সুখে ছিলাম। বহির্জগতের কথা বিন্দুমাত্রও মনে ছিল না। আমি চাই, আপনি আমাকে সেই অবস্থায় থাকতে দেন।' গুরুদেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ছি ছি! এ তুই কেমন ক'রে চাস? আমি ভেবেছিলাম, তুই একটা বিরাট পাত্র, সেখানে তুই সমস্ত জীবকে ভরে রাখবি। তা নয়, তুই কিনা সাধারণ লোকের মতো চাস ব্যক্তিগত আনন্দ!...যা তুই দেখেছিস, মার আশীর্বাদে তা তোর পক্ষে এমন স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে যে, তুই সাধারণ অবস্থাতেও সমস্ত জীবের মধ্যে সেই এককে প্রত্যক্ষ করতে পারবি। পৃথিবীতে বহু মহৎ কাজ তুই করবি; তুই মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা আনবি; তুই দীনদুঃখীদের দুঃখ ঘুচাবি।"[২]

বিবেকানন্দ কি জন্য গঠিত হইয়াছেন, রামকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি তাঁহাকে সেই কাজে নামাইয়া দেন।

তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষ যারা, তারা পৃথিবীকে শিক্ষা দিবার দায়িত্ব নিতে ভয় করে। হালকা বাজে কাঠ কোনো রকমে জলে ভেসে থাকে। যেই না তার উপর একটা পাখী এসে বসলো, অমনি ডুবে গেল। কিন্তু নরেন আলাদা জিনিস।

১ ১৯২৭ খৃস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের পত্র।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

সে একটা বিরাট গাছের গুঁড়ি ; কতো মানুষ, কতো জীবজন্তু বয়ে নিয়ে সে গঙ্গার বুকে ভেসে থাকবে।"[১]

তিনি এই বিরাটকায় দানবের ললাটে সেণ্ট খৃস্টফারের[২] চিহ্ন আঁকিয়া দিলেন—মানব-বাহক খৃস্টফারের।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

২ সেণ্ট খৃস্টফার সংক্রান্ত খৃস্টান উপকথার কথা বলা হইতেছে। (খৃস্টফারের অর্থ খৃস্টের বাহক। খৃস্টফার ছিল এক দানব।) খৃস্টফার তাহার ঘাড়ে করিয়া লোককে নদী পার করিয়া দিত। একদিন যীশু খৃস্ট তাহার নিকটে আসিলেন। ("জাঁ ক্রিস্তফ" উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

১১

সায়াহ্ন সংগীত

এবং এইভাবে রামকৃষ্ণ ১৮৮১ খৃস্টাব্দ হইতে শিষ্য-পরিবৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে থাকেন। শিষ্যরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, ভালবাসিতেন। সুমধুর কলধ্বনিতে গঙ্গা তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিত। মধ্যাহ্নে আঁকিয়া বাঁকিয়া দুই কূল ভাসাইয়া নদীতে আসিত জোয়ার। এইভাবে নদীর অবিরাম অবিচ্ছিন্ন সংগীতের পটভূমিকায় রামকৃষ্ণ এবং তাঁহার শিষ্যদের সুন্দর সাহচর্য রচিত হইত। দেব-দেবীদের দিবস-রজনীকে চিহ্নিত করিয়া যে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিত, যে শংখ-ধ্বনি হইত, বংশী-মৃদংগ-করতাল বাজিত, উপাসনা চলিত, সেই সুরের ঐকতানে জাহ্নবীর কলতানও উদয়াস্ত মিশিয়া যাইত।[১] বায়ুভরে উদ্যান হইতে বহিয়া আসিত ধূপ-গন্ধের মতো পবিত্র পাগল-করা পুষ্প-গন্ধ। চাঁদোয়া এবং ঝালর-ঝুলানো অর্ধবৃত্তাকার বারান্দার স্তম্ভগুলির অবকাশে ফুটিয়া উঠিত প্রবহমান নদীর সংগে প্রবহমান অনন্তের ছবি।

কিন্তু মন্দির-প্রাঙ্গণ আর একটি ভিন্নতর নদীর অবিরাম স্রোতধারায় স্পন্দিত হইত। এই নদী মানুষের নদী, তীর্থ-যাত্রীর, পূজারীর, পণ্ডিতের, সকল প্রকারের সকল অবস্থার ধর্মভীরু কৌতূহলী মানুষের নদী। ইঁহারা সকলেই আসিয়াছেন

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পুস্তকের প্রতি পদেই এই পরিপার্শ্ব এবং আবহাওয়ার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

প্রভাত হইবার পূর্বেই মৃদু ঘণ্টাধ্বনিতে প্রাতঃকৃত্য ঘোষিত হইত। দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিত। নাটমন্দিরে বংশী, মৃদংগ এবং করতাল সহযোগে পঠিত হইত প্রাতঃস্তোত্র। পূর্বকাশ রক্তিম হইবার পূর্বেই উদ্যানে দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে পত্রপুষ্প হইত সংগৃহীত। যে-সকল শিষ্য রাত্রিতে ঠাকুরের কাছে থাকিতেন, তাঁহারা শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ধ্যান করিতেন। রামকৃষ্ণও অর্ধোলংগ অবস্থায় উঠিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিতেন। সোহাগ করিয়া মার সংগে কতো কথাই না কহিতেন। তারপর সমস্ত বাদ্যযন্ত্র একসংগে বাজিয়া উঠিত। শিষ্যরা স্নান-আহ্নিক সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেন, ঠাকুর বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। গঙ্গার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া তাঁহাদের কথাবার্তা চলিত।

মধ্যাহ্নে কালী, বিষ্ণু এবং দ্বাদশ শিবের মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনিসহ পূজার সমাপ্তি ঘোষিত হইত। আকাশের সূর্য দাউ দাউ করিয়া জ্বলিত। দক্ষিণ-সমীরণে নদীর জল কাঁপিয়া উঠিত। আহারের পর ঠাকুর স্বল্পক্ষণ বিশ্রাম করিতেন। তারপর পুনরায় আলাপ আরম্ভ হইত।

সন্ধ্যায় মন্দিরের ফরাস আসিয়া বাতিগুলি জ্বালিয়া দিত। রামকৃষ্ণের ঘরের কোণে যে প্রদীপটি জ্বলিত, রামকৃষ্ণ তাহারই আলোয় তন্ময় হইয়া বসিয়া থাকিতেন; শংখ ও কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনিতে সান্ধ্যকৃত্য ঘোষিত হইত। পূর্ণচন্দ্রালোকে আলাপ চলিত।

অদূরবর্তী মহানগরী হইতে বা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এই অপূর্ব অনধিগম্য মানুষটিকে—যিনি এখনো নিজেকে তেমন কিছুই ভাবেন না—দেখিতে বা প্রশ্নের ভারে ব্যস্ত বিব্রত করিতে। অক্লান্ত ধৈর্যের সংগে মধুর গ্রাম্য ভাষায় রামকৃষ্ণ তাঁহাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিয়া যান। তাঁহার কথাগুলিতে একটি ঘনিষ্ঠ সরল সৌন্দর্য মিশ্রিত থাকে। অথচ তাহাতে গভীর বাস্তবতার সহিত আত্মীয়তাটুকু বিন্দুমাত্রও ব্যাহত-বিচ্যুত হয় না। তাঁহার দৃষ্টির সমুখ দিয়া কিছুই, কোনো ব্যক্তিই, অলক্ষিতে যাইতে পারেন না। তিনি যেমন পারেন শিশুর মতো খেলা করিতে, তেমনি পারেন প্রাজ্ঞের মতো বিচার করিতে। এই নিখুঁত, হাস্যময়, স্নেহময় অন্তর্ভেদী স্বতঃস্ফূর্তিই ছিল তাঁহার সম্মোহন শক্তি। মানুষের সহিত সম্পর্কিত কোনো কিছুই তাঁহার নিকট অপরিচিত ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে, আমাদের খৃস্টান জগতের সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিত তাঁহার একটি পার্থক্য ছিল। তিনি দুঃখের সন্ধান করিতেন। দুঃখকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু দুঃখ তাঁহার মধ্যে গিয়া বিলুপ্ত হইত; তাঁহার ক্ষেত্রে বিষণ্ণ কিছু, বিরস কিছু, বিরূপ কিছু জন্মিতে পারিত না। তিনি ছিলেন মানুষের মহান শুদ্ধিদাতা। তিনি মানুষের আত্মাকে তাহার ক্লেদাক্ত আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে ধৌত করিয়া কলংকমুক্ত করিতেন। ক্ষমাশীল মৃদু হাস্যের জোরেই তিনি গিরিশচন্দ্রের মতো মানুষকেও সাধুতে পরিণত করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের গোলাপ ও রজনীগন্ধার গন্ধভারে আমোদিত সুন্দর উদ্যানের আবহাওয়ার মধ্যে নির্লজ্জ পাপের অসুস্থ চিন্তাকে কখনো তিনি প্রবেশ করিতে দিতেন না। তিনি বলেন:

"কোনো কোনো খৃস্টান আর ব্রাহ্ম পাপ-বোধের মধ্যে ধর্মের সার কথা আছে মনে করেন। 'প্রভু হে, আমি মহাপাপী![১] তুমি আমার পাপ মার্জনা করো!' এই বলে যারা প্রার্থনা করে, তাঁদের মতে, তারাই হলো সব চেয়ে বড়ো ধার্মিক। তাঁরা ভুলে যান যে, পাপবোধটা আধ্যাত্মিক উন্নতির একবারে গোড়ার, সব চেয়ে

১ সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রাঁসোআ দ্য ক্লিউনির (১৬৩৭-১৬৯৪) রচনাগুলিকে আবে ব্রেম পুনরায় চালু করেন। পাপের অবস্থায় ফ্রাঁসোআ দ্য ক্লিউনি আনন্দ বোধ করিতেন। তিনি পাপবোধকে পরিণত পরিপুষ্ট করাকেই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। তিনি পাপের সন্ধান করিয়া তিনটি বই লেখেন, অথচ তাঁহার লেখাগুলি কি নিষ্পাপ ভাবেই না ঘটিয়াছিল। (বইগুলি এই: ১। পাপী-লিখিত পাপীদের ভক্তিভাব। ২। পাপী-লিখিত পাপীদের কড়চা। ৩। পাপী-লিখিত পাপীদের উপাসনা প্রসংগ।) অ্যাঁরি ব্রেম রচিত 'লা মেতাফিজিক দে সেঁ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

রামকৃষ্ণ এই ফ্রাঁসোআ দ্য ক্লিউনি বা তাঁহার রচনার কথা শুনিলে কি বলিতেন?

নিচেকার, ধাপ। তাঁরা অভ্যাসের জোরটাকে দেখেন না। তুমি যদি চিরদিন কেবলই বলতে থাকো, 'আমি পাপী, আমি পাপী', তবে তুমি চিরদিনের জন্ম পাপীই রয়ে যাবে।...তার চেয়ে বরং তোমার বলা উচিত: 'আমি বদ্ধ নই, আমি বদ্ধ নই।...কে আমায় বাঁধবে? রাজার রাজা যে ভগবান, আমি তারই ছেলে।...' তোমার ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাও, তুমি মুক্তি পাবে! যে শালা নিজেকে কেবলই 'বদ্ধ বদ্ধ' করে, সে সত্যি সত্যিই বদ্ধ র'য়ে যায়। কিন্তু যে-লোক বলে 'আমি সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত। আমি মুক্ত। ভগবান কি আমাদের বাবা নয়?...' সে লোকই মুক্ত।...বন্ধনটা যেমন মনের, মুক্তিটাও তেমনি মনের।..."[১]

তিনি তাঁহার চারিদিকে আনন্দ এবং মুক্তির বায়ু বহিতে দিতেন। গ্রীষ্মদগ্ধ আকাশের ভারে মুহ্যমান বিষণ্ণ আত্মাগুলি আবার তাহাদের দল মেলিয়া ধরিত। তিনি নিরাশতমকেও আশ্বাস দিতেন। "ভয় কি, ধৈর্য ধরো। বৃষ্টি আসিবেই! আবার তুমি সবুজ হইয়া উঠিবে!"

উহা ছিল মুক্তাত্মাদের আশ্রম—যাঁহারা মুক্ত আছেন, বা যাঁহারা মুক্ত হইবেন, —কারণ, ভারতে কালের কোনো মূল্য নাই। রবিবারের সমাগমটি কতকটা ছোটখাটো উৎসব বা সংকীর্তনের আকারেই হইত। অন্যান্য সাধারণ দিনে শিষ্যদের সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎগুলি কখনই মতবাদ সংক্রান্ত শিক্ষার আকার ধারণ করিত না। মতবাদের সেখানে কোনো মূল্যই ছিল না। মূল্য ছিল কেবল বিভিন্ন মনের উপযোগী, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন মানুষের মধ্য হইতে সারবস্তুকে বাহিরে আনিবার জন্য বিভিন্ন অনুশীলনের। অবশ্য, অনুশীলনের সময় আত্মা সর্বদাই তাহার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিত। সমস্ত উপায়ই উত্তম। কি অন্তর্মুখী অভিনিবেশ, কি বুদ্ধির সহজ ব্যবহার, কি সংক্ষিপ্ত ভাবোচ্ছ্বাস, কি জ্ঞানগর্ভ নীতিগল্প, কি সরস সহাস্য কাহিনী, কি, এমন কি, তীক্ষ্ণ পরিহাসের দৃষ্টিতে এই বিশ্বপ্রহসনের অবলোকন।

ঠাকুর তাঁহার ক্ষুদ্র শয্যাটিতে বসিয়া থাকিতেন এবং মন দিয়া শিষ্যদের মনের কথা শুনিতেন। তিনি তাঁহাদের ছোটখাটো দুঃখে, দুশ্চিন্তায় এবং পারিবারিক বিষয়েও অংশগ্রহণ করিতেন; তিনি ভাঙিয়া-পড়া যোগানন্দকে সস্নেহে প্রেরণা

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

রামকৃষ্ণ বারে বারে এই মহাবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন: ভগবান পাওয়া 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, এই তিন থাকতে নয়'। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী) প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসীর বুকে আমি এই কথাগুলিকে মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই।

দিতেন; দুরন্ত বিবেকানন্দকে দমাইয়া রাখিতেন; নিরঞ্জনানন্দের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভৌতিকতাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। তিনি এই ঘরছাড়া দুরন্ত অশ্বশাবকদিগকে একের বিরুদ্ধে অপরকে দৌড় করাইতে ভালোবাসিতেন। যখন তাঁহাদের মধ্যে যুক্তিতর্কের ঝড় তালগোল পাকাইয়া উঠিত, তখন তিনি দুষ্টামি করিয়া দুই একটি জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য করিতেন। সে মন্তব্য তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিত, তাঁহাদের দৌড়ের গতি কমিয়া ভ্রমণের গতিতে আসিয়া পৌছিত। লাগাম-ব্যবহারের ব্যবস্থা না করিয়াই, যাহারা অতি দ্রুত আগাইয়া গিয়াছিল, এবং যাহারা যথেষ্ট আগাইতে পারে নাই, তাহাদের উভয় দলকেই যথাস্থানে পৌছাইবার চমৎকার উপায় তিনি জানিতেন। তিনি জানিতেন, কেমন করিয়া নিদ্রাতুর আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে হয়, কেমন করিয়া অত্যুৎসাহী আত্মাকে সংযত রাখিতে হয়। রামকৃষ্ণ তাঁহার সেণ্ট জন[1] প্রেমানন্দের (বাবুরাম) নির্মল মুখের উপর যেমন তাঁহার স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন—তাঁহার মতে, প্রেমানন্দ ছিলেন 'নিত্যসিদ্ধ' অর্থাৎ জন্মের পূর্ব হইতেই তিনি শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ রহিয়াছেন,[2] এবং তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার কোনো প্রয়োজন নাই—তেমনি আবার তিনি অত্যুৎসাহী কৃচ্ছ্র সাধকদের সম্মুখীন হইলে ব্যংগবিদ্রূপে দীপ্ত হইয়া উঠিতেন।

"শুদ্ধাচারের দিকে অতি বেশী মন দেওয়াও একটা রোগ। এই রোগে মানুষ যখন ভুগে, তখন তার আর ভগবানের কিম্বা মানুষের কথা ভাববার সময় থাকে না।"

রাজযোগের অনর্থক বিপজ্জনক অভ্যাস হইতে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে দূরে রাখেন।[3] প্রতিপদে ভগবানকে দেখিবার জন্য সকল সময় কেবল চক্ষু ও হৃদয়কে উন্মুক্ত ও উন্মুখ রাখিতে হয়। সুতরাং জীবন ও স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করিয়া লাভ কি?

১ সেণ্ট জন—খৃস্টের অন্যতম প্রচার-শিষ্য ও জীবনী-রচয়িতা।—অনু:

২ এই শ্রেণীতে নরেন্দ্র, রাখাল এবং ভবনাথও পড়েন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য)। লক্ষণীয় যে, তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ মনোভাবের সংগে এই শ্রেণী নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নাই। বাবুরাম ছিলেন একজন পূর্বনির্দিষ্ট জ্ঞানী, ভক্ত নহে।

৩ সারদানন্দ-রচিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য: রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলেন: এই সকল অভ্যাস কঠিন কলিযুগের জন্য নহে। এখন মানুষ বড়ো দুর্বল এবং স্বল্পায়ু। এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইবার মতো সময় তাহাদের নাই। প্রয়োজনও নাই। এই সকল যোগাভ্যাসের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল মনঃসংযোগ যাঁহারাই শুদ্ধ প্রাণে ভগবানকে ধ্যান করেন, তাঁহারাই সহজে উহা লাভ করেন। ভগবানের কৃপায় সিদ্ধির পথ সহজ হইয়াছে। আমাদের আশে-পাশে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের উপর আমরা যে স্নেহ বর্ষণ করি, সেই স্নেহশক্তিকে তাঁহার কাছে কেবল ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।" (সংক্ষিপ্তকৃত অনুবাদ।)

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্মরূপে দেখতে চাইলেন।···কৃষ্ণ তখন বললেন: 'আচ্ছা, দেখ আমি কেমন। কৃষ্ণ অর্জুনকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বললেন: 'কি দেখছো?' অর্জুন বললেন, 'বিরাট একটা গাছ। তাতে থোকা থোকা ফল ধরেছে।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'না সখা, কাছে গিয়ে ভালো ক'রে দেখ তো। ওগুলো ফল নয়, ওগুলো অসংখ্য শ্রীকৃষ্ণ।'···[১]

আর তীর্থযাত্রারও কি কোনো প্রয়োজন আছে?

"মানুষের পবিত্রতাই স্থানের পবিত্রতা বাড়ায়। নইলে স্থান মানুষকে পবিত্র করবে কেমন ক'রে?" ভগবান সর্বত্র আছেন। তিনি আমাদের মধ্যেও আছেন। জীবন ও বিশ্বলোক তাঁহারই স্বপ্নমাত্র।

কামারপুকুরের এই ক্ষুদ্রকায় গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষটির মধ্যে মার্থা এবং মেরীর দুইটি প্রকৃতিই মিলিত হইয়াছিল।[২] তিনি যখন তাঁহার চতুর চঞ্চল হাতের আঙুলগুলি নাড়িয়া নাড়িয়া এই নীতিগল্পগুলি কহিতেন,[৩] তখন, সেই সংগে, তিনি দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র খণ্ড কাজের প্রতিও তাঁহার শিষ্যদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন। আলস্য অপরিচ্ছন্নতা বা বিশৃংখলা তিনি বরদাস্ত করিতেন না। এ বিষয়ে তিনি ধনীর দুলালদিগকেও শিক্ষা দিতে পারিতেন। তিনি নিজের গৃহ এবং উদ্যান সাফ্ রাখিয়া এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

কিছুই তাঁহার চক্ষু এড়াইত না। তিনি কল্পনা করিতেন, লক্ষ্য করিতেন। তাঁহার সরল সহাস্য জ্ঞান সর্বদা তাঁহার শিশুসুলভ হাস্যটিকে অক্ষুন্ন রাখিত। এই ভাবে ঠাকুর সংসারী বা অত্যুৎসাহী ভক্তদের অনুকরণ করিয়া ভেঙাইয়া-ও মজা পাইতেন।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ।

২ সেণ্ট লিউক-রচিত 'যীশুর জীবনী' দশম অধ্যায়ে বর্ণিত মার্থা এবং মেরী।

৩ নিম্নে অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল:

"এক কাঠুরে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছিল। তার এক বন্ধু এসে তাকে জাগিয়ে দিলো। কাঠুরে জেগে বললো, 'আঃ! কেন ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি? আমি মস্ত এক রাজা হয়েছি, আমার সাত জন ছেলেমেয়ে। ছেলেরা সবাই যেমন বীর, তেমনি পণ্ডিত। আমি সিংহাসনে বসে রাজকার্য করছিলাম। কি সুন্দর! এমন স্বপ্নটা তুই ভেঙে দিলি?"

বন্ধু বললে, "তাতে হোলো কি? ও তো স্বপ্ন?"

জবাব দিলো কাঠুরে: "তা তুই বুঝবি না। কাঠুরে হওয়াটা যেমন সত্যি স্বপ্নে রাজা হওয়াটাও ঠিক তেমনি সত্যি। কাঠুরে হওয়াটা যদি সত্যি হয়, তবে স্বপ্নে রাজা হওয়াটাও সত্যি নয় কেন?" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ।)

"ঠাকুর একবার এক মেয়ে-কীর্তনীয়াকে নকল করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে খুব আনন্দ দেন। মেয়েটি তো সদলবলে আসরে আসিয়া ঢুকিল। পোশাকের কী বাহার। হাতে একটা রুমাল। কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আসিলে মেয়েটি গান গাহিতে গাহিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইত, 'আসুন'! এবং হাতের উপর হইতে আঁচল সরাইয়া তাহার তাবিজ ও বাজুবন্ধ দেখাইত। ঠাকুর তাহাকে নকল করিলেন। শিষ্যরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পল্টু তো মাটিতে লুটাপুটি খাইতে লাগিল। ঠাকুর তাহাকে মৃদু হাস্যে কহিলেন, "তুই কি ছেলেরে! বাড়ি গিয়ে আবার বাবাকে বলিসনে যেন! এখনো সে আমাকে যদি বা একটু সম্মান শ্রদ্ধা করে, তাহলে তাও করবে না। সে তো একবারে সাহেব ব'নে গেছে!…"

রামকৃষ্ণ আরো কয়েক প্রকারের মানুষের বর্ণনা দেন।

তিনি বলেন, "এক ধরণের লোক আছে, তারা পূজা-আচ্চার সময় যতো কথা বলে, তেমনটি আর কখনো বলে না। কথা বলতে বারণ থাকে, তাই তারা অংগভংগী করে, ফিস্‌ফিস্‌ করে। 'এটা দাও',…'ওটা করো' করে।…কেউ হয়তো মালা জপছে। এমন সময় জেলের সংগে দেখা। অমনি কোন মাছটা তার চাই, আঙুল দিয়ে তা দেখাবার জন্যে মালা থেকে তার হাত বেরিয়ে এলো।…একটি মেয়ে গঙ্গাস্নান করতে গেলো। কোথায় সে ভগবানের কথা ভাববে তা নয়, কার ছেলেকে কত বরপণ দিলো,…কার অসুখ হলো,…কে কনে দেখতে গেছে…কনের ঘরে কি কতো দেবে, না দেবে; কে তাকে ভক্তি করে, না করে; কার মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হোলো, তাইতো সে বড় ব্যস্ত ছিল, তাই অনেকদিন গঙ্গা নাইতে আসতে পারে নি; ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে বকর বকর করছে। দেখ, এলি তুই গঙ্গা নাইতে, তা গঙ্গা নাওয়ার কথাটা মনেও নেই।…

ঐ সময় ঠাকুরের দৃষ্টি একজন শ্রোতার উপর গিয়া পড়ায় তিনি সমাধিস্থ হইলেন।[১]

পুনরায় তাঁহার চেতনা ফিরিলে তিনি পূর্ব আলোচনার ছিন্নসূত্র ধরিয়া অবিরাম বকিয়া চলিলেন, কখনো বা কালী ও কৃষ্ণের নীল গাত্রবর্ণ সম্পর্কে গান ধরিলেন[২]:

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ।

২ এই বর্ণের মধ্যে রামকৃষ্ণ একটি প্রতীকের সন্ধান পাইতেন। কালিকার গাঢ় নীল রঙ তাঁহার মনে আকাশের গভীরতার কথা জাগাইয়া দিত।

"বংশী বাজিল ঐ বিপিনে।
(আমার তো না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়িয়ে আছে)
তোরা যাবি কি না যাবি বল গো॥
তোদের শ্যাম কথার কথা।
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই)॥
তোদের বাঁশী বাজে কানের কাছে।
আমার বাঁশী বাজে হৃদয় মাঝে॥
শ্যামের বাঁশী বাজে, বেরাও রাই।
তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাই॥"
"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন।
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অণুক্ষণ।
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ডাংগায় ডিংগে চালায় আবার সে কোন জন।"
"আনন্দে মগনা শিবসংগে সদারংগে,
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে
কিন্তু পড়ে না (মা)।
বিপরীত রতাতুরা,
পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগল পারা।
লজ্জা ভয় আর মানে না মা॥"[১]

রামকৃষ্ণের গানগুলির মধ্যেও মাতৃপ্রেমের পাগলকরা সুধা মিশ্রিত থাকিত।...

একবার বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "তাঁহার চোখের একটিমাত্র চাহনি একটা মানুষের সমস্ত জীবনকে বদলাইয়া দিতে পারিত।"

বিবেকানন্দ একথা তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ (নরেন) একদা রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাঁহার সংশয়বাদকে ঘোরতর বিদ্রোহের সহিত তুলিয়া ধরিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণের অনির্বাণ অগ্নির স্পর্শে তিনি বিগলিত হইয়াছেন। বিবেকানন্দ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বিভিন্ন স্থলে।

পরাজয় স্বীকার করিলেন। রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন: "কোনো জীবন্ত বিশ্বাসকে মানুষ কেবল স্পর্শগোচর ভাবেই দান বা গ্রহণ করিতে পারে। এবং এই দান ও গ্রহণের মতো সত্য পৃথিবীতে আর কিছুই নাই।" রামকৃষ্ণের এই বাণী বিবেকানন্দের জীবনে সত্য হইয়াছিল। রামকৃষ্ণের বিশ্বাস এমন কোমল অথচ দৃঢ় ছিল যে, তাঁহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই সকল তরুণের নিকট হইতে কঠিন প্রতিবাদ পাইলে তিনি কেবল মৃদুমন্দ হাসিতেন মাত্র; তিনি স্থির জানিতেন, ইহাদের এই অবিশ্বাস প্রভাতকালীন কুজ্ঝটিকার মতো, মধ্যাহ্ন সূর্যের আবির্ভাবের সংগে সংগে ছিন্নভিন্ন অপসারিত হইবে। যখন কালীপ্রসাদ অবিরাম অস্বীকারের দ্বারা রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন:

"বাছা, তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর?"

"না।"

"তুমি ধর্মে বিশ্বাস কর?"

"না। বেদে বিশ্বাস করি না, শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না। আমি আধ্যাত্মিক কিছুতেই বিশ্বাস করি না।"

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "বাছা, তুমি যদি একথা অন্য কোনো গুরুর নিকট বলতে তবে কি হোতো? আমি তেমন কিছুই করবো না। আমি জানি, এমন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আরো অনেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। নরেনকেই দেখ না। সে বিশ্বাস করে। তোমারও সন্দেহ ঘুচবে। তখন তুমিও বিশ্বাস করবে।"

এই কালীপ্রসাদই পরে রামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারশিষ্য অভেদানন্দ হইয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পাস-করা লোক, সংশয়ী, বহু অবিশ্বাসী এই ক্ষুদ্র মানুষটির স্পর্শ লাভ করেন। রামকৃষ্ণ গ্রাম্য চাষাড়ে ভাষায় তাঁহার সরল কথাগুলি বলিতেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরতর আলোকরশ্মি আত্মা ভেদ করিয়া মানুষের অন্তঃস্থলে গিয়া প্রবেশ করিত। তাঁহার নিকট যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদিগের মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার প্রয়োজন হইত না।

তিনি বলিতেন, "চক্ষুই মানুষের আত্মার জানালা।" তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই তাই চোখ দেখিয়া মানুষকে চিনিয়া ফেলিতেন। হয়তো মানুষের ভীড়ের মধ্যে কোনো লাজুক যাত্রী তাঁহাকে এড়াইয়া আত্মগোপন করিত, অমনি তিনি তাহার নিকটে সোজা গিয়া তাহার কি সংশয়, কি উদ্বেগ, কি গোপন বেদনা, তাহা ধরিয়া ফেলিতেন। তিনি কখনো বক্তৃতা দেন নাই। কখনো তিরস্কার করেন নাই।

কেবল একটিমাত্র কথা, একটুমাত্র হাসি, হাতের একটুখানি স্পর্শ, মানুষকে তাহার বহু-বাঞ্ছিত আনন্দ, বর্ণনাতীত শান্তি আনিয়া দিত। কথিত আছে, তিনি একটি যুবকের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ফলে যুবকটি বৎসরাধিক কাল ভাবাবিষ্ট তন্ময় অবস্থায় থাকেন। ঐ সময় যুবকটি কেবলই 'প্রভু! প্রভু!' বলিতেন।

ঠাকুর সকল কিছুই ক্ষমা করিতেন; কারণ, অপার করুণায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কেহ যখন ভগবৎ লাভে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, অথচ তিনি বুঝিতেন, এ জীবনে তাঁহার সে সৌভাগ্য লাভ ঘটিবে না, তখন তিনি তাঁহাকে অন্ততপক্ষে সেই দিব্যানন্দের পূর্বাস্বাদ দিতে চাহিতেন।

কোনো কথাই তাঁহার নিকট কথা মাত্র ছিল না; প্রতিটি কথাই ছিল কাজ, প্রতিটি কথাই ছিল বাস্তবতা।

তিনি বলিতেন:

"ভাইকে ভালোবাসার কথা বলিও না! ভাইকে ভালোবাসো! ধর্মমত ও মতবাদ লইয়া বচসা করিও না। সমস্ত ধর্ম এবং ধর্মমতই এক। সমস্ত নদী একই সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়। বহিয়া যাও এবং বহিয়া যাইতে দাও। প্রতিটি মহাপ্রবাহ ভূমির অবস্থা অনুসারেই—দেশ, কাল এবং পাত্র অনুসারে—আপনার গতিপথ প্রস্তুত করিয়া লয়। কিন্তু সমস্ত প্রবাহই জল-প্রবাহ।…বহিয়া চলো।… সমুদ্রের পানে বহিয়া চলো।…"

রামকৃষ্ণের আনন্দময় প্রবাহধারা আপনাকে সকল আত্মার গোচরীভূত করিত। তিনিই ছিলেন গতিশক্তি, তিনিই ছিলেন নিম্নভূমি, তিনিই ছিলেন প্রবাহ, অন্য সকল ক্ষুদ্র নদী উপনদী তাঁহার মহানদীর দিকেই ধাবিত হইত। তিনি ছিলেন জাহ্নবী।

১২

সমুদ্রসংগমে নদী

রামকৃষ্ণ ক্রমে সমুদ্রের নিকটবর্তী হইতেছিলেন। সমাপ্তি ঘনাইয়া আসিতে-ছিল। তাঁহার দুর্বল দেহ প্রায় প্রতিদিনই সমাধির আগুনে দগ্ধ হইতেছিল। কেবল তাহাই নহে, ক্ষুধিত জনতার নিকট অবিরাম আত্মদান করিয়া সে-দেহ ক্রমেই ক্ষয় পাইতেছিল। মাঝে মাঝে তিনি রাগী ছেলের মতো অভিমান করিয়া মাকে জানাইতেন, এই অগণিত যাত্রীর জনতা তাঁহাকে খাইয়া ফেলিতেছে। তিনি তাঁহার সরস ভংগিতে 'মা'কে বলিতেন:[1]

"এই লোকগুলিকে তুই এখানে কেন আনিস মা? এগুলো যে ভেজাল দুধের মতো, দুধের চেয়ে জল চতুর্গুণ। জল শুকোতে গিয়ে আগুনে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আমার চোখ যে জলে গেল! আর পারি না মা। স্বাস্থ্য গেল, শরীর গেল। এসব কাজ যদি করতে চাস, তবে তুই তা নিজেই কর্ না। (নিজের শরীরের দিকে) এটা যে ভাঙা ঢাক। যদি রাতদিন পেটাস, তবে কতোক্ষণ টিকবে এটা?"[2]

কিন্তু তবু তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। বলিতেন:

"একটি আত্মাকেও সাহায্য করার জন্য যদি আমাকে জন্ম জন্ম আসতে হয়, হোক না তা কুকুর-জন্ম, তবু তাতে আমার কষ্ট নাই।"

আরো বলিতেন:

"আমি একটি মানুষকেও সাহায্য করার জন্য এমন বিশ হাজার দেহত্যাগ করতে পারি। একটা মানুষকে সাহায্য করতে পারাও কি কম গৌরবের কথা?"[3]

এখন তিনি সমাধিস্থ হইবার জন্য নিজেকে তিরস্কার করিতেন। কারণ,

১ পিকার্ডি কিংবা বারগাণ্ডির অধিবাসীদের মতো মধ্যযুগীয় কোন কোন ধর্ম বিশ্বাসীরাও এমনি ভাষেই কথা বলিতেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ।

৩ বিবেকানন্দ-রচিত 'My Master' গ্রন্থ।

তাহাতে অনেকখানি সময় নষ্ট হইত; ঐ সময়টাতে তিনি অপর কাহাকেও সাহায্য করিতে পারিতেন। রামকৃষ্ণ বলিতেন:

"মাগো! আমাকে ঐ সুখের হাত থেকে রেহাই দে মা! আমাকে স্বাভাবিক ভাবে থাকতে দে; তাতে আমি জগতের আরো উপকার করতে পারবো।"

তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলিতে তাঁহার শিষ্যরা তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে যাত্রীদের নিকট হইতে সরাইয়া রাখিতেন; তখন তিনি বলিতেন, "আজ কেউ আমার সাহায্য নিতে চায় না, সে কি কম কষ্ট রে।"[১]

তাঁহার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত নেতা কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার পূর্বেই মারা যান। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অল্প পূর্বে রামকৃষ্ণ বাষ্পাকুল চোখে বলেন, "গোলাপ গাছটাকে মালী তুলে অন্যত্র লাগাচ্ছেন। তাঁর সুন্দর সুন্দর গোলাপের দরকার কিনা।"

পরে তিনি বলেন:

"আমার অর্ধেকটা মরে গেছে।"

তাঁহার বাকী অর্ধেক অংশ, যদি একথা বলা যায়, ছিল দীন-দুঃখী জনসাধারণ। পণ্ডিত ব্যক্তিরা রামকৃষ্ণকে যতোখানি পাইতেন, তাহার অপেক্ষা অধিক না হইলে, পণ্ডিতদের মতোই জনসাধারণের নিকটও রামকৃষ্ণ সহজলভ্য ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসরে তিনি এই দীনদুঃখী ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে তাঁহার প্রিয় শিষ্যদের মতোই অন্তরংগ মনে করিতেন। এই দীনদুঃখীদেরই একজন ছিলেন গোপালের মা। গোপালের মার কাহিনী ফ্রান্সিসক্যান কাহিনী-কিম্বদন্তী-গুলির মধ্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত:

ষাট বৎসরের বৃদ্ধা, বাল-বিধবা। তিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন এবং ত্রিশ বৎসরব্যাপী মাতৃত্বের অতৃপ্ত ক্ষুধার ফলে তিনি বাল-গোপালকেই পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারটি অবশেষে তাঁহার পক্ষে পাগলামিতে পরিণত হয়। রামকৃষ্ণের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই ভগবানে-ভরা রামকৃষ্ণের একটিমাত্র চাহনিতেই বাল-গোপাল গোপালের মার মধ্য হইতে নিঃসৃত হন। যিনিই রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিতেন তাঁহাকেই তিনি তাঁহার সস্নেহ করুণাধারায় সজীব করিয়া তুলিতেন। এই সন্তানহীনার অতৃপ্ত স্বপ্নকেও তিনি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিলেন এবং তাঁহার বুকে বাল-গোপালকে তুলিয়া দিলেন। সেই মুহূর্ত হইতে বালগোপালকে

[১] ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়-রচিত গ্রন্থ।

গোপালের মা আর কখনো হারান নাই। এখন হইতে গোপালের মা প্রার্থনা করা ছাড়িয়া দিলেন, প্রার্থনার কথা তাঁহার মনেও পড়িল না। কারণ, ভগবানের সহিত তাঁহার যোগাযোগের বিরাম ছিল না। গোপালের মা তাঁহার জপমালা গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন এবং দিবারাত্রি কেবলই ঐ শিশুর সহিত বকিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দুই মাস রহিল। অতঃপর তাহা ক্রমেই কমিয়া আসিল। এবার বালগোপাল কেবল ধ্যানেই তাঁহার নিকট দেখা দিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধার হৃদয় অপূর্ব আনন্দে ভরিয়া রহিল, রামকৃষ্ণ স্নেহভরে বৃদ্ধার এই সানন্দ অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নরেন (বিবেকানন্দ) আপনার বিচারবুদ্ধির গর্বে গর্বিত ছিলেন। তিনি এই সকল দিব্যদর্শনকে নির্বোধ এবং অসুস্থ দৃষ্টিভ্রম বলিয়া মনে করিতেন। রসিকতা করিয়া রামকৃষ্ণ নরেনকে তাঁহার গোপালের গল্প বলিবার জন্য গোপালের মাকে বলিলেন। বৃদ্ধা তখন অত্যন্ত শান্ত ভাবে তাঁহার পুত্রের সহিত আলাপ থামাইয়া নরেনকে শালিস মানিলেন, বলিলেন :

"তুমিই বলো না, বাছা! আমি তো মুখ্যু মেয়েমানুষ! আমি কিছুই বুঝি না। তুমি তো লেখাপড়া জানো। বলো না, একি সত্যি?"

নরেন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,

"হ্যাঁ মা, এ সত্যি।"

১৮৮৪ খৃস্টাব্দেই রামকৃষ্ণের স্বাস্থ্য ভয়ানকভাবে খারাপ হইয়া পড়ে। সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি তাঁহার বাম হাতটি ভাঙিয়া ফেলেন এবং তাহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে। তাঁহার মধ্যে একটি ভয়ানক পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি তাঁহার অশক্ত পংগু দেহ এবং সদাচঞ্চল আত্মাকে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন করেন। তিনি 'আমি'-র কথা আর বলিতেন না। তিনি আর 'আমি' ছিলেন না। তিনি নিজেকে বলিতেন, "এই"। অসুস্থ অবস্থায় রামকৃষ্ণ পূর্বাপেক্ষা তীব্রভাবে "ভগবানের লীলা অনুভব করিতে লাগিলেন। মানুষের মধ্যে ভগবান ক্রীড়া করিতে থাকেন।... মানুষ কঠিন হস্তে তাহার প্রকৃত সত্তাটিকে হঠাৎ ধরিয়া ফেলে এবং অবাক হইয়া চুপ করিয়া যায়; তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না; সে যেন অকস্মাৎ তাহার কোনো প্রিয়জনের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। শিব যখন নিজের প্রকৃত সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তখন তিনি চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন : 'আমি এইরূপ! আমি এইরূপ!' এবং আনন্দে নৃত্য করিতেছিলেন।"

পর বৎসর এপ্রিল মাসে তাঁহার গলায় ব্যথা হয়। অবিরাম কথা বলায় বা বিপজ্জনক সমাধিগুলির সময়ে গলায় যে দ্রুত রক্ত চলাচল হইত, ইহা নিশ্চয়

তাহারই ফলে।[১] যে সকল চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তাঁহারা রামকৃষ্ণকে কথা বলিতে এবং ভাবাবিষ্ট হইতে নিষেধ করেন; কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। বৈষ্ণবদের এক মহোৎসবে যোগদান করিয়া তিনি এমন ভাবে নিজেকে নিঃশেষিত করেন যে, সেখান হইতে ফিরিয়া তাঁহার ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পায়। তথাপি অতিথিদের সহিত সাক্ষাৎ তাঁহার থামে না; দিবারাত্রি তিনি তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতে থাকেন। অতঃপর একদিন তাঁহার গলায় প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হইল। ডাক্তাররা দেখিয়া বলিলেন, ক্যানসার। তাঁহার প্রধান শিষ্যরা তাঁহাকে সাময়িকভাবে কলিকাতায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একটি ছোটো বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। রামকৃষ্ণের স্ত্রী-ও এই গৃহের এক কোণে

১ কিন্তু এই রোগে তাহার অপেক্ষাও অধিক কিছু ছিল। কোনো কোনো বিখ্যাত খৃস্টান অতীন্দ্রিয়বাদীর* মতো তিনি অপরের ব্যাধি নিজে লইয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিতেন। একটি দিব্য দর্শনের ফলে রামকৃষ্ণ দেখেন, তাঁহার সর্বাংগ ক্ষতে ভরিয়া গিয়াছে। অপরের পাপের ক্ষত। "তিনি অপরের কর্মফল নিজের উপর গ্রহণ করেন।" এবং উহার ফলেই তাঁহার শেষ ব্যাধিটি হয়। তিনি মানব-সমাজের অপরাধের বোঝা নিজেই বহন করেন।

* বিখ্যাত সেণ্ট লিওডআইন। তাঁহাকে অপরের দৈহিক পীড়া বহন করিতে হইয়াছিল; সেণ্ট মার্গারেট-মেরী, বৈতরণীতে তিনি বেদনাকাতর আত্মাদের যন্ত্রণা গ্রহণ করেন; সিয়েনার সেণ্ট ক্যাথরিন এবং মেরী দ্য ভেল্লে; অপরে যাহাতে নরকে পতিত না হয়, সেজন্য তাঁহারা তাহাদের নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে চাহেন। এবং সেঁ ভেসাঁ দ্য পল; তিনি একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস অর্জনের উদ্দেশ্যে সাত বৎসরের জন্য নিজের ধর্মবিশ্বাস হইতে বঞ্চিত হন।

অপরের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সাধনের বিধি বিশুদ্ধ খৃস্টান ক্যাথলিক মতবাদ অনুসারে সংগত। ক্যাথলিক মতবাদ অনুসারে মানব-সমাজকে খৃস্টের অতীন্দ্রিয় দেহ মনে করা হয়। খৃস্ট নিজেই সে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ঋষি ইসাইয়া পূর্বেই মেশাইয়া (ত্রাণকর্তা) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন (তিপান্ন, ৫০)। তিনি বলেন, "তিনিই আমাদের উকিল, তিনিই আমাদের দুঃখের বহনকর্তা:... আমাদের অপরাধের জন্য তিনি আহত হইয়াছিলেন।...আমরা শান্তি নষ্ট করিয়াছিলাম বলিয়াই তাঁহার শান্তি নষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারই খণ্ডে আমরা সুস্থ হইলাম।" ক্রমে আত্মবলির এই ব্যাপারটিকে ক্যাথলিক চার্চ চিরদিনই বিশ্বমানবের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাই ঋষি বর্ণিত খৃস্টের জুডিয়া এবং প্রাচীন ভারতের মধ্যে চিন্তার একটি সহধর্মিতা রহিয়াছে। এই সহধর্মিতা বিশ্বাত্মার তাড়না হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে। উহা মানব-প্রকৃতির অতল গভীর হইতে উৎসারিত হইয়াছে। ("প্রভুর ভোজ" অনুষ্ঠিত করিবার কালে খৃস্ট যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সুপরিচিত কথাগুলিও লক্ষণীয়: "ইহা আমার রক্ত।...ইহা বহুর বহু পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ক্ষরিত হইয়াছে।" সেণ্ট ম্যাথিউ, ছাব্বিশ, ২৮।)

স্থান করিয়া লইলেন। অন্তরংগ শিষ্যরা রাত্রিতে দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশেরই অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদের সম্পত্তি বন্ধক দিয়া, ধারকর্জ করিয়া ঠাকুরের চিকিৎসার খরচ যোগাইতে লাগিলেন। এই চেষ্টার মধ্য দিয়া তাঁহাদের সম্পর্ক দৃঢ়তর হইল। ডাক্তার সরকার ছিলেন যুক্তিবাদী; তিনি রামকৃষ্ণের ধর্মমতে বিশ্বাস করিতেন না; এবং সেকথা তিনি অকপটে স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাঁহার রোগীর সংগে তাঁহার পরিচয় যতোই বাড়িল, তাঁহার শ্রদ্ধাও ততোই বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে বিনামূল্যে তিনি চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তিনি দিনে তিনবার করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার নিকট থাকিতেন।[১] (অবশ্য, এই প্রসংগে একথা বলা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাকে সারাইয়া তুলিবার পক্ষে উহাই শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল না।) ডাক্তার সরকার রামকৃষ্ণকে বলেন:

নিজের দেহে অপরের ব্যাধিকে গ্রহণ করার এবং তাহারা কতক পরিমাণে শুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়ার ধারণাটি ভারতে প্রাচীন কাল হইতেই রহিয়াছে। আমি এ সম্পর্কে স্বামী অশোকানন্দকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি প্রাচীন শাস্ত্রাদি (মহাভারত আদি পর্ব, ৮৪ অধ্যায় এবং শান্তি পর্ব ২৮১ পরিচ্ছেদ), বুদ্ধের বাণী এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যের জীবন হইতে বহু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। সমস্ত সাধকেরই অবশ্য এই শক্তি থাকে না। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে এই শক্তি কেবল অবতারগণের বা মহাপুরুষদের ও তাঁহাদের পার্শ্বচরদের থাকে। সাধক এবং সাধুসন্তরা সিদ্ধিলাভ করিলেও এই শক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। আজকাল অবশ্য কুসংস্কারসম্পন্ন জনসাধারণ সকল সাধু-সন্ন্যাসীকেই এ শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে নিরাময় করাইবার জন্য সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে আসেন। (যীশুর নিকটও তাঁহারা এইরূপ আসিতেন।) ব্যাধি গ্রহণের এই বিশ্বাস ভারতে এখনো যথেষ্টরূপে প্রচলিত দেখা যায়। ইহারই অন্যতম ফল হইল তথাকথিত গুরুগ্রহণ: যখন কোনো সাধক শিষ্য গ্রহণ করেন, তখন তিনি শিষ্যকে কেবল আধ্যাত্মিক সাধনাই শিক্ষা দেন না, শিষ্যের কোনো কর্মফল বা পাপ যদি তাহার সাধনার অন্তরায় হয়, সেগুলিকেও তিনি গ্রহণ করেন। তাই গুরুকে শিষ্যের প্রতিটি কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়; কারণ, কোন কর্মকে কেহ নিষ্ফল করিতে পারে না; কর্ম কেবল একের উপর হইতে অন্যের উপর স্থানান্তরিত করা চলে।—বর্তমান ভারতবর্ষেও মহাপুরুষদের মধ্যে অপরের মারফৎ এই পাপ-পরিশোধের ধারণাটি কিরূপ বদ্ধমূল রহিয়াছে, অশোকানন্দ তাহা দেখাইবার জন্য বলেন: "ইহা আমাদের নিকট 'থিওরি' মাত্র নহে। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত শিষ্যরা গুরুরূপে কিম্বা সাধনার স্পর্শ দ্বারা নিজেদের উপর অপরের অপরাধকে গ্রহণ করিতেন। এইরূপে তাঁহারা যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, সেকথা তাঁহারা প্রায়ই বলিতেন।

১ কয়েকটি সমাধির সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমাধিগুলিকে চিকিৎসকের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন। ডক্টর সরকার এ বিষয়ে যে সকল 'নোট' রাখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিশেষ উপকারে আসিবে। জানা গিয়াছে, স্টেথেস্কোপের সাহায্যে সমাধি অবস্থায় তাঁহার বুক এবং চোখ পরীক্ষা করিয়া সেগুলিতে মৃতাবস্থার সমস্ত লক্ষণই পাওয়া যায়।

"আপনার ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠার জন্যই আমি আপনাকে এতো ভালোবাসি। আপনি যাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, মুহূর্তের জন্যও লেশমাত্র আপনি তাহা হইতে বিচ্যুত হন না।...ভাবিবেন না, আমি আপনার তোষামোদ করিতেছি। আমার বাবা যদি ভুল করিতেন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে তাহা বলিতাম।" শিষ্যরা যে রামকৃষ্ণকে এই ভাবে পূজা করেন, প্রকাশ্যে তিনি তাহার নিন্দা করেন:

"নিরাকার ভগবান মানুষের আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই কথা বলার ফলেই সমস্ত ধর্ম বিনষ্ট হইয়াছে।"

রামকৃষ্ণ মৃদু হাস্যে নীরব থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যরা এই সকল আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিতেন; ফলে তাঁহাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্কটি ক্রমেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিত। যন্ত্রণার মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ যেন আরো দিব্য জ্যোতি লাভ করিতেছিলেন। এবং তাঁহার প্রতি তাঁহার শিষ্যদের বিশ্বাস ক্রমেই সবল হইতে সবলতর হইয়া উঠিতেছিল। কেন এইরূপ পরীক্ষা তাঁহাদের গুরু-দেবের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহারা সকলেই চেষ্টা করিতেন এবং বিভিন্ন মত পোষণকরিতেন। এইরূপে কয়েকটি ছোটোখাটো দলগড়িয়া উঠিল। উদ্ধার-প্রাপ্ত পুরাতন পাপী গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে একদল ঘোষণা করিলেন যে, ঠাকুর এই রোগ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, ইহার ফলে তাঁহাকে ঘিরিয়া প্রচার-শিষ্যদের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়িয়া উঠিতে পারিবে। যুক্তিবাদীরা বলিলেন, ঠাকুরের দেহও অন্যান্য মানুষের মতোই প্রকৃতির বিধানের বশবর্তী। এই দলের মুখপাত্র ছিলেন নরেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই মুমূর্ষু মানুষটির মধ্যে একটি দিব্য উপস্থিতিকে স্বীকার করিলেন। শারদীয়া কালীপূজার দিন রামকৃষ্ণ সমস্ত দিনই সমাধিতে নিমগ্ন রহিলেন। অথচ, শিষ্যরা বিস্মিত হইলেন, সে সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট কিছুই বলেন নাই। তাঁহারা বুঝিলেন, কালী তাঁহার মধ্যেই বাস করিতেছেন![১] এইরূপ বুঝার ফলে যে আনন্দ উত্তেজনা দেখা দিল তাহার

১ এই ভগবৎ-দৃপ্ত মানুষটিকে দেখিবার জন্য তখনো লোকে ভীড় করিয়া আসিতেছিল। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে উত্তর ভারত হইতে একজন খৃস্টান, প্রভুদয়াল মিশ্র তাঁহাকে দেখিতে আসেন। তিনি রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। আপাতঃবিরুদ্ধ মতাবলম্বী মানুষদের স্বীকৃতিগুলি-ও যখন এই ভারতীয় আত্মার মধ্য দিয়া পরিশ্রুত হইত, তখন কি ভাবে যে সেগুলিকে এই সমন্বয়ী মনোভাব তাহার সর্বগ্রাহী আবহাওয়ায় আবৃত করিত, তাহারই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই ভারতীয় খৃস্টানটি একই সংগে যে খৃস্ট এবং রামকৃষ্ণে বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত আলাপের সময়ে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন:

বিপদও কম ছিল না। উত্তেজিত ভাবপ্রবণতাই ছিল এই বিপদগুলির মধ্যে প্রধান। শিষ্যরা উচ্চ হাসি-কান্না এবং গানের সহিত ভাবাবেশ ও দিব্যদর্শন লাভ করিলেন—অথবা লাভ করিবার ভাণ করিলেন। নরেন এবার সর্বপ্রথম তাঁহার যুক্তির ও ইচ্ছাশক্তির বলিষ্ঠতা দেখাইলেন। তিনি ঘৃণার সহিত ঐ সকল শিষ্যকে বলিলেন: "ঠাকুর যে সমাধিশক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাহার মূল্যরূপে তাঁহাকে সমগ্র জীবন কৃচ্ছ্র সাধন ও জ্ঞানের জন্য প্রাণ-পণ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। তাঁহারা যদি মিথ্যাকথা না বলেন, বা ভাণ না করেন, তবে তাঁহাদের ঐ সকল উত্তেজিত ভাবাবেশ অসুস্থ মস্তিষ্কের বাষ্পাচ্ছন্নতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহারা অসুস্থ, তাঁহাদের নিজেদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। তাঁহাদের বেশী পরিমাণে আহার করা এবং এই সকল হাস্যকর নারীসুলভ মৃগী-রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত। সতর্ক হইতে হইবে! ভাবানুভূতির আতিশয্য প্রকাশের বিষয়ে যে-ধর্ম উৎসাহ দিয়াছে, তাহাতে শতকরা আশী জন লোক ব্যভিচারী উচ্ছৃঙ্খল এবং শতকরা পনের জন লোক উন্মাদ হইয়া গিয়াছে।" নরেনের কথাগুলি ঔষধের ন্যায় কাজ করিল। অনেকে লজ্জিত হইলেন, অনেকে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহারা ভাণ করিতেছিলেন। কিন্তু ইহাতেই নরেন বিরত হইলেন না। তিনি এই সকল তরুণকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের উপর সবল সংযম আরোপ করিলেন। তাঁহাদের কাজ করিবার প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য লইয়া কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে পরামর্শ দিলেন। এইরূপে সেদিন এই সিংহশাবক নিজেকে রামকৃষ্ণ মিশনের ভবিষ্যৎ সম্রাটরূপে আগাইয়া দিলেন। অবশ্য, তখনও তিনি অসুযোগ অসুবিধা এবং সংগ্রামের হাত হইতে নিজেও মুক্ত ছিলেন না। এই দিনগুলি তাঁহার কাছে ছিল নিরাশ সংকটের দিন। এখনই তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃতির দ্বন্দ্বমান বিরুদ্ধ শক্তিগুলির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে। তাই এই দিনগুলি

খৃস্টান: "সমস্ত জীবের মধ্য দিয়াই ভগবান আপনার জ্যোতি বিকিরণ করেন।"

রামকৃষ্ণ: "ভগবান এক। হাজারো তাঁহার নাম।"

খৃস্টান: "যীশু কেবল মেরীর পুত্র নহে। তিনি স্বয়ং ভগবানও।" (শিষ্যগণের প্রতি ফিরিয়া রামকৃষ্ণের প্রতি অংগুলি সংকেত করিয়া) "এই যে মানুষটিকে আপনাদের সম্মুখে দেখিতেছেন, ইনি মাঝে মাঝে স্বয়ং ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু সে ভগবানকে আপনারা চিনিতে পারিতেছেন না।"

সাক্ষাতের শেষে রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলেন যে, ভগবানকে পাওয়ার জন্য তাঁহার যে গভীর ইচ্ছা রহিয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবে। এবং খৃস্টানটি নিজেকে রামকৃষ্ণের নিকট উৎসর্গ করেন।

তাঁহার জীবনে ছিল হলকর্ষণের দিন। শস্য-বপনের দিন। ভাবী শস্যসঞ্চয়নের জন্য আত্মার প্রস্তুতির দিন।

ক্রমেই রামকৃষ্ণের অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। ডক্টর সরকার তাঁহাকে কলিকাতা হইতে গ্রামে লইয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাঁহাকে শহরের উপকণ্ঠে কাশীপুরের একটি বাগান-বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। এখানেই রামকৃষ্ণ তাঁহার মর্ত্য জীবনের শেষ আট মাস অতিবাহিত করেন। তাঁহার নির্বাচিত দ্বাদশ জন শিষ্য শেষ অবধি তাঁহার কাছেই থাকিতেন।[১] নরেন তাঁহাদের উপাসনা এবং কার্যকলাপ সমস্তই পরিচালনা করিতেন। স্বাস্থ্যলাভের জন্য ঠাকুর যাহাতে প্রার্থনায় নিজে অংশ গ্রহণ করেন, সেজন্য তাঁহাকে শিষ্যরা অনুরোধ করিতেন। তাঁহাদেরই মতাবলম্বী একজন পণ্ডিত ঐ সময় রামকৃষ্ণকে দেখিতে আসেন। ফলে, শিষ্যরা তাঁহাদের অনুরোধটা আবার নূতন করিয়া শুরু করেন।

পণ্ডিত রামকৃষ্ণকে বলিলেন, "শাস্ত্রে বলে, আপনাদের ন্যায় সাধু ব্যক্তিরা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিজেকে রোগমুক্ত করতে পারেন।"

রামকৃষ্ণ জবাব দিলেন :

"আমি আমার মন চিরদিনের জন্য ভগবানকে দিয়াছি। তুমি কি তা ফিরিয়ে নিতে বল ?"

স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা না করায় শিষ্যরা রামকৃষ্ণকে তিরস্কার করেন। রামকৃষ্ণ বলেন, "তোরা কি ভাবিস, আমি ইচ্ছা ক'রেই কষ্ট পাচ্ছি ? আমি তো সেরে উঠতেই চাই ; কিন্তু সেরে ওঠা না ওঠা, সে তো মার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।"

"তবে মার কাছে প্রার্থনা করুন।"

"প্রার্থনা করতে বলা তো সহজ, কিন্তু আমি যে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না"

নরেন কাকুতি করিয়া বলিলেন : "আমাদের জন্যেও না ?"

ঠাকুর মধুর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ ! চেষ্টা ক'রে দেখবো। দেখি, কি করতে পারি।"

১ নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন, লাটু, তারক, দুই গোপাল, কালী, শশী ও শরৎ। রামকৃষ্ণ বলেন, তাঁহার অসুস্থতার ফলে তাঁহার শিষ্যরা দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন : অন্তরংগ এবং বহিরংগ।

শিষ্যরা তাঁহাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য একাকী রাখিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর বলিলেন :

"আমি তো মাকে বললাম, 'মা আমি যে রোগের যন্ত্রণায় আর কিছু খেতে পারছি না। কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করে দে মা!' মা তোদের সবাইকে দেখিয়ে বললে, 'কেন, এতোগুলোর মুখ দিয়ে তুই খেতে পারিস না?' ভারী লজ্জা হোলো। আর কিছুই বলতে পারলাম না।"

কয়েকদিন-বাদে তিনি বলেন[১] :

"আমার মাস্টারি প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছি। লোককে শেখাবার মতো আর আমার কিছু নেই। কারণ, এখন দেখছি জগতের সব কিছুই রামময়। তাই নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কাকে শেখাবো আমি?"

১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে তাঁহাকে ঈষৎ সুস্থ মনে হয়। তিনি কয়েক পা ঘুরিয়া বেড়ান; এবং শিষ্যদের সকলকে আশীর্বাদ করেন।[২] শিষ্যদের উপর তাঁহার আশীর্বাদের ক্রিয়া বিভিন্ন ভংগীতে প্রকাশ পায়—নীরব সমাধিতে বা সরব আনন্দোচ্ছ্বাসে। কিন্তু সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, তাঁহারা এই আশীর্বাদ বৈদ্যুতিক স্পর্শজাত অতিরিক্ত শক্তির ন্যায় লাভ করেন। ফলে অকস্মাৎ একটি মুহূর্তেই যেন তাঁহারা তাঁহাদের স্ব-নির্বাচিত ভবিষ্যৎ আদর্শকে নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিতে পারেন। ধর্ম-নেতা হিসাবে রামকৃষ্ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল তিনি শিষ্যদিগকে কখনো সুনির্দিষ্ট কোনো মতবাদ দিতেন না। তিনি দিতেন সেই মতবাদকে অর্জন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি। বলা চলে, তিনি একটি আধ্যাত্মিক ডাইনামোর (শক্তি উৎপাদক যন্ত্রের) ন্যায় কাজ করিতেন। বাগানে ঠাকুর শিষ্যদিগকে আশীর্বাদ করিলে তাঁহারা আনন্দের আতিশয্যে গৃহে উপস্থিত সকলকেই বাগানে আসিয়া ঠাকুরের আশীর্বাদ লইতে ডাকিলেন। এই প্রসংগে একটি ঘটনা ঘটে, উহা খৃস্টান গস্‌পেলের (খৃস্টের জীবন ও বাণীর) মধ্যে অবহেলায় স্থান পাইতে পারিত। ঠাকুরের অনুপস্থিতির সুযোগে লাটু এবং শরৎ তাঁহার ঘর গুছাইয়া তাঁহার বিছানা পরিষ্কার করিতেছিলেন। তাঁহারা উপর হইতে এই

১ 'ম'-র (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) মত অনুসারে এই ঘটনাটি ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ঘটে। 'ম' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২য় ভাগে এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২ কথিত আছে, প্রত্যেকেই যথাযোগ্য আশীর্বাদ লাভ করেন।

ডাক শুনিলেন এবং সমস্ত দৃশ্যটি দেখিলেন ; কিন্তু তাঁহারা এই আনন্দে অংশ গ্রহণ করিতে না আসিয়া কাজ করিয়া চলিলেন।

একাকী নরেনের তৃপ্তি ছিল না। পিতৃশোক, সাংসারিক দুর্ভাবনা এবং হৃদয়ের জ্বালা তাঁহাকে পলে পলে ক্ষয় ও ক্ষীণ করিতেছিল। তিনি অন্য সকলকেই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে দেখিলেন এবং নিজেকে পরিত্যক্ত অনুভব করিলেন। তাঁহার বেদনায় সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না ; ছিল না সাহস দিবার মতো, প্রফুল্লিত করিবার মতো কিছু আশা। কয়েক দিনের জন্য সমাধিস্থ করিয়া তাঁহাকে এই দুঃখ-যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য তিনি রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে ঠাকুর তাঁহাকে কঠোর ভাবে তিরস্কার করিলেন। (তিনি যাহার নিকট হইতে সর্বাপেক্ষা অল্প আশা করিতেন, তিনি তাহাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশয় দিতেন।) পরিবারের একটা কিছু সুব্যবস্থা হইয়া গেলে তাঁহার দুঃখ-কষ্ট সব ঘুচিয়া যাইবে, এবং তিনি সমস্তই পাইবেন, এই ধরণের "হীন ধারণার" জন্য রামকৃষ্ণ তাঁহাকে গালি দিলেন। নরেন পরিত্যক্ত পথহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; মলিন অপরিচ্ছন্নভাবে পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইলেন ; যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আর্তনাদ করিলেন ; এক অনধিগম্যকে আয়ত্ত করার তীব্র বাসনায় তাঁহার দেহ মন ক্ষয় হইল ; তিনি কোথাও বিন্দুমাত্র শান্তি পাইলেন না। তাঁহার এই উদ্‌ভ্রান্ত গতিবিধি রামকৃষ্ণ দূর হইতে সস্নেহ করুণায় লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ; তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন স্বর্গীয় শীকারটিকে আয়ত্ত করিবার পূর্বে তাহার গন্ধ পাইতে হইবে। রামকৃষ্ণ অনুভব করিতেন, নরেনের অবস্থায় উদ্বেগের কিছুই নাই, তিনি তাঁহার অবিশ্বাস সম্পর্কে বড়াই করিয়া বেড়াইলেও আসলে অসীমের গৃহে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন কেবলই কেমন করিতেছে। তিনি যে মানুষের মধ্যে দেবতার বর লাভ করিয়াছেন, রামকৃষ্ণ তাহা জানিতেন। রামকৃষ্ণ অন্যান্য শিষ্যদের সম্মুখে আদর করিয়া নরেনের মুখ মুছাইয়া দিতেন। তিনি তাঁহার মধ্যে ভক্তির—প্রেমের মধ্য দিয়া জ্ঞানের—সকল চিহ্নই দেখিতে পাইতেন। ভক্তরা জ্ঞানীদের ন্যায় মুক্তি কামনা করেন না। তাঁহাদিগকে মানুষের কল্যাণের জন্য বারে বারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কারণ, তাঁহারা মানুষকে ভালোবাসিবার জন্য, মানুষের সেবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত পরমাণু মাত্র বাসনা অবশিষ্ট থাকিবে, ততোক্ষণ তাঁহাদিগকে বারে বারে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। মানুষের হৃদয় হইতে বাসনাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিলেই তবে তাঁহারা মুক্তি পাইবেন। কিন্তু ভক্তরা নিজেরা কখনো মুক্তির জন্য লালায়িত হন না।

ঠাকুরের মন কখনো কাহাকেও ভুলিতে পারিত না। তাঁহার মনে সকল জীব বাসা বাঁধিয়াছিল। তাই তিনি সর্বদা ভক্তদেরই অধিক ভালোবাসিতেন। এবং নরেন ছিলেন সেই ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।[১]

তিনি যে বিবেকানন্দকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনে করেন, একথা রামকৃষ্ণ গোপন করিতেন না। তিনি একদিন নরেনকে বলিলেন:

"আমি এই ছোকরাদের তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমি এদের মানসিক আধ্যাত্মিক উন্নতির কাজে লাগো।"

আশ্রমিক জীবন যাত্রার প্রস্তুতির জন্য রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদিগকে জাতি-নির্বিশেষে সকলের দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। মার্চের শেষাশেষি তিনি তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসের চিহ্ন গৈরিক পরিচ্ছদ, এবং সন্ন্যাসীর এক প্রকার দীক্ষা দিলেন।

দাম্ভিক নরেন ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিকতার

---

১ "জ্ঞানী মায়াকে বর্জন করেন। মায়া একটি আবরণের মতো। (জ্ঞানী এই আবরণকে অপসারিত করেন।) দেখ, আমি যখন এই রুমালটা প্রদীপের সামনে ধরি, তখন প্রদীপের আলো আর দেখা যায় না।" অতঃপর ঠাকুর তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যস্থলে রুমাল তুলিয়া ধরিলেন, "এখন তোমরা আমার মুখ দেখিতে পাইতেছ না।"

ভক্ত মায়াকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি মহামায়ার পূজা করেন। তিনি মহামায়ার নিকট নিজেকে সমর্পণ করিয়া বলেন, 'মা, তুমি আমার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াও। তুমিই পথ করিয়া দিলে ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি।"

"জাগ্রতাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং গভীর নিদ্রাবস্থা—এই তিনটি অবস্থাকেই জ্ঞানী অস্বীকার করেন। কিন্তু ভক্ত এই সকল অবস্থাকে গ্রহণ করেন।"

তাই যাঁহারা সকল কিছুকে, এমন কি মায়াকে গ্রহণ করেন, সকল কিছুকে স্বীকার করেন, ভালোবাসেন, কিছুকেই অস্বীকার করেন না, কারণ, মন্দ এবং মায়া সবই ভগবান, রামকৃষ্ণ স্বভাবসিদ্ধ-ভাবে তাঁহাদিগকেই অধিক পছন্দ করেন।

"আমি নিরাকার ভগবানকে দেখিয়াছি, একথা প্রথম হইতেই বলা ভালো নহে। নরনারী, জীবজন্তু, পত্রপুষ্প, আমি যাহাই দেখিতেছি, তাহাই ভগবান।"

পর্দার সহিত মায়ার তুলনা করিয়া যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অন্য সময়ে রাম ও সীতার কাহিনীর মধ্য দিয়া নীতিগল্পরূপেও রামকৃষ্ণ প্রকাশ করেন:

"রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। প্রথমে রাম, পরে সীতা এবং পশ্চাতে লক্ষ্মণ। সীতা দুই ভাই-এর মধ্যে ছিলেন, তাই লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। সীতা বুঝিলেন, রামের অদর্শন লক্ষ্মণকে পীড়া দিতেছে, তাই তিনি সস্নেহে মাঝে মাঝে পথ চলিবার সময় পাশের দিকে সরিয়া গেলেন, যাহাতে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে দেখিতে পান।"

গর্বকে পরিত্যাগ করিতে বেশ বেগ পাইতে হইল। শয়তান তাঁহাকে বৃথায় (যেমন সে যিশুকে চাহিয়াছিল) সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্য দিতে চাহিলেও, বিনিময়ে সে যদি তাঁহার আত্মার উপর কর্তৃত্ব চাহিত, তবে নরেন তাহাকে দূর করিতেন। একদিন নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার সংগী কালীপ্রসাদকে তাঁহার ধ্যানস্থ অবস্থায় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে বলেন। কালীপ্রসাদ তাঁহাকে স্পর্শ করিবার সংগে সংগেই নরেনের অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। রামকৃষ্ণ এই সংবাদ শুনিয়া নরেনেকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, নরেন এইরূপে সাধারণ ছেলে-খেলা করিয়া মাটিতে বীজ নিক্ষেপ করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, এই ভাবে একের চিন্তাকে অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করাও রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। সত্তার পূর্ণ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিছু ঘটিলেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নিন্দা করিতেন। অন্যকে সাহায্য করিতে হইবে। কিন্তু একের চিন্তাকে অন্যের চিন্তার স্থানে আরোপ করিলে চলিবে না।

অল্পকাল বাদে নরেন ধ্যান করিবার সময় অনুভব করিলেন, তাঁহার মস্তকের পশ্চাদদেশে যেন কোনো জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। অকস্মাৎ তিনি অচৈতন্য হইলেন এবং পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া গেলেন। যে ভয়ংকর নির্বিকল্প সমাধিকে তিনি এতোদিন ধরিয়া লাভ করিবার জন্য এতো চেষ্টা করিতেছিলেন এবং রামকৃষ্ণ দিতে অস্বীকার করিতেছিলেন, নরেন আজ তাহারই গভীরে পতিত হইলেন। দীর্ঘক্ষণ বাদে যখন তিনি আত্মস্থ হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, তাঁহার দেহ নাই। রহিয়াছে কেবল মুখমণ্ডল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন "কই, আমার দেহ কই?" অন্যান্য ভক্তরা ভয় পাইয়া ঠাকুরের কাছে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ শান্তভাবে বলিলেন:

"বেশ তো, ঐ ভাবেই খানিকক্ষণ থাক না! আমাকে অনেক দিন ধ'রে বড্ড জ্বালাতন করছিল।"

নরেন যখন সম্পূর্ণরূপে আবার পৃথিবীতে ফিরিলেন, তখন তিনি অক্ষয় এক প্রশান্তিতে স্নাত ধৌত হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন:

"এবার তো মা তোমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যা দেখেছ, সে সব চাবিতালা দিয়ে তুলে রাখো। চাবিটা আমার কাছেই থাকবে। মার কাজ শেষ হ'লে আবার তুমি ফিরে পাবে।"

এই অবস্থায় পরবর্তী কিছুদিন স্বাস্থ্যের জন্য কি করা দরকার, রামকৃষ্ণ নরেনকে সে বিষয়েও উপদেশ দিলেন।

রামকৃষ্ণের শেষদিন যতোই ঘনাইয়া আসিতেছিল, ততোই তিনি অধিক নির্লিপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যদের বেদনার উপর তাঁহার প্রশান্তির স্বর্গকে বিছাইয়া দিতেছিলেন। "কথামৃত" একরকম তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বেই রচিত হইয়াছিল। তাই রাত্রিতে শিষ্যদের ভারাক্রান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে এই প্রবহমান আত্মার মর্মর ধ্বনির প্রতিটি সংগীত যেন তাহাতে লিপিবদ্ধ হইতেছিল। বাগানে জ্যোৎস্নালোকে মৃদু দক্ষিণ সমীরণে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলি মর্মরিত হইতেছিল। তাঁহার সংগীরা, প্রিয় বন্ধুরা, যখন তাঁহার বিচ্ছেদের কথা ভাবিয়া কোনো মতেই সান্ত্বনা পাইতেছিলেন না,[১] তখন তিনি তাঁহাদিগকে অস্ফুটকণ্ঠে বলেন :

"রাধা কৃষ্ণকে বললেন : 'ওগো, তুমি আমার মনেই থাকো, মানুষের রূপে আর এসো না।' কিন্তু বললে কি হবে, প্রিয়কে মানুষের রূপে দেখবার জন্য তো পূর্ণ হওয়া চাই। তাই নররূপে কৃষ্ণ দীর্ঘকাল অবতীর্ণ হলেন না।...তারপর প্রভু এলেন এবং নররূপে অবতীর্ণ হলেন। তারপর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে[২] তিনি 'মা'র কোলে ফিরে গেলেন।

রাখাল চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তবে আমরা যতোক্ষণ না যাই, তুমি যেও না!"

রামকৃষ্ণ সস্নেহে মৃদু হাসিলেন। বলিলেন :

"একদল বাউল হঠাৎ একবার এক বাড়ীতে ঢুকে পড়লো। সেখানে তারা আনন্দে নাচলো, গাইলো, ভগবানের নাম করলো। তারপর যেমন তারা হঠাৎ

---

১ নরেনের আবেগময় অনুভূতিশীল আত্মা বেদনার এই দুর্বহ নিয়মের বিরুদ্ধে সহজে নীরব থাকিতে পারিতেছিলেন না। (হীরানন্দের সহিত ২২শে এপ্রিল তারিখে তাঁহার কথোপকথন দ্রষ্টব্য।)

"এই জগতের পরিকল্পনাটা শয়তানিতে পূর্ণ। আমি হইলে ইহার অপেক্ষা একটা ভালো জগৎ তৈয়ারী করিতে পারিতাম। এই বিশ্বাসই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা যে, আমিই সব কিছু করিতে পারি।"

সবিনয়ে হীরানন্দ জবাব দিলেন : "করার চেয়ে বলাটা কিন্তু অনেক সহজ।" অপার ভক্তিভরে তিনি পরে বলিলেন, "প্রভু, তুমিই সব কিছু। আমি নয়, তুমি।"

কিন্তু একগুঁয়ে দাম্ভিক নরেন বলিয়া চলিলেন : "তুমিই আমি এবং আমিই তুমি। আমি ছাড়া আর কিছুই নাই।"

রামকৃষ্ণ নীরব সহাস্যে কথাগুলি শুনিতেছিলেন। নরেনকে দেখাইয়া বলিলেন :

"ও যেন একটা খাঁড়া হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

২ হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, প্রত্যেকটি অবতারের সংগে তাঁহার নির্বাচিত একদল আত্মা, শিষ্য, ধরায় অবতীর্ণ হন।

এসেছিল, তেমন হঠাৎ আবার সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। বাড়ীর মালিক জানলো না, কে তারা।...”

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

“আমি মাঝে মাঝে ভগবানকে জানাই, তিনি যেন আর আমায় এই পৃথিবীতে না পাঠান।”

সেই সংগে তিনি বলিয়া চলিলেন :

“যারা তাঁকে (ভগবানকে) ভালোবাসে, সেই সব শুদ্ধাত্মাদের টানে তিনি নরাকারের নিত্য নূতন বেশ ধরে আসেন।”

রামকৃষ্ণ অপরিমেয় স্নেহের সংগে নরেনের দিকে তাকালেন।

৯ই এপ্রিল তারিখে রাত্রিতে হাত-পাখা নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ পাখার দিকে তাকাইয়া তিনি বলেন :

“এই যে পাখাটাকে আমার সামনে ধরে আছি, এটাকে আমি যেমন দেখছি, তেমনি ভগবানকেও দেখেছি।...এখনও আমি দেখছি।...”—তিনি অত্যন্ত অনুচ্চকণ্ঠে কথাগুলি কহিতেছিলেন। নরেনের হাতে হাত রাখিয়া কহিলেন, “কি বলছিলাম ?”

নরেন বলিলেন : “আমি স্পষ্ট শুনতে পাই নি।”

রামকৃষ্ণ এবার সংকেতে দেখাইলেন যে ‘তিনি’ (ভগবান) এবং তিনি নিজে অভিন্ন।

“হ্যাঁ”, নরেন বলিলেন, “আমিই তিনি।”

ঠাকুর বলিলেন, “তবে একটা কলি মাঝখানে আছে—আনন্দ উপভোগের জন্য।”

নরেন বলিলেন, “যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁরা মুক্তি লাভ ক’রেও এই জগতেই থাকেন। তাঁরা মানব জাতির মুক্তির জন্য অহমকে রেখে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেন।”

পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতায় খানিকক্ষণ কাটিল। ঠাকুর বলিলেন : “বাড়ির ছাদ[১] মানুষ

[১] ছাদের উপমাটি রামকৃষ্ণ প্রায়ই ব্যবহার করিতেন :

“অবতারেরা সমাধিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। সেই সংগে তাঁরা নরবেশে ধরায় অবতীর্ণ হন এবং পিতা বা মাতা ইত্যাদির রূপে ভগবানকে ভালোবাসেন। তাঁরা “নেতি’ নেতি’ ব’লে সিঁড়ি বে’য়ে কেবলই উঠতে থাকেন—যতোক্ষণ না ছাদে গিয়ে পৌঁছেন। তারপর ছাদে পৌঁছে বলেন, ‘ইতি’। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা বুঝতে পারেন, সিঁড়িগুলোও ছাদের ওই একই মশলা দিয়েই তৈরী। তখন তাঁরা সিঁড়ি দিয়ে ছাদে যখন-তখন ওঠা-নামা করেন, কখনো বা বিশ্রাম করেন, কখনো বা সিঁড়িতে এসে বসেন। ছাদ হোলো পরম ব্রহ্ম, আর সিঁড়িগুলো বিশ্ব-প্রকৃতি।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত. প্রথম ভাগ।)

দেখতে পায়, কিন্তু সেখানে পৌঁছা বড়ো কঠিন।...কিন্তু কেউ যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছে, সে নিচে দড়ি ফেলে দিয়ে টেনে অন্যান্য সবাইকে উপরে টেনে তুলে নেয়।"

যে সময় তিনি 'এক ও অদ্বিতীয়ের' মধ্যে সকল কিছুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন, তেমনি একটি সময় ছিল সেদিন। তিনি দেখিলেন, "বলি, যূপকাষ্ঠ এবং জহ্লাদ"—তিনই এক বস্তু। এবং দেখিয়া দুর্বল কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "ভগবান! একি দেখিলাম!" বলিয়াই তিনি ভাবাবেগে মূর্ছিত হইলেন। অতঃপর চৈতন্য হইলে বলিলেন: "আমি খুব সুস্থ আছি। এতো সুস্থ আমি কখনো ছিলাম না।"[১] যাঁহারা জানেন যে কী ভয়ংকর রোগে তিনি মরিলেন, (কণ্ঠদেশে ক্যানসার), তাঁহারা বিস্মিত হন যে, সস্নেহ করুণামাখা এই হাসিটুকু সর্বদাই তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। ভারতীয় ভক্তদের এই যিশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিবার গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলেও তাঁহার যন্ত্রণা ক্রুশের যন্ত্রণার অপেক্ষা অল্প তীব্র ছিল না।[২] তথাপি তিনি বলেন:

"দেহই কেবল কষ্ট পায়। মন যখন ভগবানে সংযুক্ত থাকে, তখন সে কোনো কষ্টই অনুভব করে না।"

আবার বলেন, "দেহ আর তার যন্ত্রণা পরস্পরকে ব্যস্ত রাখুক। মন, তুমি আনন্দে মজে থাকো। এখন আমি আর 'মা' চিরকালের জন্য একাকার হ'য়ে গেছি।"[৩]

---

১ শিষ্য রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। তিনি বলেন, তাঁহার হৃষ্ট ভাবটি মুহূর্তের জন্যও যায় নাই। তিনি সর্বদাই বলিতেন যে, তিনি সুস্থ ও সুখী। (রামকৃষ্ণানন্দের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা হইতে।)

২ স্বামী অশোকানন্দ আমাকে লিখিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরেই যে ফটোগ্রাফ তোলা হয়, তাহার এক কপি মাদ্রাজ মঠে আছে। ঐ সময় ঠাকুরের দেহ রোগের আক্রমণে এমন ভাবে বিনষ্ট হইয়াছিল যে, ঐ ফটোর পুনর্মুদ্রণ করা হয় নাই। দৃশ্যটি ভয়াবহ।

৩ রামকৃষ্ণ স্বীকার করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক হইলেও মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে নরেনের তাড়নায় তিনি অবশেষে বলেন:

"যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।"

তিনি আরো বলেন, "তোমাদের বেদান্তের অর্থে নয়।" (অর্থাৎ পরম ব্রহ্মের সহিত অহমের যে ঐক্য রহিয়াছে, সে অর্থে নয়, অবতার অর্থে।)

আমি অবতারে হিন্দুদের বিশ্বাস সম্পর্কে কোনো আলোচনা করিতে চাহি না। মানুষের বিশ্বাস লইয়া আলোচনা করা যায় না। এবং এই বিশ্বাসটি খৃস্টানদের 'ভগবৎ-মানুষের' (God man) বিশ্বাসের পর্যায়েই পড়ে। তবে পশ্চিম দেশীয়দের মন হইতে একটি ধারণাকে আমি দূর করিতে চাই। সরল রামকৃষ্ণের মতোই অন্যান্য যাঁহারা নিজেদের মধ্যে ভগবানের এই অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও

তাঁহার মৃত্যুর তিন চার দিন পূর্বে তিনি নরেনকে পাশে ডাকেন এবং তাঁহার সহিত একাকী থাকিতে বলেন। রামকৃষ্ণ সস্নেহে নরেনের দিকে তাকান এবং সমাধিস্থ হন। নরেনও সমাধিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। পরে সমাহিত ভাব কাটিলে নরেন দেখেন, রামকৃষ্ণ কাঁদিতেছেন। ঠাকুর নরেনকে বলেন:

"আজ তোকে আমি আমার সব দিয়ে দিলাম। আমার আর কিছু রইল না। আমি সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র। এই শক্তি নিয়ে তুই জগতে অশেষ মংগল করতে পারবি। সে মংগল সাধন শেষ না হ'লে তুই ফিরতে পারবি না।"[১]

ঐ মুহূর্ত হইতে তাঁহার সমস্ত শক্তিই নরেনে স্থানান্তরিত হইল। গুরু এবং শিষ্য এক হইলেন।

১৮৮৬ খৃস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট, রবিবার।...শেষ দিন।

সেদিন অপরাহ্ণেও তাঁহার যথেষ্ট শক্তি ছিল। তিনি ক্ষত-পীড়িত কণ্ঠ লইয়াও শিষ্যদের সহিত প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আলাপ করেন।[২] সন্ধ্যার দিকে তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হয়। সকলেই ভাবেন, মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু দুপুর রাত্রিতে

ভয়াবহ গর্বের ভাবটি কণামাত্র থাকিত না। অন্যান্য সময়ে রামকৃষ্ণকে যদি কেহ বলিতেন (১৮৮৪ খৃস্টাব্দে একজন শিষ্য এইরূপ করিয়াছিলেন), "যখন আমি আপনাকে দেখি, তখন ভগবানকে দেখি", তখন রামকৃষ্ণ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন, বলিতেন, "অমন কথা কখনো বোলো না! ঢেউ গঙ্গার অংশমাত্র, গঙ্গা ঢেউএর অংশ নয়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ।) "গঙ্গার কাছে ঢেউ যেমন, অবতাররাও ব্রহ্মের কাছে তেমন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী)। রামকৃষ্ণ ভাবিতেন যে, তাঁহার মধ্যে ভগবান বাস করেন। এবং 'তিনি' (ভগবান) রামকৃষ্ণের মত্য দেহের অন্তরালে থাকিয়া ক্রীড়া করেন। "অবতারকে বোঝা সহজ নয়—উহা সসীমের উপর অসীমের ক্রীড়া মাত্র। (পূর্বোল্লিখিত পুস্তক।) অধিকাংশ মানুষের মধ্যে, "এমন কি সাধু-সন্তদের মধ্যেও" এই স্বর্গীয় অতিথিটি "নিজেকে প্রকাশ করেন—মধু যেমন প্রকাশ করে আপনাকে ফুলের মধ্যে। ফুল চুষিয়া মধুটুকু খাইতে হয়—অবতারের মধ্যেও তেমনি মধু থাকে।" (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ)। "সমস্তই এক, কারণ, অবতার সর্বদাই এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন স্থানে আত্মপ্রকাশ করেন মাত্র। যথা কৃষ্ণ, খৃস্ট ইত্যাদি।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ) খৃস্টের নামটি আমাদের আর একটি নৈতিক দিকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যে নৈতিক দিকটা অবতারদের অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। 'ফুল', 'মধু' এবং 'আনন্দ,' এই কথাগুলি দিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিলে চলিবে না। ভগবান যখন অবতার হন, তখন সর্বদাই স্বর্গীয় আত্মোৎসর্গের দিকটা বর্তমান থাকে, যেমন খৃস্টের বেলায়। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)।

১ বুঝিতে হইবে "পরম ব্রহ্মে"।

২ যোগ সম্বন্ধে।

পুনরায় তাঁহাকে জীবিত দেখা যায়। শিষ্য রামকৃষ্ণানন্দের দেহের উপর পাঁচ-ছয়টি বালিশ হেলান দিয়া তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রিয় শিষ্য নরেনের সহিত আলাপ করেন এবং অনুচ্চস্বরে তাঁহার শেষ উপদেশগুলি দিয়া যান। তারপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে তিনবার তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু "কালীর" নাম উচ্চারণ করেন ও এলাইয়া পড়েন। এবার শেষ সমাধি শুরু হয়। পরদিন মধ্যাহ্নের পূর্বে আধঘণ্টা পর্যন্ত এই সমাধিস্থ অবস্থা থাকে। তারপর মৃত্যু ঘটে।[১] তাঁহার নিজের কথায়—"তিনি এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে চলিয়া যান।"

শিষ্যরা সকলে চৎকার করিয়া উঠেন:

"জয়, ঠাকুরের জয়!"[২]

১ সরকারের সাক্ষ্য অনুসারে। (রামকৃষ্ণানন্দের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য)

"শেষ দিন রামকৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত আমাদের সহিত আলাপ করেন।...তিনি আমার দেহের উপর পাঁচ ছয়টি বালিশে ভর করিয়া বসেন। আমি বাতাস করিতেছিলাম। নরেন্দ্র তাঁহার পা লইয়া টিপিয়া দিতেছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছিলেন। কহিতেছিলেন, কি করিতে হইবে। তিনি বারে বারে বলেন, "এই ছেলেদের সাবধানে দেখো"...তারপর তিনি শুইতে চান। অকস্মাৎ একটা বাজিলে তিনি একপাশে গড়াইয়া পড়েন। তাঁহার গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে।...নরেন তাড়াতাড়ি তাঁহার পা লেপে ঢাকিয়া ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া যান। এ দৃশ্য তিনি সহিতে পারিতেছিলেন না। ডাক্তার নাড়ী দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, নাড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছে।...আমরা সকলে ভাবিলাম উহা সমাধি।"

২ ঐ দিন শ্মশানে শবদাহের জন্য যখন শিষ্যরা তাঁহার দেহ বহিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন বলিতেছিলেন: "জয় ভগবান রামকৃষ্ণের জয়!"

পরিশিষ্ট

মানুষটি আর নাই। কিন্তু তাঁহার আত্মা মানুষের সমাজগত জীবনের শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছে।

অবিলম্বে শিষ্যরা সংঘবদ্ধ হইলেন। ঠাকুরকে শেষ কয়েক মাস দেখিবার পর তরুণ শিষ্যদের পক্ষে পুনরায় সংসারে ফেরা অসম্ভব হইল। তাঁহারা সকলেই ছিলেন নিঃসম্বল। কিন্তু চারিজন শিষ্য বিবাহিত ছিলেন: বলরাম বসু—ইঁহার নিকট সাময়িক ভাবে রামকৃষ্ণের দেহাবশেষ গচ্ছিত ছিল; সুরেন্দ্রনাথ মিত্র; মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত; এবং নাট্যকর ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইঁহারা চারিজনে অন্যান্য শিষ্যদিগকে একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিবার জন্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। গঙ্গার নিকটে বরানগরে একটি অর্ধভগ্ন গৃহ ভাড়া লইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্র অর্থ সাহায্য করিলেন। ইহাই শিষ্যদের প্রথম মঠ বা আশ্রম হইল। এখানে আরও দশ পনেরো জন শিষ্য সন্ন্যাসীর নাম গ্রহণ করিয়াই যোগদান করিলেন; তাঁদের প্রকৃত নাম ভবিষ্যৎ জনসাধারণের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গেল। যিনি ছিলেন নরেন, যিনি চিরকালের জন্য বিবেকানন্দ[১] নামে পরিচিত হইলেন, তাঁহাকেই সকলে সম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত করিলেন। তাঁহার শক্তি, উৎসাহ এবং বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ঠাকুর নিজেও তাঁহাকেই নির্বাচিত করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য সকলে স্মৃতি ও শোকের নেশায় ঝিমাইতে এবং নিজেদিগকে নির্জনে অবরুদ্ধ রাখিতেই প্রলুব্ধ হইলেন। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য বিবেকানন্দ ওই প্রলোভনের মোহ এবং উহার বিপদ কি তাহা সকলের অপেক্ষা অধিক জানিতেন। তিনি ইঁহাদের শিক্ষার ও পরিচালনার ভার লইলেন। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যস্থলে তিনি একটি অগ্নি আবর্তের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদের সকলকে বেদনা এবং সমাধির তন্দ্রা হইতে জাগ্রত করিলেন; তিনি তাঁহাদিগকে বহির্জগতের চিন্তার সহিত সুপরিচিত হইবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করিলেন; নিজের বিপুল বুদ্ধির বন্যায় তাঁহাদিগকে সতেজ ও সবল করিয়া তুলিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব—জ্ঞানবৃক্ষের সকল শাখা-প্রশাখার ফলের আস্বাদ গ্রহণ করাইলেন। তিনি চাহিলেন, ইঁহারা সকলেই একটি বিশ্বগত ব্যাপক

১ তিনি কয়েক বৎসর বাদে এই নাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী খণ্ডে এই নামের জন্মকথা আমি বর্ণনা করিব।

দৃষ্টির অধিকারী হউন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার পবিত্র বহ্নিশিখাকে মুহূর্তের জন্যও বিরাম না দিয়া তিনি ইঁহাদিগকে আলোচনার পর আলোচনায় পথ দেখাইতে লাগিলেন।

১৮৮৬ খৃস্টাব্দের বড়দিনে এই ভগবৎ-মানুষদের জন্মের বিধি স্বাক্ষরিত হইল। কাহিনীটি কৌতুহলোদ্দীপক। কারণ, ইহাতে পাশ্চাত্যের 'বো দিউ'[1] এবং প্রাচ্যের বাণীর মধ্যে এক অপূর্বভাবিত মিলন ঘটিল।

তাঁহারা আঁটপুরে জনৈক শিষ্যের (বাবুরাম) মার গৃহে সকলে সমবেত হইলেন।

"রাত্রি গভীর হইল। সন্ন্যাসীরা ধুনির চারিদিকে আসিয়া জড় হইলেন। তাঁহারা বড় বড় কাঠের চেলা লইয়া আসিয়াছিলেন, সেগুলি ধুনীতে দেওয়া হইল। শীঘ্রই ধুনীর আগুন দাউ দাউ করিয়া উর্ধ্বমুখে উঠিতে লাগিল। দূরে চারিদিকের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিল এবং এই বৈপরীত্যে একটি অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইল। মাথার উপরে ভারতীয় রাত্রির আকাশ চন্দ্রাতপ রূপে দিগন্তে ব্যাপ্ত রহিল। চারিদিকে গ্রামের এক গভীর নৈঃশব্দ্য ও প্রশান্তি বিরাজ করিতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া ধ্যান চলিল। তারপর নেতা (বিবেকানন্দ) যিশুর কাহিনী দিয়া সেই নৈঃশব্দ্যকে ভরিয়া তুলিলেন।[2] একেবারে প্রথম হইতে, সেই বিস্ময়কর জন্মের প্রহেলিকা হইতে, কাহিনী শুরু হইল। যিশুর আবির্ভাবের বার্তা যখন মেরী মায়ের নিকট ঘোষিত হইল, তখন তিনি যে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীরাও তাহার অংশভাগী হইলেন।...যিশুর শৈশবের সেই দিনগুলিতেও যিশুর সান্নিধ্যে সন্ন্যাসীদের কাটিল। যিশুর সংগে তাঁহারা মিশরে গেলেন; যিশুর সংগে তাঁহারা সেই ইহুদি পণ্ডিত সমাদৃত মন্দিরে আসিলেন এবং যিশুকে সেই পণ্ডিতদের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুনিলেন; তারপর যখন তিনি তাঁহার প্রথম শিষ্যদিগকে একে একে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তখনো তাঁহারা তাঁহার সংগেই রহিলেন। সন্ন্যাসীরা যিশুকে তাঁহাদের ঠাকুরের মতোই[3] ভালোবাসিলেন,

১ আক্ষরিক অর্থে "সুন্দর ভগবান"। ফ্রান্সের জনসাধারণ আমিআঁর গথিক গির্জার তোরণে অবস্থিত খৃস্টের মর্মর মূর্তিকে এই নামে অভিহিত করেন।

২ বিবেকানন্দ খৃস্টকে একটি আবেগময় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। রামকৃষ্ণও খৃস্টের ঐশীভাব স্বীকার করেন।

৩ ইঁহাদের দুই জন—শশীভূষণ (রামকৃষ্ণানন্দ), ও শরৎচন্দ্র (সারদানন্দ) সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলেন যে, তাঁহারা, পূর্ববর্তী এক জন্মে যিশুর ভক্ত ছিলেন।

উক্তি করিলেন। খৃস্ট এবং রামকৃষ্ণের মধ্যে চিন্তায়, কার্যে এবং শিষ্যদের সহিত সম্পর্কে যে বহু সাদৃশ্য ছিল, তাহা সন্ন্যাসীদের মনে ঠাকুরের সহিত দিব্য আনন্দের পুরাতন সেই দিনগুলির স্মৃতি জাগাইয়া দিল! পরিত্রাতা খৃস্টের কথাগুলি তাঁহাদের কানে সুপরিচিত লাগিল।"

যিশুর বেদনাবহন এবং ক্রুশবিদ্ধনের কাহিনী তাঁহাদিগকে ধ্যানসমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। নরেনের উদাত্ত ভাষা তাঁহাদিগকে প্রচারশিষ্যদের সেই সভায় পৌঁছাইয়া দিল,—যেখানে পল যিশুর জীবনলীলা বর্ণনা করিতেছিলেন। পেণ্টেকস্ট উৎসবের বহ্নিশিখা তাঁহাদের আত্মাকে বাংলার এক গ্রামাঞ্চলে দগ্ধ করিতে লাগিল। খৃস্ট এবং রামকৃষ্ণের মিলিত নামের ধ্বনি নৈশ বাতাসে স্পন্দিত হইল।

বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীদের নিকট আবেদন করিয়া কহিলেন, তাঁহারাও যেন একে একে খৃস্টে পরিণত হন, পরিণত হন বিশ্বের ত্রাণকর্তায়। তাঁহারাও যেন যিশুর ন্যায় সর্বস্ব পরিত্যাগ করেন এবং এই ভাবে ভগবানকে লাভ করেন। ধুনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীরা প্রত্যেকে ভগবানের এবং সহধর্মীদের সমক্ষে চিরদিনের জন্য সন্ন্যাসের শপথ গ্রহণ করিলেন। লেলিহান অগ্নিশিখার আলোকে তাঁহাদের মুখ-মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডগুলি হইতে অস্পষ্ট শব্দ আসিতে-ছিল। কেবল সেই শব্দেই তাঁহাদের চিন্তার নীরবতা ছন্দিত হইল।

শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান শেষ হইলে সন্ন্যাসীদের মনে পড়িল সেদিন "ক্রিসমাস্ ইভ" (যিশুর জন্মের শুভ পূর্বদিন)।[1] এ পর্যন্ত একথা তাঁহাদের মনেই ছিল না।

এই ভাবে বিধাতার এক নব জন্মদিন ঘোষণা করিয়া ঐ সভা সেদিন গভীর অর্থময় একটি সুন্দর রূপকে পরিণত হইল।...

কিন্তু ইউরোপবাসী যখন এই কাহিনী পড়িবেন, তখন তাঁহারা যেন বিভ্রান্ত, বিপথে পরিচালিত না হন। ইহা জোর্ডানে[2] প্রত্যাবর্তন ছিল না। ইহা ছিল জোর্ডান ও জাহ্নবীর মহামিলন। এই মিলিত দুই মহানদী একত্রে তাঁহাদের প্রশস্ততর বক্ষ পূর্ণ করিয়া বহিয়া চলিল।

*

জন্মের সময় হইতে এই নূতন সংঘের মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহা অপরূপ, যাহার তুলনা মেলে না। এই সংঘের আদর্শের মধ্যে কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের

১ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২ জোর্ডান—হিন্দুদের নিকট গঙ্গার ন্যায় খৃস্টানদের নিকট এই নদীটি অতি পবিত্র।—অনুঃ

বিশ্বাস-শক্তি মিলিত হইল না, কেবল বিজ্ঞানের বিশ্বকৌশিক জ্ঞানের সহিত ধর্মমূলক ধ্যান ও চিন্তার মিশ্রণ ঘটিল না, উহার মধ্যে ঘটিল চিন্তার আদর্শের সহিত মানবসেবার আদর্শের মিলন ও মিশ্রণ। প্রথম হইতেই রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক পুত্রগণের পক্ষে নিজেদিগকে আশ্রমের চতুষ্প্রাচীরের মধ্যে বন্দী রাখা নিষিদ্ধ হইল। একের পর একে তাঁহারা ভিক্ষু সন্ন্যাসী রূপে পৃথিবী পর্যটনে বাহির হইলেন। রামকৃষ্ণের দেহাবশেষের ভারপ্রাপ্ত কেবল মাত্র রামকৃষ্ণানন্দ (শশীভূষণ) পক্ষীশালা ছাড়িয়া কোথাও গেলেন না। এই পক্ষীশালায় বিহংগরা মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য ফিরিয়া আসিতেন। ঠাকুরের জীবনের শেষ দিনগুলিতেই মার্থার সেই বিনীত সেবার আদর্শ গৃহীত হইয়াছিল। সেই সেবা তাঁহারা রুগ্‌ণ গুরুদেবের সেবার মধ্য দিয়া, বা যাঁহারা ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত আছেন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবার মধ্য দিয়া, অভ্যাস করেন। এই সেবাই ছিল ঠাকুরের 'ভগবৎ-লাভের' নিজস্ব পন্থা এবং বৃদ্ধ টলস্টয় হইলে বলিতেন, এই পন্থাই ছিল শ্রেষ্ঠতর পন্থা।

কিন্তু প্রত্যেককেই নিজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। কারণ, প্রত্যেকের মধ্যে অজ্ঞাত, বিভিন্ন স্বভাব অনুসারে, রামকৃষ্ণের বহুরূপী ব্যক্তিত্বের এক একটি স্তর বা দিক প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তাই শিষ্যরা যখন একত্রিত হইতেন, তখন রামকৃষ্ণকে সমগ্র ভাবে পাওয়া যাইত।

তাঁহাদের শক্তিশালী মুখপাত্র ছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁহাদের সকলের হইয়া তিনি পৃথিবীময় গুরুদেবের বাণী প্রচার করিতেছিলেন। বিবেকানন্দ দাবী করিলেন, রামকৃষ্ণ ছিলেন ভারতের সকল প্রকার আধ্যাত্মিক মানসিক শক্তির সুসংগত সম্মিলিত জীবন্ত প্রকাশ। "আমি…এমন একজন মানুষের পায়ের তলায় বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম…যাঁহার জীবন তাঁহার সকল শিক্ষার ও উপদেশের অপেক্ষাও উপনিষদের বাণীকে সহস্র গুণ বেশী করিয়া প্রকাশ করিত। বস্তুতপক্ষে, তিনি ছিলেন জীবন্ত মানবদেহে উপনিষদের বাণী।…তিনি ছিলেন মনীষী ও ঋষির সংখ্যায় সমৃদ্ধ ভারতের বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার সুসংগত প্রকাশ। শংকরের বিরাট মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের মহান হৃদয় একত্রে মূর্তি লাভ করিবার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। রামকৃষ্ণের মধ্যে শংকরের বিরাট মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের উদার হৃদয় মূর্তিগ্রহ করিল। রামকৃষ্ণ সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একই অধ্যাত্ম শক্তির, একই ভগবানের ক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করিলেন। সর্বভূতে, সর্বজীবে তিনি ভগবানকে দেখিলেন। ভারতের ও ভারতের বাহিরে সমস্ত দীনদুঃখীর জন্য,

দুর্বলের জন্য, নির্যাতিতের জন্য, তাঁহার হৃদয় কাঁদিল! তাঁহার দীপ্ত মহান মনীষাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে,...হৃদয় ও মস্তিষ্কের ধর্মের মধ্যে সংগতি বিধানের জন্য উদারপরিকল্পনা করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ ছিলেন এমনি একটি মানুষ।...সময় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। এমনি একটি মানুষের জন্মের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এবং তিনি জন্মিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে; সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর অংশ হইল, তাঁহার জীবনের সকল কর্ম এমন একটি শহরের নিকট অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যে শহর ভারতের অন্যান্য শহর অপেক্ষা পাশ্চাত্য চিন্তায় ছিল পূর্ণ, প্রতীচ্যের ভাবধারায় ছিল উন্মত্ত। সেখানে তিনি কোনো প্রকার কেতাবী বিদ্যা না লইয়াই বাস করিতেছিলেন। এই মহান পণ্ডিত তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিতেও কখনো শেখেন নাই। কিন্তু তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত পাস-করা পণ্ডিতরাও তাঁহাকে একজন বিরাট মনীষী[১] বলিয়া, এ যুগের মংগলের বাণীবাহক বলিয়া, স্বীকার করিয়াছেন।...আমি যদি আপনাদিগকে কোনো সত্য কথা বলিয়া থাকি, তবে সে সত্য তাঁহার, কেবল তাঁহার।

১ বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ধার্মিক মনীষি অরবিন্দ ঘোষ রামকৃষ্ণের প্রতিভার প্রতি সুন্দর শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন। উহাতে রামকৃষ্ণের বহুমুখী আধ্যাত্মিক শক্তির এবং সেই সকল শক্তিকে পরিচালিত করিবার উপযোগী অসাধারণ একটি আত্মার তিনি বর্ণনা দিয়াছেন:

"আমরা সম্প্রতি রামকৃষ্ণের জীবনে বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করি। তিনি রাতারাতি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। সে যেন বলপ্রয়োগে স্বর্গরাজ্য জয় করা। অতঃপর তিনি পর পর বিভিন্ন যৌগিক রীতি অবিশ্বাস্য দ্রুততার সহিত আয়ত্ত করিয়া তাহা হইতে সারবস্তুকে গ্রহণ করেন। এবং এইরূপে সহজাত আধ্যাত্মিক শক্তিকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া অনুভূতিজাত জ্ঞানের স্বতস্ফূর্ত ক্রীড়ার দ্বারা তিনি প্রেমের পথে ভগবৎ প্রাপ্তির সমগ্র বিষয়টির গভীরে ফিরিয়া আসেন। এই ধরণের দৃষ্টান্তকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। উহার উদ্দেশ্যও ছিল বিশেষ এবং সাময়িক। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবদমান বহু সম্প্রদায়ে ও মতবাদীর দলে বিভক্ত এই পৃথিবীতে একটিমাত্র সত্যে মানব সমাজের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং মানব সমাজ তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এবং ধর্মমতগুলি একই সামগ্রিক সত্যের অংশ ও অংগ মাত্র এবং সকল নিয়মশৃংখলারই স্ব স্ব পৃথক পথে সেই একই পরম অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই সত্যকে কোনো এক মহাত্মার বিপুল চূড়ান্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দৃষ্টান্তরূপে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন ছিল। কারণ উহার মধ্যেই বাকী সবটুকু রহিয়াছে—সব কিছুই, সকল আকার, সকল প্রকার যাহাই 'দিব্য ইচ্ছাশক্তি' আমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন।" ("যোগ-সমন্বয়" প্রবন্ধ, 'আর্য' পত্রিকা, পণ্ডিচেরী, ডিসেম্বর, ১৯১৪)

এইভাবে বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ অধিবিদ্বান (*metaphysician*) রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব এবং জীবনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আর আমি যদি আপনাদিগকে কোনো ভুল বলিয়া থাকি·· সে ভুল আমার, সেজন্য আমিই দায়ী।"[১]

এইরূপে এই সরল সাধারণ মানুষটির পদতলে আধুনিক ভারতের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিশীল, সর্বাপেক্ষা শক্তিমান, সর্বাপেক্ষা দাম্ভিক ধর্মনেতা বিবেকানন্দ নিজেকে অবনত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন এই বংগীয় যীশুর প্রচার-দূত সেণ্ট পল। তিনিই তাঁহার (রামকৃষ্ণের) গির্জা এবং ধর্মমতের প্রবর্তক। তিনি সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করেন। তিনি ছিলেন নির্গম-আগমের পথ, যে পথ দিয়া ইউরোপ-গুলির[২] চিন্তা ভারতে এবং ভারতের চিন্তা ইউরোপগুলিতে যাতায়াত করিত এবং এইরূপে বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত বৈদান্তিক বিশ্বাসের, অতীতের সহিত ভবিষ্যতের, সংযোগ ঘটিত।

এই আত্মার 'যাত্রাকে' আমি পরবর্তী খণ্ডে বিবৃত করিব। বর্তমান খণ্ডে আমি ইউরোপীয় চিন্তাকে সেই সুদূর পৌরাণিক ভূখণ্ডে লইয়া যাইতে চাহিয়াছি, সেখানে বিরাট প্রাচীন আকাশস্পর্শী মহীরুহ—যদিও পশ্চিমদেশীয়রা তাহাকে বিশুষ্ক ও মুমূর্ষু মনে করেন—আজো পুষ্পিত শাখা-প্রশাখা মেলিয়া ধরিতেছে। এবার আমি তাঁহাদিগকে অজানা পথ দিয়া স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিব—যে-গৃহে আধুনিক যুক্তি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার ফলে ইউরোপীয় চিন্তা আবিষ্কার করিবে, এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ব্যবধান ও বিচ্ছেদ গড়িয়া উঠিলেও তাহা যদি পারস্পরিক সুবুদ্ধি ও সহানুভূতির স্বাধীন বেতারের যোগসূত্রে সংযুক্ত হয়, তবে তাহাদের মধ্যে স্থানের লেশমাত্র ব্যবধান এবং কালের মুহূর্তমাত্র বিচ্ছেদ থাকিবে না।

ক্রিসমাস্, ১৯২৮

১ কলিকাতা ও মাদ্রাজে বক্তৃতা: "বেদান্তের বিভিন্ন স্তর" ও "ভারতের ঋষিরা"।

২ মাতা ইউরোপ এবং তাঁহার সন্তান-সন্ততি আমেরিকার বিভিন্ন দেশ।

নোট ১

দস্যু ও সারদা দেবী*

স্বামীর নিকট যাইবার জন্য সারদা দেবীকে প্রায়ই কামারপুকুর ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যবর্তী একটি মাঠ পায়ে হাঁটিয়া পার হইতে হইত। ঐ সময়ে ঐ মাঠে বহুসংখ্যক কালীসাধক দস্যু থাকিত।...

একদিন সারদাদেবী অপর কয়েকজনের সহিত দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতেছিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সহযাত্রীদের হইতে পিছনে পড়িলেন। অবিলম্বে সহযাত্রীরা সকলে তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে গেল। সারদা দেবী একাকী অন্ধকারে ভয়ানক মাঠ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই দেখিলেন, একটা কালো ভয়ংকর কদাকার লোক তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। তাহার কাঁধে লাঠি। তাহার পিছনে আরো একটি মূর্তি। সারদা দেবী পলাইবার কোনো উপায় নাই দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকটা তাঁহার নিকটে আসিয়া কর্কশ গলায় বলিল, 'তুই এখানে এতো রাতে কি কচ্ছিস?'

সারদাদেবী উত্তরে কহিলেন:

'বাবা, আমার সংগে যারা ছিল, সবাই এগিয়ে গেছে, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। তুমি বাবা দয়া ক'রে আমায় তাদের কাছে পৌঁছে দাও না। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে কালীর মন্দিরে থাকেন। আমি তাঁর কাছে যাব। তুমি যদি আমাকে পৌঁছে দাও, তিনি খুব কৃতজ্ঞ থাকবেন।'

এই সময় অপর মূর্তিটি কাছে আসিল। সারদাদেবী স্বস্তি বোধ করিলেন, বুঝিলেন, পেছনের মূর্তিটি স্ত্রীলোক। সারদাদেবী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার মেয়ে, মা। আমি একলা পথ হারিয়ে ফেলেছি। সংগে যারা ছিল, সব চলে গেছে। ভাগ্যে তুমি আর বাবা এসে গেছ! নইলে যে আমার কী হোতো কে জানে।'

সারদাদেবীর সরল ভাব, পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং মিষ্ট কথাগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোকটির হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহারা নীচ জাতীয় হইলেও, তাহা তাহারা ভুলিয়া গেল এবং সারদাদেবীর সহিত নিজের মেয়ের মতোই ব্যবহার করিল।

* ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গল্পটির পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

সারদাদেবী অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে কোনো মতে আর যাইতে দিল না, পার্শ্ববর্তী গ্রামে একটি দোকানে লইয়া গিয়া তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিল। মেয়েটি নিজের গায়ের চাদর খুলিয়া তাঁহার বিছানা করিয়া দিল। লোকটি দোকান হইতে মুড়ি কিনিয়া আনিল। এবং নিজের মেয়ের মতোই সারারাত্রি দেখাশোনা করিল। পরদিন সকালে তাহারা তাঁহাকে তারকেশ্বর পর্যন্ত লইয়া গেল এবং বিশ্রাম করিতে বলিল। মেয়েটি তাহার স্বামীকে বলিল:

'আমার মেয়ে কাল থেকে একরকম না খেয়েই আছে। তার জন্যে বাজার থেকে মাছ আর শাকসব্জী কিনে আনো। আজ তাকে ভালো করে দুটি খাওয়াতে হবে।'

লোকটি বাজারে গেলে সারদাদেবীর সংগীরা তাঁহার সন্ধানে আসিয়া পৌঁছিলেন। সারদাদেবী তাঁহার বাগ্দী মার সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। বলিলেন:

"এরা এসে না বাঁচালে আমি যে কাল কী করতাম কে জানে।"

পরে সারদাদেবী বলেন: 'একটি রাত্রেই আমাদের পরিচয় এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে, বিদায় নেওয়ার সময় আমরা দুঃখে কাঁদতে লাগলাম। দক্ষিণেশ্বরে এসে আমার সংগে দেখা করার জন্য আমি তাদের বললাম। অনেকখানি পথ তারা আমার পেছনে পেছনে এলো। পথের ধারে কলাই হয়েছিল, মেয়েটি তারই অনেকগুলি তুলে আমার আঁচলে বেঁধে দিল। বললো: "মা সারদা, আজ যখন রাত্রে তুমি মুড়ি খাবে, তখন মুড়ির সংগে এগুলো খেয়ো।"...পরে তারা দক্ষিণেশ্বরে আমার সংগে কয়েকবার দেখা করতে এসেছিল। প্রত্যেক বারেই তারা আমার জন্য জিনিসপত্র আনতো। "উনি"-ও তাদের স্নেহ শ্রদ্ধা করতেন; উনি যেন তাদের জামাই।...আমার 'ডাকাত' বাবা যদিও আমার কাছে এতো ভালো মানুষ ছিল, সে যে দু একবার ডাকাতি করেনি, এমন মনে হয় না।'...

—('মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকা থেকে গৃহীত, জুন, ১৯২৭)

নোট ২

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেন

রোমাঁ রোলাঁ এই গ্রন্থের 'রামকৃষ্ণ ও ভারতের মহান জননায়কগণ' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন, এখানে তাহার জবাবে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। প্রধান অভিযোগ এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা কেশবচন্দ্রকে রামকৃষ্ণের শিষ্য বলিয়া দাবী করেন, "ইহা সত্য নহে যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার মূলচিন্তার কোনো কোনোটি রামকৃষ্ণের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। কারণ, ঐ সকল ধারণা রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাতের পূর্বেই কেশবচন্দ্রের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল।" প্রথমেই আমরা একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই, আমরা কেহই কেশবচন্দ্রকে রামকৃষ্ণের শিষ্য বলিয়া (শিষ্য বলিতে যাহা বুঝায়) দাবী করি না। মসিয়ে রোলাঁ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, আমরা তাহার পক্ষপাতদুষ্ট বর্ণনা দিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সম্পর্ক কিরূপ ছিল, তাহা কেশবচন্দ্রের অন্তরংগ সংগীরা—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গিরিশচন্দ্র সেন, চিরঞ্জীব শর্মা এবং অন্যান্য অনেকে—দিয়াছেন। সুতরাং সে সম্পর্কের বিশদ বিবরণ দিবার আর কোনো প্রয়োজন নাই, একথা আমরা গোড়াতেই বলিতে পারি। মসিয়ে রোলাঁ কিন্তু তাঁহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অথচ আমরা এখনো তাঁহাদের বিবরণের নির্ভুল যথার্থতাকে স্বীকার করি।

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের নিকট হইতে তাঁহার কোনো চিন্তা গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সকল ধারণা রামকৃষ্ণের সহিত পরিচয়ের পূর্বেই গঠিত হইয়াছিল, একথা কি সত্য? এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিবার মতো যথেষ্ট প্রমাণ আছে, এমন আমরা মনে করি না। কেশবের পরিণত চিন্তা, তিনি যাহাকে 'নববিধান' বলিয়াছেন, তাহার মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ঐ চিন্তা কি রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের পূর্বে দেখা দিয়াছিল? ঐ চিন্তাধারার মধ্যে তিনটি প্রধান উপাদান রহিয়াছে: ভগবানকে 'মাতৃ'রূপে-পূজা; সমস্ত ধর্ম এবং ধর্মপ্রচারকদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা; এবং বহুদৈবিক হিন্দুধর্মকে ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে গ্রহণ করা।

মসিয়ে রোলাঁ বলিয়াছেন, 'মা' সম্পর্কে ধারণাটি লাভ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সাহায্য কেশবচন্দ্রের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, ধারণাটি শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। সেকথা সত্য। কিন্তু কোনো ধারণার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান এবং সেই ধারণাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, এ দুইএর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং ভগবানের 'মাতৃত্বের' সেই ভাবকে গ্রহণে কেশবচন্দ্রের উপর রামকৃষ্ণের যদি কোনো প্রভাব না ছিল, তবে কেশব যখন ব্রাহ্ম হন, তখন সেই ভাবকে তিনি কেন গ্রহণ করেন নাই? এবং পরবর্তী কালে কেনই বা তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন? এই গ্রহণের চূড়ান্ত কি কারণ ছিল? ম. রোলাঁ বলিয়াছেন যে, আদি ব্রাহ্মসমাজ ভগবানের মাতৃত্ব সম্পর্কে ধারণাকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং কেশব নিজে ১৮৬৬ ও ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে সে সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। এই উল্লেখ যে তিনি নিতান্ত আকস্মিক এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে করিয়াছিলেন একথা অস্বীকার করিবার কোনো উপায় নাই। কেবল ১৮৭৯ খৃস্টাব্দেই ভগবানকে মাতৃরূপে পূজা করিবার ভাবটি কেশবচন্দ্রের মধ্যে গভীর ও বদ্ধমূল রূপে দেখা যায়। সুতরাং এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে: কেশবের এই পরিবর্তনের কারণ কি? আমরা দাবী করি, উহার কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব এবং দৃষ্টান্ত।

আমাদের মতের সমর্থনে আমরা তিনটি রচনা উদ্ধৃত করিতে চাই। কেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করিয়া প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (তাঁহার *Life of Kashub Chunder Sen* গ্রন্থে) বলেন: কোচবিহারের বিবাহ[১] লইয়া কেশবচন্দ্র যখন তীব্র দুঃখ ও বিচ্ছেদ-বেদনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তখনই ভগবানকে মাতৃরূপে দেখিবার প্রয়োজনের কথা তাঁহার মনে স্বতই উদিত হয়। তিনি প্রার্থনাকালীন আলাপে প্রায়ই ভগবানকে 'মা' বলিয়া বিভিন্ন ভাবে ডাকিতেন। এবং এখন পরমহংসের সহানুভূতি, বন্ধুত্ব এবং দৃষ্টান্ত ভগবানের মাতৃভাবটিকে তাঁহার নিকট বিশেষ একটি ভাবধারায় পরিণত করিল। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দের বেশীর ভাগ সময় ধরিয়াই ঐ ভাব পরিণতি লাভ করিতে লাগিল। কেশবচন্দ্র যে পুনর্জাগৃতি ঘটাইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন, এই মাতৃভাব তাহার একটি অভিনব অংগ হইয়া উঠিল। ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে কেশবচন্দ্র "দি সানডে মিরর" পত্রিকায় লেখেন: "পাঠকরা আনন্দ সংবাদ শুনুন।

১ এই বিবাহ ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং কেশবের সাক্ষাৎ ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ঘটিয়াছিল, একথা স্মরণ রাখা দরকার।

ব্রাহ্মসমাজে একটি নববিধানের প্রবর্তন হইয়াছে। উক্ত বিধান ভারতে নূতন কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। উহার প্রধান গুণ হইল উহার সবল অভিনবত্ব। উহার মন্ত্র হইল ভারতের মাতা, ভগবান। উহা যে পরিবর্তন আনিয়াছে, তাহার সমস্তটুকুই ঘোষিত হইতেছে দুটিমাত্র কথায়—ভগবান ও মাতা।" (এই উদ্‌ধৃত অংশ হইতে বোঝা যায়, কেশবচন্দ্র ১৮৮০ খৃস্টাব্দেও মাতৃরূপে ভগবানের এই পূজাকে নূতন বস্তু বলিয়া ভাবিতেছেন।) ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে অক্টোবর মাসে কেশব একটি ঘোষণা পাঠ করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি ছিল: "শিষ্য-পরিবেষ্টিত প্রভু তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন, যাও, আমাকে ভারতে মাতারূপে ঘোষণা করো। আমাকে তাহারা পিতারূপে পূজা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু তারা জানে না যে, আমি তাহাদের স্নেহশীলা, সহনশীলা, ক্ষমতাশীলা মাতা-ও। অনুতপ্ত শিশুকে কোলে লইবার জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত থাকি। তোমরা নগর হইতে নগরে, গ্রাম হইতে গ্রামে আমার করুণা গাহিয়া বেড়াও। মানুষের কাছে ঘোষণা করো, আমি 'ভারতের মাতা'।…" (এই উদ্ধৃত অংশের উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন।) এই সংগে লক্ষণীয় কেশবের এই ঘোষণা প্রকাশিত হইলে ব্রাহ্মরা অনেকে বলিলেন, "উহা প্রচ্ছন্ন বিধর্মিতা মাত্র। ঘোষণায় কেশব একথাও বলিয়াছেন যে, "ভগবানকে মা নামে ডাকিতে নিষেধ থাকা একপ্রকার কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

হিন্দু ও খৃস্টান, এই দুই বৃহৎ ধর্মের মধ্যে সংগতি-বিধান এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দিককে গ্রহণের বিষয়েও কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, আমরা এমন মনে করি। এই বিষয়গুলিকে ম. রোলাঁ তারিখের ভুল ভ্রান্তিতে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। ('ঐক্য-সাধক' শীর্ষক) ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন, ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্র একটি প্রচার ভ্রমণে বহির্গত হন, ঐ সময় তিনি জনপ্রিয় অনেকেশ্বরবাদের স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন, এমন বিশ্বাস করেন, এবং কেশব ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে তাঁহার নববিধান ঘোষণা করেন। উক্ত দুইটি তারিখই ভুল। কেশব তাঁহার 'নববিধান' ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ঘোষণা করেন নাই, করিয়াছিলেন ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার জন্ম 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক নববিধান মতের মুখপত্র 'নববিধান' পত্রিকার সম্পাদকের নিকট লেখেন। নববিধানের সম্পাদক পরবর্তী তারিখই দিয়াছেন। অবশ্য, একথা সত্য যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে প্রদত্ত "ভারতে স্বর্গের আলোক প্রত্যক্ষ করুন" (*Behold the Light of Heaven in India*)

বক্তৃতায় 'নববিধান' কথাগুলি ব্যবহার করেন। তবে উক্ত বক্তৃতায় পরবর্তীকালে ঘোষিত নববিধানের শিক্ষার কিছুই ছিল না। ভগবানের অস্তিত্বের এবং ভারতীয় ইতিহাসের ঐ সংকটকালে যে বিশেষ বিধানের মধ্যে ভগবানের নৈতিক গুণাবলীর প্রকাশ পাইয়াছে, এই বক্তৃতায় কেবল তাহারই প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উহাতে ধর্মগুলির মধ্যে সংগতিবিধানের কোনো উল্লেখও ছিল না। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংগতি-বিধান বিষয়ে কেশবচন্দ্রের প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে অন্যতম প্রমাণরূপে ম. রোলাঁ কেশবচন্দ্রের ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে প্রদত্ত বক্তৃতা 'ভাবী ধর্মের' (*The Future Church*) উল্লেখ করেন। সকল ধর্ম তাহাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ভগবানের পূজায় ঐক্যবদ্ধ হইবে, সমস্ত ধর্মের এইরূপ একটি বিপুল সংগতি-বিধানের পরিকল্পনা এই বক্তৃতায় ছিল না। ঐ বক্তৃতায় কেশব কেবল স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে কিছু না কিছু সত্য রহিয়াছে। কিন্তু তিনি বিগ্রহপূজা, প্রকৃতি-বহির্ভূত ভগবানের অবতার সম্পর্কে ধারণাকে উহাতে তীব্রভাবে তিরস্কার করেন। তিনি তাঁহার ধর্মে বিভিন্ন ধর্মমতকে অক্ষুণ্ণভাবে গ্রহণ করিবার কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। তিনি বিভিন্ন ধর্ম হইতে সারবস্তু গ্রহণ করিয়া তাঁহার ধর্মের প্রধান মতবাদকে গড়িয়া তুলিতে চান। তাঁহার মত অনুসারে সেই মতবাদ ছিল 'ভগবানের পিতৃত্ব' এবং 'মানুষের ভ্রাতৃত্ব' বোধ। সেই সংগে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, এই দেশের ভবিষ্যৎ ধর্ম নিশ্চয়ই খৃস্টান ধর্মের প্রভাবে বর্তমান বিভিন্ন প্রধান ধর্মবিশ্বাসের শুদ্ধতার উপাদান হইতে সুসংগত, পরিণত এবং গঠিত হইয়া উঠিবে। বিভিন্ন ধর্মের সুসংগতির,—এমন কি পরবর্তী-কালে কেশবচন্দ্র যেমনটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার—সহিত ইহার যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমার মতে, কেশবচন্দ্র চিরদিনই চয়নপন্থী ছিলেন। নূতন কোনো ধর্মের প্রত্যেক প্রবর্তকই, তিনি চূড়ান্তরূপে উগ্র এবং মৌলিক না হইলে, কমবেশী চয়নপন্থী হন। কারণ, তাঁহার ধর্মে অন্যান্য ধর্মের প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত সত্যকে গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য, একথা সত্য যে, কেশব কেবল চয়নপন্থীই ছিলেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ বা শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসংগতির অনুশীলন প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব পর্যন্ত, উক্ত সংগতি পরিকল্পনা বা সাধনা কিরূপে নির্ভুল ভাবে করিতে হইবে, তাহার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা তাঁহার ছিল না। যদি থাকিত, তবে তিনি ১৮৮০-র পূর্বে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংগতি বিধানের কথা প্রচার করেন নাই কেন?

নববিধানের ঘোষণা কি ভাবে ঘটিয়াছিল, তাহার একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রতাপচন্দ্র

মজুমদার রাখিয়া গিয়াছেন। কোচবিহারে বিবাহের ফলে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যে বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং কেশবচন্দ্র যে সকল দুঃখকষ্ট ও নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাহার ফলে তিনি একটি পুনর্জাগৃতির প্রয়োজন অনুভব করেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন :

"একদা সন্ধ্যায় কেশবচন্দ্র বিছানায় শুইয়াছিলেন, এবং আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। অকস্মাৎ তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মসমাজকে এই সংকট উত্তীর্ণ হইতে হইলে একটি বিরাট অভূতপূর্ব পুনর্জাগরণের প্রয়োজন রহিয়াছে। ভক্তি-ভজনের দিকে, নিয়ম-শৃংখলার দিকে, মতবাদ বা মতপ্রচারের দিকে, সকল দিকে, এমন একটি পুনর্জাগৃতির মনোভাব আনিতে হইবে, যাহা ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই। আমরা সকলেই এ কথায় একমত হইলাম, কিন্তু বুঝিলাম না যে, কেশব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দীর্ঘ গভীর চিন্তা এবং একাগ্র প্রার্থনার ফলেই ঘটিয়াছে এবং তাহাতে এমন কাজের প্রয়োজন যে জন্য আমরা কেহই প্রস্তুত নই।" প্রতাপ আরো বলেন : "সুতরাং কেশব যখন ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে পুনঃপ্রবর্তনের কথা বলেন, তখন তাহা তিনি 'নূতন একটি উদ্‌ঘাটনের, নূতন একটি জীবনের এবং অভিনব একটি পরিবর্তনের ভিত্তিতেই' বৃহত্তর অগ্রগমনের অর্থেই বলিয়াছিলেন। এমন অগ্রগমন ইতিপূর্বে আর কখনো হয় নাই।" (আমরা যে শব্দগুলি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে দিয়াছি, সেগুলি লক্ষ্য করুন।) শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দেখা হইবার পূর্বে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংগতিবিধানের নীতির কথা ভাবেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সংগতি-বিধানের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতা এবং উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তাঁহার প্রায় পাঁচ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের পরেই কেশবচন্দ্র উক্ত সংগতি-বিধানের কথা বোঝেন এবং ঘোষণা করেন (অবশ্য, একথা সত্য, তাঁহার নিজের ভাবে ও ভংগিতে)। ইহা হইতে আমরা কি সিদ্ধান্তে পৌঁছি? বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংগতি-বিধানের নীতি যে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের ফলেই গ্রহণ এবং প্রচার করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তই কি ন্যায়সঙ্গত নয়? ইহাই যে ন্যায়সঙ্গত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিজেও তাঁহার স্বরচিত কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী গ্রন্থে এ মত সমর্থন করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ কর্তৃক প্রাচীন ধর্মগুলির মধ্যে এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সংগতি-বিধানের বর্ণনা দিয়া অতঃপর তিনি বলেন : "এই অপূর্ব অদ্ভুত চয়নপদ্ধতি দেখিয়া গুণগ্রাহী কেশবচন্দ্রের মনে তাঁহার নিজের আন্দোলনের আধ্যাত্মিক অবয়বকে প্রসারিত করিবার কথা জাগে।" আমরা 'নববিধান' পত্রিকার সম্পাদকের সাক্ষ্যও

প্রকারান্তরে পাইয়াছি। 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদককে তিনি লেখেন "কেশবচন্দ্রের যে নবজন্মলাভ ঘটিয়াছিল, তাহারই প্রকাশরূপে যে ১৮৮০ খৃস্টাে 'নববিধান' ঘোষিত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। বহু প্রসব বেদনার পরে তাঁহার এ নবজন্মলাভ ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রত্যেকটি নবজন্মলাভের জন্য বিভিন্ন চরিত্রে প্রভাবের ছিল প্রয়োজন। এবং অবিরাম অবিচ্ছিন্ন শিষ্যত্বের একটি মূর্তি ি কেশবচন্দ্র আর কি ছিলেন ?…"

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের ফলেই যে কেশবচন্দ্র হিন্দু অনেকেশ্বরবাদে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে আর লেশমাত্র সংশয় থাকে না। ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্র হিন্দু অনেকেশ্বরবাদের অর্থ উদ্ধলব্ধি করিয়াছিলেন, ম. রোলাঁর এই উক্তি যে ভ্রমাত্মক, আমরা তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতে কেশবচন্দ্রের ঐ উপলব্ধি ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে, তাঁহার প্রচার ভ্রমণকালে, ঘটিয়াছিল আমরা ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের "চয়নপদ্ধিত।" কেশব-চন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। পরে প্রতাপচন্দ্র উহাতে আরো কয়েকটি কথা জুড়িয়া দেন। এই সময়ে (১৮৭৯-১৮৮০) কেশবচন্দ্র তাঁহার বাংলা ভাষণগুলিতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম করেন, এবং সেগুলির তলায় কি ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহার ব্যাখ্যা দেন। এবং ম. রোলাঁ নিজেও উল্লেখ করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ১লা আগস্ট তারিখে তাঁহার 'পৌত্তলিকতার দর্শন' (*The Philosophy of Idol Worship*) প্রবন্ধ 'দি সানডে মিরর' পত্রিকায় লেখেন। 'নববিধান' পত্রিকার সম্পাদকের সাক্ষ্য আরো প্রামাণ্য। এ বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: তাঁহার প্রাক্ নববিধান বক্তৃতা বা রচনাগুলির মধ্যে কেশবচন্দ্র কোথাও হিন্দু-বিগ্রহপূজার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এমনটি আমার জানা নাই ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক ম্যাক্স ম্যুলারকে লিখিত একটি পত্রে মজুমদার লেখেন: 'কেশবচন্দ্রের জীবন ও উপদেশ' গ্রন্থে এবং পুরাতন 'থেইস্টিক রিভিয়্যু'তে আমি অকপটে এই ঋষিতুল্য ব্যক্তিটির (শ্রীরামকৃষ্ণের) এবং তাঁহার নিকট আমাদের ঋণের বর্ণনা ও বিবরণ দিয়াছি।

আমরা আরো দুইটি প্রামাণ্য সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে চাই। একটি হইল স্বামী বিবেকানন্দের। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশবের সম্পর্কের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হিসাবে তাঁহার সাক্ষ্যের একটি বিশেষ মূল্য এবং প্রামাণ্যতা আছে।

"তিনি (কেশব) ঘণ্টার পর ঘণ্টা রামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া ঐ অপূর্ব মানুষটির

ধর্ম সম্পর্কে অপূর্ব বাণীগুলি সানন্দে শ্রবণ করিতেন। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইতেন। তখন শুদ্ধিলাভের আশায় কেশব রামকৃষ্ণের দেহ মৃদুভাবে স্পর্শ করিতেন। কখনো কখনো তিনি পরমহংসকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন। এবং তাঁহাকে নৌকায় লইয়া নদীতে কয়েক মাইল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ঐ সময় ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোনো কোনো সংশয় লইয়া তিনি পরমহংসকে প্রশ্ন করেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ক্রমেই একটি গভীর বলিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে এবং কেশবের সমগ্র জীবনে পরিবর্তন আসে এবং অবশেষে কেশব ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার মতামতকে নববিধানরূপে ঘোষণা করেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সত্যগুলি শিখাইয়াছিলেন, এই 'নববিধান' তাহারই আংশিক প্রকাশ মাত্র ছিল।"

অন্যতর সাক্ষীটি হইলেন অধ্যাপক ম্যাক্স ম্যুলার। নিম্নলিখিত উদ্‌ধৃত অংশটি তাঁহার 'একজন বাস্তবিক মহাত্মা' (*A Real Mahatma*) প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধটি ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে 'দি নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি'তে প্রকাশিত হয়। ঐ সময় শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের সহিত তাঁহার একপ্রকার কোনো পরিচয় ছিল না। অধ্যাপক লিখিয়াছিলেন:

"ব্রাহ্মসমাজের নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংল্যাণ্ডের অনেকের নিকট সুপরিচিত। এই মহাত্মা (শ্রীরামকৃষ্ণ) কেশবচন্দ্রের উপর, তাঁহার নিজের উপর, এবং কলিকাতার বহু উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তির উপর কিরূপ অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি আমাকে বলিয়াছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনের শেষাংশে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার শেষ জীবনে গম্ভীর সংস্কারক হইতে অকস্মাৎ যে ভাবে অতীন্দ্রিয় সাধক ও ভাবোচ্ছ্বসিত ঋষিতে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বন্ধু এবং ভক্তকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল। অবশ্য যদিও নববিধানের পরবর্তী পরিণতি এবং ভগবানের মাতৃত্বের মতবাদ কেশবচন্দ্রকে তাঁহার ইউরোপীয় বন্ধুদের নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিত, কিন্তু উহাতে হিন্দুসমাজে তাঁহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল মনে হয়। যাহাই হউক, যে প্রচ্ছন্ন প্রভাব এই আকস্মিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত প্রবর্তকের জীবনকে অন্য পথে চালিত করিয়াছিল, উহা কেশবচন্দ্রের অতি উত্তেজিত মস্তিষ্কের রুগ্‌ণ অবসাদ, এমনো অনেকে মনে করেন। তাহা যে কি এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারি।" (ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, কেশবচন্দ্রের শেষ

জীবনে তাঁহার চিন্তায় ও মতবাদে যে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহ বন্ধুরা লক্ষ্য করেন। এবং ম. রোলাঁ যে বলিয়াছেন, ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণে সহিত মিলনের পূর্বেই কেশবচন্দ্রের প্রধান চিন্তাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তা সত্য নহে।)

এখানে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ম্যাক্স ম্যুলার কেশবচন্দ্রে সমসাময়িক এবং বন্ধু ছিলেন; তিনি কেশবচন্দ্রের জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ করিতেছিলেন। অবশ্য উপরে উদ্ধৃত তাঁহার রায়টি কেশবচন্দ্রের ভক্তদের মধে ভয়ানক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল মনে হয়। তাঁহারা সম্ভবত ইহার বিরু ঘোরতর প্রতিবাদও জানান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে নিজেদের ব্যাখ্যা ম্যাক্স ম্যুলারের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ম্যাক্স ম্যুলা তাঁহার নিজের মতকেই নির্ভুল জানিয়া তাহা পরিবর্তন করে না। এবং তাহ তাঁহার "রামকৃষ্ণ : তাঁহার জীবনী ও বাণী" (Ramakrishna : His Life an Sayings) পুস্তকের মন্তব্যগুলি হইতে বেশ বোঝা যায়।

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মহাপুরুষ কেশবচন্দ্রের ধর্মপ্রতিভায় চয়ন পন্থিতার প্রতি একটি সহজাত সহানুভূতি ছিল এবং সেই সহানুভূতিই তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ করিয়াছিল। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাহচর্যেই তাঁহার এই চয়নপন্থী মনোভাব পরিণতি লাভ করে, এবং অবশেষে 'নববিধান' গড়িয়া উঠে। তাহা ছাড়া, ভগবানের মাতৃত্ব এবং হিন্দু অনেকেশ্বরবাদ এই দুইটি ভাবকেও তিনি সরাসরি ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত ও প্রভাব হইতে লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১। রামকৃষ্ণের জীবনেতিহাসের প্রধান উপাদান তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক সংগৃহীত এবং স্বামী মাধবানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণীগুলিতেই রহিয়াছে :

বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র হইতে সংগৃহীত 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন' (Life of Sri Ramakrishna, Compiled from various authentic sources)—হিমালয়ের আলমোড়াস্থ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম (মিশনের কৃষ্টিকেন্দ্র) হইতে ১৯২৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত ৭৬৫ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক। (হিমালয়ান সিরিজ, ৪৭নং)

এই পুস্তকখানিতে গান্ধীজি-লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত মুখপত্রও আছে। আমি তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতে চাই :

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন একটি কর্মগত ধর্মের কাহিনী। তাঁহার জীবন আমাদিগকে ভগবানকে মুখামুখী প্রত্যক্ষ করিতে সাহায্য করে। তাঁহার জীবন-কাহিনী পড়িয়া কেহ একথা বিশ্বাস না করিয়া পরে না যে, কেবল ভগবানই সত্য এবং অপর সকল কিছুই মায়া। রামকৃষ্ণ ছিলেন দেবতুল্যতার জীবন্ত মূর্ত প্রকাশ। তাঁহার বাণী কেবল পণ্ডিতের উক্তি মাত্র নহে, তাহা তাঁহার জীবন গ্রন্থের এক একটি পৃষ্ঠা। সেগুলি তাঁহার স্বকীয় অভিব্যক্তির অপূর্ব প্রকাশ। তাই সেগুলি পাঠকের মনে এমন একটি ছাপ রাখে, যাহা পাঠক প্রতিরোধ করিতে পারে না। এই সংশয়ের যুগে রামকৃষ্ণ এমন একটি জ্বলন্ত প্রেমপূর্ণ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, যাহা সহস্র সহস্র নরনারীকে সান্ত্বনা দিবে, অন্যথায় এই সকল নরনারী আধ্যাত্মিক আলোক হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকিতেন। রামকৃষ্ণের জীবন অহিংসার একটি বাস্তবিক শিক্ষা। তাঁহার ভালোবাসায় ভৌগোলিক কিম্বা অন্যপ্রকারের কোনো সীমা ছিল না। যাঁহারাই এই পুস্তক পড়িবেন, তাঁহার স্বর্গীয় প্রেম তাঁহাদের নিকট প্রেরণা হইয়া উঠিবে।

সবরমতী
মার্গশীর্ষ, কৃষ্ণা ১ — এম. কে. গান্ধী
বিক্রম সম্বৎ, ১৯৮১

একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে বোঝা যায়, এই গ্রন্থটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন রচনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত : ঠাকুরের ব্যক্তিগত শিষ্য এবং সিকি শতাব্দীরও অধিককাল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ ;

রামচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার সেন—ইঁহারা উভয়েই রামকৃষ্ণের শিষ্য ; প্রিয়নাথ সিংহ (ওরফে গুরুদাস বর্মণ)—ইনি বিবেকানন্দের শিষ্য, ইনি রামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্মৃতিকথা সংগ্রহ করেন ; এবং মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—ইনি ঠাকুরের কথামৃতের রচয়িতা।

এই সংগ্রহটি মূল্যবান। কারণ, যে সকল প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেগুলি ইহাতে একটি ধর্মভীরু সতর্কতার সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। তবে উহাতে অসুবিধাও আছে। কারণ, উহাতে বিভিন্ন রচনা বিশৃংখল ভাবে, কোনো বিচার না করিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, (এ পর্যন্ত) উহাতে কোনো বর্ণানুক্রমিক তালিকা না থাকায় গবেষণার কাজ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

২। যুক্তি এবং সাজানোর দিক হইতে স্বামী সারদানন্দের রচনাটি অনেক বেশী মূল্যবান। উহা বাংলা ভাষায় পাঁচ খণ্ডে লিখিত। অবশ্য উহাতেও ধারাবাহিক সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে সারদানন্দের মৃত্যু হওয়ায়, কাহিনীটি অকস্মাৎ অসমাপ্ত ভাবে শেষ হয়। উহাতে অসুস্থ অবস্থায় রামকৃষ্ণের কাশীপুরে স্থানান্তরিত হওয়া পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং বাকী কাহিনীটুকু বাদ পড়িয়াছে। দুই একজন বাদে রামকৃষ্ণের শিষ্যদের দিক হইতেও—ইঁহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—এই বইখানি অসমাপ্ত।

বাংলায় এই গ্রন্থের নাম :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ

ইহার বিভিন্ন পাঁচ খণ্ডের নাম :

(১ এবং ২) গুরুভাব

(৩) বাল্যজীবন

(৪) সাধক ভাব

(৫) দিব্যভাব

মাত্র দুই খণ্ড ইংরাজিতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড সারদানন্দ নিজে লিখিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় খণ্ড মূল বাংলা হইতে ইংরাজিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অন্যান্য কয়েকটি পরিচ্ছেদ বাংলা হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারতে' (বিশেষত, রামকৃষ্ণের সহিত বিবেকানন্দের সম্পর্ক প্রসংগ) এবং অন্য একটি ইংরাজি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সারদানন্দ এই পুস্তকে রামকৃষ্ণের জীবনকে ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করিতে

চান না। তিনি বিভিন্ন দিক হইতে রামকৃষ্ণের জীবনকে ব্যাখ্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। বাংলায় প্রথম দুই খণ্ড তাঁহার এই পরিকল্পনা অনুসারেই লিখিত হইয়াছিল পরে সারদানন্দ উহাকে সাধারণ কায়দাতেই পরিবর্তিত করেন। তৃতীয় খণ্ডে রামকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং চতুর্থ খণ্ডে তাঁহার সাধনা বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আমরা তাঁহার সাধনার পরিণতি এবং ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রথম সম্পর্ক পাই। এই সম্পর্কে তাঁহাকে শিক্ষকের ভূমিকায় (তখনো তাহা ধর্মগত ভাবে প্রকট না হইলেও) চিত্রিত করা হইয়াছে। পঞ্চম খণ্ডে শিষ্যপরিবৃত ঠাকুরকে এবং তাঁহার রোগের সূত্রপাত দেখা যায়। ঐ সময় 'মা'র (রামকৃষ্ণের স্ত্রীর) এবং তৎপরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মৃত্যু হয়। ব্রহ্মানন্দ বিবেকানন্দের ন্যায় ঠাকুরের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম অধ্যক্ষ হন। এই দুইটি মৃত্যু দেখিয়া সারদানন্দ এতোই বিহ্বল হইয়া পড়েন যে, তিনি রচনা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ধ্যানাভ্যাসে আত্মনিয়োগ করেন।

সারদানন্দের রচনা অসমাপ্ত হইলেও চমৎকার। সারদানন্দ দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক হিসাবে অন্যতম প্রামাণ্য ব্যক্তি। তাঁহার গ্রন্থ অধিবিত্থার সংক্ষিপ্ত বিভিন্ন বর্ণনায় ও বিবরণীতে সমৃদ্ধ। ফলে হিন্দু চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ শোভাযাত্রায় রামকৃষ্ণের স্থানটিকে নির্ভুল ভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইংরেজি Life of Ramakrishna (১নং) রামকৃষ্ণ মঠের সমবেত চেষ্টায় রচিত হয়। সারদানন্দের বাংলা গ্রন্থের সহিত ঐ ইংরেজি গ্রন্থের যদি কোনো পার্থক্য ঘটে, তবে 'লাইফ অব রামকৃষ্ণ'-কেই (স্বামী অশোকানন্দের সাক্ষ্য অনুসারে) শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হইবে। কারণ, উহা তাঁহার নিজের পুস্তক রচনার পরে সারদানন্দের সাহায্যেই পরিকল্পিত হইয়াছিল।

৩। The Gospel of Sri Ramakrishna (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)।

রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বিবেকানন্দের দুইটি পরিচয়পত্র সম্বলিত উহার ২য় সংস্করণ ১৯১১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯২২-২৪-এ ইহার আরো নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে।[১]

১ দুঃখের বিষয়, আমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের (Gospel-এর) যে দুই খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সগুলি দুইটি দুই পৃথক সংস্করণের ছিল। ১ম খণ্ডটি ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ৪র্থ সংস্করণের এবং ২য় খণ্ডটি ছিল ১৯২২ খৃস্টাব্দের প্রথম সংস্করণের। তবে একথা ধরিয়া লইতে পারা যায়, এই স্বল্প ব্যবধানে রচনায় সজ্জা বা শৈলী কিছুই পরিবর্তিত হইতে পারে না।

এই শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থখানিও শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ-এর ন্যায় মূল্যবান। কারণ ইহাতে 'ম' (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কলিকাতাস্থ একটি বিদ্যালয়ের পরিচালক) কর্তৃক ঠাকুরের কথোপকথন এবং বাণীগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাতে ১৮৮২ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল হইতে আলাপগুলি বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি শ্রুতনলিপির ন্যায় যথাযথ এবং হুবহু। সংগে একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী থাকায় ঐ সময় যে বিভিন্ন অসংখ্য বিষয় লইয়া আলোচনা চলিত, সেগুলির মধ্যে পথ করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

৪। তাঁহার পূর্ব এবং পশ্চিমদেশীয় শিষ্যগণ লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন' (The Life of Swami Vivekananda, by his Eastern and Western Disciples) হিমালয়, অদ্বৈত আশ্রম হইতে বিবেকানন্দের জন্ম-পঞ্চাশৎ-বার্ষিকীতে তিন খণ্ডে[১] স্বামী বিরজানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। উক্ত পুস্তক হিমালয় আলমোড়া অদ্বৈত আশ্রম মায়াবতী 'প্রবুদ্ধ ভারত' অফিস হইতে ১৯১৪ খৃস্টাব্দে ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯১৫-এ ৩য় খণ্ড এবং ১৯১৮-এ ৪র্থ খণ্ড বাহির হইয়াছে।

রামকৃষ্ণের প্রধানতম ভক্তের এই বিরাট জীবনীর মুখ্য আকর্ষণ কেবল তাহার জীবনই নহে। কারণ, উহাতে ঠাকুরের নিজের বহু স্মৃতিকথাও লিপিবদ্ধ আছে।

তাহা ছাড়া, ৭ম খণ্ডে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী'ও উল্লেখযোগ্য। বিবেকানন্দ প্রায়ই ঠাকুর সম্বন্ধে একটি ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতার সহিত কথাগুলি বলিয়াছেন। সম্পূর্ণ রচনাবলীর ৪র্থ খণ্ডে 'My Master' নামে প্রকাশিত নিউ ইঅর্কে প্রদত্ত তাঁহার একটি বিখ্যাত বক্তৃতা বিশেষভাবে ঠাকুরের নামেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী (Sri Ramakrishna's Teachings), ছোট দুই খণ্ডে, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে ১৯১৬ এবং ১৯২০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত।

ঠাকুর তাঁহার বিভিন্ন কথোপকথনের কালে যে সকল চিন্তাপূর্ণ কথা বলিয়া-ছিলেন, সেগুলির সমষ্টি। উহাতে বিশেষত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের উপদেশা-বলীকে বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো হইয়াছে। চেহারায় ছোটো হওয়ায় এই পুস্তকের একটি বিশেষ মূল্য আছে। রামকৃষ্ণ মঠের পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারতে' এবং অন্যান্য ভারতীয় পত্রিকায় ১৯০০ খৃস্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে

[১] বাস্তবিক পক্ষে, চারি খণ্ডে; বর্তমান সংস্করণ উহা তিন খণ্ডে ছিল না।

উহা টুকরা ভাবে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে একটি জার্মান সংস্করণও প্রস্তুত হইতেছে।

৬। ঠাকুরের বাণী (Words of the Master); কলিকাতা বহুবাজারস্থ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে ১৯২৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সুনির্বাচিত বহু বাণী স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। উহা আর একটি সংগ্রহ গ্রন্থ। উহার মূল্য প্রধানত সংগ্রাহকের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে।

৭। ম্যাক্স ম্যুলার প্রণীত 'রামকৃষ্ণ: তাঁহার জীবন ও বাণী' (Ramakrishna . His Life and Sayings) লংম্যানস গ্রীন অ্যাণ্ড কম্প্যানি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে ১ম সংস্করণ; ও ১৯২৩ খৃস্টাব্দে নূতন সংস্করণ।

বিবেকানন্দের সহিত ইংল্যাণ্ডে ম্যাক্স ম্যুলারের পরিচয় ব্যক্তিগত ভাবে হয়। তখন ম্যাক্স ম্যুলার তাঁহাকে ঠাকুরের একটি সম্পূর্ণ বিবরণী দিতে বলেন। সুতরাং ম্যাক্স ম্যুলারের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। সাক্ষ্যগুলিকে ম্যাক্স ম্যুলার একটি উদার এবং সুস্পষ্ট বিচারশীল মনোভাবের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক দাবীর সহিত সকল প্রকারের চিন্তাকে উদার ভাবে গ্রহণ করিবার শক্তির মিলন ঘটিয়াছে।

৮। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত 'মৌনের মুখ' (The Face of Silence) ১৯২৬ খৃস্টাব্দে ই. পি. ডাটন অ্যাণ্ড্ কোম্পানি, নিউ ইঅর্ক, হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানির একটি বিশেষ মূল্য আছে; ইহা একটি শিল্পসম্মত রচনা; ইহাতে তৎকালীন ভারতীয় আবহাওয়ায় ঠাকুরের ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল ভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে। ধনগোপাল বাবু সমস্ত প্রধান রচনা ও দলিল-দস্তাবেজের সাহায্য লইয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির সহিতও তিনি সাক্ষাৎ করেন; তাঁহারা সকলেই ঠাকুরকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনিতেন, বিশেষত তুরীয়ানন্দ। তিনি রামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় শিষ্য প্রেমানন্দের স্মৃতিকথাও ব্যবহার করেন। তাঁহার শিল্পীর কল্পনা স্থানে স্থানে তথ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে সত্য; এবং রামকৃষ্ণ মিশন এই শিল্পীসুলভ স্বাধীনতাকে ভালো চোখে দেখেন নাই। ফলে এই পুস্তকে প্রদত্ত বহু ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁহারা সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কারণ, উক্ত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তার ভাবটি অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি কখনো ভুলিতে পারি না

যে, এই সুন্দর বইখানি পড়িয়াই আমি রামকৃষ্ণ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক জ্ঞা লাভ করি এবং ঐ গ্রন্থই আমাকে বর্তমান পুস্তক রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করে। সুতর আমি এখানে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাই। অসাধারণ শক্তি এব নৈপুণ্য বলে ধনগোপাল বাবু এই গ্রন্থে রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের সেই সকল দিকে পুরোভাগে তুলিয়াছেন, যাহা ইউরোপ ও আমেরিকার পাঠকদিগকে বিন্দুমাত্র বিস্মিত বা বিভ্রান্ত করিবে না। আমি তাঁহার সতর্কতাকে ছাড়াইয়া গিয় কোনোপ্রকার সজ্জিত বা বিকৃত না করিয়া দলিল-দস্তাবেজ হইতে যথাযথ প্রমা উদ্‌ধৃত করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছি।

৯। রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকাগুলির সাহায্যও খুব কাজে লাগিয়াছে বিশেষত 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং 'বেদান্তকেশরী'তে ঠাকুর সম্পর্কে তাঁহার শিষ্যদের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা বা তাঁহাদের সম্পর্কে গবেষণামূলক বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের নিকট পরামর্শ এবং বিভিন্ন সংবাদ পাইয়া যে প্রচুর ঋণী হইয়াছি, সে কথা আমি গোড়াতেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহারা অক্লান্তভাবে আমার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্র এবং আমার প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। আমি পুনরায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পটপঞ্জী

রামকৃষ্ণের মাত্র তিনটি ছবি রহিয়াছে, যেগুলিকে ক্রটিহীন মনে হয়।

১। অদ্বৈত আশ্রম হইতে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত তাঁহার সুবৃহৎ জীবনীতে (২৬২ পৃঃ) একটি ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণকে একজন ফটোগ্রাফারের কাছে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে ধর্মসংক্রান্ত কথাপ্রসংগে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হন। ঐ সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহার একখানি ছবি তোলা হয়। ঐ ছবিখানি পরে রামকৃষ্ণকে দেখানো হইলে তিনি বলেন, উহাতে যোগের আনন্দময় অবস্থাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

২। স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ডের ১৫০ পৃষ্ঠায় একটি ছবি প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। একটি ছবি অশোকানন্দ আমার জন্য পাঠাইয়াছেন। ছবিখানি সংকীর্তনের সময়ে তোলা হয়। রামকৃষ্ণ ভাবানন্দে মত্ত হইয়া সংকীর্তনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ছবিখানি আমি প্রকাশ করিবার আশা রাখি।

বড় জীবনীর সম্মুখপৃষ্ঠায় যে রঙিন ছবিখানি ছাপা হইয়াছে, তাহা একজন অস্ট্রিয়ান চিত্রকরের[১] আঁকা। তবে তাহা রামকৃষ্ণকে জীবন্ত অবস্থায় দেখিয়া আঁকা নহে। রামকৃষ্ণের শিষ্যরা এই ছবিকে রামকৃষ্ণের নির্ভুল প্রতিকৃতি মনে করেন। তবে তাঁহাদের মতে রঙের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি।

সমাপ্ত

১ ফ্র্যাংক দোয়াক—প্রকাশক।